মনোবীণা

চিরঞ্জীব সেন

২০-এ, সুকিয়া স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বর্ণলিপি : প্রবীর সেন

ছবি : আশিস চৌধুরী

অপপ্রয়োগ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক আজিকার কথা নয়, বেশ কিছুকাল আগের কথা। তখনও জমিদারী সরকারের সম্পত্তি হয় নাই। তখনও জমিদারী-প্রথা সন্ধ্যার ক্রমবিলীয়মান সন্ধ্যারাগের মত বর্তমান। জমিদার তখনও দেশের কোন-কোন অংশে রাজা, ভূস্বামী।

সে অংশ এই দেশেরই অংশ; তবু যেন ভূগোলের চৌহদ্দিতে ধরা পড়ে না। সেখানকার সকলে তখনও রেলগাড়ী দেখে নাই, রেলের বাঁশী শোনে নাই। সে অঞ্চল হইতে অনেক দূরে রেলের লাইন। সেখানে যাইবার জন্য পাকা রাস্তা দূরের কথা, সুবিধামত কাঁচা সড়কও নাই। গ্রীষ্মে বা শীতে সেই কাঁচা সড়ক ধরিয়া যদি বা যাওয়া চলে, বর্ষায় সে স্থান প্রায় অনধিগম্য।

তেমনি এক অঞ্চলে গ্রাম মজিদপুর। যাহাকে বলে 'অজ পাড়াগাঁ'; মজিদপুর সেই 'অজ পাড়াগাঁ'। পায়ে-চলা পথ ভিন্ন এখনও এ-গ্রামে প্রবেশের জন্য গাড়ীর পথ তৈয়ারী হয় নাই। জামা গায়ে, জুতা পায়ে কোন বিদেশী গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের পথচারী কুকুরগুলো ল্যাঙ্গুল গুটাইয়া চীৎকার করিতে-করিতে দূরে পলাইয়া যায়। পথের উপর খেলায় নিবিষ্ট দিগম্বর বালকের দল সভয়ে-সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়ায়, তারপর পথিকের পিছনে-পিছনে গ্রামপ্রান্ত পর্যান্ত অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। অল্প কিছুদিন আগে এখানে একটি সরকারী ইঁদারা তৈয়ারী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে জল পর্যন্ত লোকে এখনও খায় না; বলে, ইঁদারার জল নোনা—খেলে পেটে নোনা ধরবে। এমনি পাড়াগাঁ এই মজিদপুর।

এ গ্রামে ইঁট তৈয়ারী করিতে নাই, কয়লা পোড়াইতে নাই, পান ছাড়া অপর কোন প্রয়োজনে চুন ব্যবহার করিতে নাই, শেয়ালে ছাগল ধরিয়া লইয়া গেলেও তাড়া করিতে নাই—কারণ শেয়াল নাকি সাক্ষাৎ ভগবতী। এমনই ক্ষুদ্র গ্রামখানা অকস্মাৎ একদিন বিপুল চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠিক যেন ঘনপল্লব-আচ্ছন্ন কোন একটা ছোট ডোবায় আকাশ হইতে কে একটা বিশ মণ ওজনের পাথর ফেলিয়া দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে পঙ্কিল শীতল বদ্ধ জল ভয়ে বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইতে চায়, কিন্তু পারে না। গ্রামের লোকগুলির ঠিক সেই অবস্থা, উপায় থাকিলে তাহারা হয়তো পলাইয়াই যাইত।

তাহাদের দোষ নাই—তরুণ এম-এ পাশ-করা জমিদার আসিয়াছেন। সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙের দুইটা গ্রে-হাউণ্ড—টম ও বেবি, আর গাদাখানেক বই। জমিদার তাহাদের ভয়ের বস্তু হইলেও অপরিচিত জন নয়। তাহারা জমিদার ইহার পূর্বে দেখিয়াছে—প্রকাণ্ড বড়-বড় পাগড়ি-বাঁধা চাপরাশী, ফুরসি, গড়গড়া, বোতল-বোতল কারণ, অকারণ গর্জন, এসবের সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় নাই। কিন্তু গাদাখানেক বই ও কুকুরপ্রিয় হেমাঙ্গবাবুর মত জমিদার তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত; তাহার উপর যেদিন গোমস্তা ঘোষণা করিয়া দিল যে, বাবু কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, কাহারও নজরানা লইবেন না, খাজনার কথাও বলা চলিবে না—সেদিন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু বিস্ময়ের অপেক্ষা ভয় হইল আরও বেশী।

হেমাঙ্গবাবু সখ করিয়া মহলে বিশ্রাম লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু পড়াশুনা করিবারও অভিপ্রায় আছে। হেমাঙ্গবাবু কাছারীর প্রাঙ্গণে পদচারণা করেন—দূর হইতে প্রজারা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখে। ছেলেরা আঙ্গুল দেখাইয়া বলে, হুই দেখ বাবু!

বয়স্ক ব্যক্তিরা ছেলেটার হাতখানা টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলে, এ্যাঃ-ই—খবরদার! কেহ চুপি-চুপি বলে, কি রকম ভাই, আমি

তো কিছু বুঝতে পারছি না। মোড়ল, মাতব্বর যাহারা, তাহারা কেহ সাহস করিয়া যায়, কিন্তু কাছারীর সীমানার বাহিরেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখে—লিকলিকে কালো আঁধার কুকুর দুইটা কোথায়।

যে গলার ডাক—সত্যই মানুষের ভয় হয়।

সেদিন কুকুর দুইটা কাছারীর পিছনের দিকে বাঁধা ছিল, তাই সাহস করিয়া ইন্দ্র মণ্ডল কাছারীতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। হেমাঙ্গবাবু তেল মাখিতেছিলেন, সে হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চরণে ত্যাল দিয়ে দিই আমি।

হেমাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—না, থাক্।

ইন্দ্র মণ্ডল অবাক হইয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি আপনার পেজা।

হেমাঙ্গবাবু লোক খারাপ নন, মিষ্ট স্বরেই বলিলেন—কি নাম তোমার?

ইন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, ইন্দ্রচন্দ মণ্ডল, হুজুরের মণ্ডল আমি;

—বেশ-বেশ, কিরকম ফসল হলো এবার?

ইন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলিল, ভগমানেই মেরে দিলে হুজুর, মানুষের আর অপরাধ কি!

অকস্মাৎ পিছনের দিকে কুকুর দুইটা গম্ভীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে স্থানটাকে ভয়সঙ্কুল করিয়া তুলিল। কুকুরের ডাক তো নয়, যেন বাঘের ডাক। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরও পাওয়া গেল, ওরে বাপরে, ই যে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে মানুষকে।

হেমাঙ্গবাবু চাকরটাকে বলিলেন, কোন লোক দেখে চেঁচাচ্ছে। গিয়ে ঠাণ্ডা কর্ তো তুই। কে আসছে, চলে আসতে বল্, দাঁড়িয়ে থাকলে বেশী চীৎকার করবে।

চাকরটা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই একজন অসাধারণ লম্বা জোয়ান আসিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র ভঙ্গিমায় এক সেলাম বাজাইয়া কহিল—সেলাম হুজুর!

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছয় ফুট, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান, তেমনি পরিপুষ্ট দেহ,

মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুইটা করমচার মত রাঙ্গা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ দীর্ঘ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ।

লোকটি হাসিয়া বলিল—আমাদের রুটি মেরে দিলেন হুজুর। আচ্ছা কুকুর পুষেছেন। বন থেকে বাঘ ধ'রে আনবে ও কুকুরে—লেলিয়ে দিলে লোকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ও কুকুর শিকারের জন্যই পোষা।

লোকটি বলিল—তা পুষেছেন বেশ করেছেন, কিন্তু—গোলামের মত কুকুর ও নয়। এক লাঠিতেই গোলাম ও দু'টোকেই সাবড়ে দেবে।

লোকটাকে দেখিয়া কথাটা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি নাম তোমার?

আবার একটা সেলাম করিয়া সে বলিল—গোলামের নাম রতন হাড়ি। হুজুরের গোলাম আমি। এ চাকলায় সকলেই আমাকে চেনে। বলো না গো গোমস্তাবাবু।

হেমাঙ্গবাবু এবার মুখ ফিরাইয়া উপস্থিত ব্যক্তি কয়টির দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—গোমস্তা, ঠাকুর, নন্দী, ইন্দ্র মণ্ডল, স্থানীয় ব্যক্তি কয়টির সকলেই ভয়ে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—লোকটি কে হে রাধাচরণ?

রাধাচরণ গোমস্তা বলিল—আজ্ঞে রতন হাড়ি। এ চাকলার বড় লাঠিয়াল একজন। জমিদারের কাজকর্ম পড়লে কাজটাজ করে।

রতন বলিল—হুজুরদের কাছারীতে আমার বাঁধা বিত্তি আছে। সব জমিদারদের কাছারীতেই আছে। দাঙ্গা-দখল, পেজা শাসন যখন যা দরকার হয়, হুজুরদের গোলাম আছিই।

তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখাইয়া বলিল—মুর্শিদাবাদে ফতেসিং পরগণায় জমিদারের এক দাঙ্গায় এই দেখেন মারলে কপালে তরোয়াল দিয়ে—এক কোপ। গল্ গল্ করে তাজা রক্ত—গরম কি সে রক্ত—চাল দিলে ভাত হয় হুজুর—বেরিয়ে মুখ ভেসে গেল। তবু

আমি ছাড়ি নাই, সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় বসিয়ে দিলাম লাঠি। ব্যস্, ডিমের খোলার মত চুর হয়ে গেল। সেও পড়ল, আমিও পড়লাম। কিন্তু ঐ লাস পড়তেই ও-তরফের সব ভাগলো। আর কখনও সে সীমানায় পা দেয় নাই, তবে আমাকে ছ'মাস বিছানায় প'ড়ে থাকতে হয়েছিল।

ইন্দ্র মণ্ডল ধীরে-ধীরে কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন পুলিশে ধরলে না তোমাকে ?

হাসিয়া রতন বলিল—তবে আর হুজুররা আছেন কেন ? এমনা গোলমাল করে দিলেন যে, পুলিশ পাত্তাই পেল না। জলের মত টাকা খরচ করেছিলেন মালিকরা। মামলাতেও জিতে গেলেন আমারই হুজুর। সে সীমানায় এখন বাবুদের হাজার টাকা আয় বেড়ে গিয়েছে।

একটা সিগারেট ধরাইয়া হেমাঙ্গ প্রশ্ন করিলেন—এখন কোথায় কাজ করো তুমি ?

আবার একটা সেলাম করিয়া রতন বলিল—সবারই কাজ করি, আমি হুজুর, যার যখন দরকার পড়ে, তলব করলেই গোলাম হাজির হয় ; বাঁধি কাজ আমি করি না কোথাও।

হুঁ, এখন কোথায় এসেছিলে ?

এই হুজুরের দরবারে। হুজুরকে সেলাম দিতে। শুনলাম, হুজুর এসেছেন, তাই এলাম। বকশিসের হুকুম হয়ে যাক হুজুর। ওই কুকুর দুটোকে রোজ দুধ-ভাত দিচ্ছেন আমাকেও আমাকেও আজ কিছু হুকুম হোক।

হেমাঙ্গবাবু গোমস্তাকে ইসারা করিলেন, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একটা টাকা রতনের হাতে দিয়া বলিল —নাও।

রতন পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিল যখন দরকার হবে হুজুর, কুকুর পাঠিয়ে তলব দিবেন, গোলাম হাজির হবে। যা হুকুম করবেন তাই আমি পারি। হুজুরের যদি কেউ দুশমন থাকে, হুকুম দিলে—।

সে ইসারা করিয়া বুঝাইয়া দিল, তাহাকে খুন করিতে পারে।

তারপর আবার আরম্ভ করিল—এই এরা সব জানেন—এই

চাকলায় কাশীদাস ব'লে এক হারামজাদা চাষা ছিল। এ চাকলা তার ভয়ে কাঁপত। বেটার পয়সাও ছিল, আর বুকের ছাতিও ছিল। আজ এর জমি কেড়ে নিত, কাল ওর পুকুর ছেঁকে মাছ ধরিয়ে নিত। ...ওকে ধ'রে খত লিখিয়ে নিত। শেষ চাকলার জমিদারের সঙ্গে লাগালে ঝগড়া। গোলামের ওপর ভার হলো শেষে। এই বছর দুয়েক আগে কালীপূজার দিন, মাঠের মধ্যে কাশীদাস হয়ে গেল। পা, হাত, মুণ্ডু—সব আলাদা হয়ে পড়ে ছিল মাঠের মধ্যে।

হেমাঙ্গবাবু তাহার অবয়ব এবং সপ্রতিভ ভঙ্গিমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন—কাজ করবে তুমি?

আবার সেলাম করিয়া রতন বলিল, হুকুম করলেই পারি।

—না, সে রকম কোন কাজ নয়। আমার কাছে চাকরী করবে?

—গোলামের পেটটা একটু বড় হুজুর। বলিয়া হাসিয়া রতন পেটে হাত বুলাইল।

—আমার ওই কুকুর দু'টো পাকী তিন সের চালের ভাত খায়, এক সের ক'রে দুধ!

—সখের বলিহারী যাই হুজুরের। হুজুর ইচ্ছে করলে আমার মত বিশটে লোক পুষতে পারেন। তা আমি বলব কাল এসে। রতন অভিবাদন করিয়া বিদায় লইয়া গেল।

গোমস্তা এবার বলিল—ওর মত লোককে ঘরে ঢোকাবেন না, হুজুর।

পাচক ব্রাহ্মণটি আবার সাধুভাষায় কথা বলে, সে বলিল—সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র হুজুর।

হেমাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—বাঘও তো লোকে সখ করে পোষে। দেখি না দিনকতক পুষে।

পাচকটি কাতর হইয়া বলিল—কি করবেন ওকে রেখে হুজুর? হুজুরের তো সুনাম দেশময়। কোথাও তো—

বাধা দিয়া হেমঙ্গ বলিলেন—ওই কুকুর দু'টো পুষেছি—কাউকে তো লেলিয়ে দেবার জন্যে নয়, দু'টো বন্দুকও আমার আছে, কিন্তু মানুষকে তো গুলী করিনে। ভয় কি! দেখি না।

গোমস্তা বলিল—ও কি কাজ করবে হুজুর, বাঁধা কাজ করবার ওর দরকারই হয় না। এইসব কাজে রোজগারও করে, আর তাছাড়া যার বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালো, তারই ঘরে সেদিনের খোরাকটা ক'রে নিয়ে গেল। কেউ তো 'না' বলতে পারে না। ওকে দেখলেই ভয়ে কাঁপে —যা চায় দিয়ে বিদেয় ক'রে বাঁচে।

পাচকটি বলিল—তবু দেখুন গিয়ে হতভাগ্যের চালে খড় নাই, পত্নীর পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র। পাপের ধন কর্পূরের মত উড়ে যায়। সেই যে বলে—পাপসঞ্চিত ধন, আর বন্যার জল—এ কখনো থাকে না।

গোমস্তার অনুমান কিন্তু সত্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালেই রতন আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন সে সেলাম করিল না, হেমাঙ্গবাবুর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, হুজুরের পায়ে আশ্রয় নিলাম আজ থেকেই।

* * *

দিনকয়েক পরে হেমাঙ্গবাবুর বইয়ের উপর বিরক্তি ধরিয়া গেল। তিনি বন্দুক ও কুকুর দুইটাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বড় শিকার এখানে কিছু পাওয়া যায় না, তবে খরগোস ও পাখী এখানে অজস্র। হরিয়াল, তিতির, সরাল পাখী ঝাঁক বাঁদিয়া উড়িয়া বেড়ায়। বন্দুকের শব্দও তাহাদের নিকট অপরিচিত। গোমস্তা বলিল—রতন, তুমি বাবুর সঙ্গে যাও।

রতন বলিল—হুজুরের সঙ্গে চলেছে দুই বাঘ—হাতে বন্দুক, রতন আর ও পাখ-পাখুড়ী কুড়োতে কোথা যাবে। ওই শম্ভুকে পাঠিয়ে দাও।

—বলে···সে বেশ মশগুল করিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

হেমাঙ্গবাবু গ্রাম পার হইয়া মাঠে একটা ঝোপের কাছে আসিতেই কি-একটা জানোয়ার লাফ দিয়া বাহির হইয়া মাঠে ছুটিল—খরগোস!

তিনি বন্দুক তুলিয়া ধরিয়া গুলী ছুঁড়িলেন। খরগোসটা একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তখন টম ও টেবি

ছুটিয়াছে। দেখিতে-দেখিতে টম আসিয়া নিরীহ জানোয়ারটার ঘাড়ের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ প্রান্তর করুণ-চীৎকারে সকরুণ হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুর মনে হইল, কোন ছাগলছানাকে কুকুরটা ভুল করিয়া বোধ হয় আক্রমণ করিয়াছে, ঠিক এমনি চীৎকার। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, ছাগল নয়—খরগোসই। খরগোসের চীৎকার কখনও তিনি শোনেন নাই। টম আরও গোটা দুই ঝাঁকি দিতেই জীবটা নীরব হইয়া গেল।

মানুষের বুকের হিংস্রবৃত্তি যখন পাশবিক উল্লাসে জাগিয়া ওঠে, তখন মানুষ আর একরকম হইয়া যায়। একবার হত্যা করিয়া কৃতকার্য হইলে আর রক্ষা নাই, হত্যার পর হত্যা করিবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া ওঠে। প্রথমেই এমন একটি শিকার করিয়া হেমাঙ্গবাবু মাতিয়া উঠিলেন। শিকার শেষে এক বোঝা পাখী লইয়া যখন কাছারিতে ফিরিলেন, তখন বেলা গড়াইয়া অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে।

স্নান আহার শেষ করিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় গোমস্তা আসিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—খরগোসটার পেটে চারটে বাচ্চা ছিল।

হেমাঙ্গবাবু অনেক শিকার করিয়াছেন, মরা পাখীর পেটে ডিম অনেকবার পাইয়াছেন, সুতরাং এ সংবাদে তিনি বিস্মিত হইলেন না। বরং কৌতুহলপরবশ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তাই নাকি - কই, চলো তো দেখি কেমন ?

সত্যই লম্বা একটা চামড়ার থলির মধ্যে পরিপূর্ণ অবয়ব চারটি শাবক রহিয়াছে, স্পষ্ট দেখা গেল। হেমাঙ্গবাবু, বলিলেন একটু অন্যায় হয়ে গেল। যাক্‌গে। বাচ্চা চারটে দিয়ে দাও ওই কুকুর দুটোকে।

রাত্রে আহারের সময় হেমাঙ্গবাবু দেখিলেন, লোকজন সকলেই খাইতে বসিয়াছে, কেবল রতন নাই। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—রতন কই ?

গোমস্তা বলিল—সে খাবে না বলেছে, তার শরীর ভাল নাই।

চাকরটা মৃদুস্বরে বলিল—সমস্ত সন্ধ্যেটা সে কেঁদেছে।

—কেন ?

—ঐ খরগোসটার পেটের বাচ্চাগুলোকে দেখে।

হেমাঙ্গবাবু অবাক হইয়া গেলেন। একটা নরঘাতী, মানুষের উপর কোন অত্যাচার করিতেও যে ইতস্তত করে না, সে তুচ্ছ একটা পশুর জন্য কাঁদে!

পরক্ষণেই তিনি আবার হাসিলেন। সবই অভ্যাস—যে মানুষ পশুহত্যা করে, সে নরহত্যা করিতে পারে না; যে নরহত্যা করে, সে পশুহত্যা দেখিয়া কাঁদে।

একবার ভাবিলেন লোকটাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভাল, আবার পরক্ষণেই মনে হইল থাক্।

রতন হেমাঙ্গবাবুর কাছেই থাকিয়া গেল। সপরিবারে উঠিয়া আসিয়া সে হেমাঙ্গবাবুর এলাকার মধ্যেই বসবাস করিল। হেমাঙ্গবাবুই তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে এখন খায়-দায় আর হেমাঙ্গবাবুর কাছারিতে আসিয়া বসিয়া থাকে। ঐ কুকুর দুইটার সঙ্গে তাহার বড় সদ্ভাব—সেই এখন তাহাদের তদ্বির তদারক করে।

হেমাঙ্গবাবু একটু খেয়ালী মানুষ, দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর জানোয়ারের উপর তাঁহার অহেতুকী আকর্ষণ আছে, নতুবা মানুষ তিনি খারাপ নন, জমিদার হিসেবেও তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রজাপালক শিষ্ট জমিদার বলিয়া খ্যাতি আছে। সুতরাং রতনকে এখনও তাহার গুণপনার পরিচয় দিতে হয় নাই। কর্মচারীরা কিন্তু বড় বিরক্ত হয়, ঐ এমনধারা ভয়ঙ্কর একটা লোককে দেখিয়া তাহাদের আতঙ্ক হয়—আবার রতনের মোটা বেতনের জন্য হিংসাও হয়। তাছাড়া রতন ইহাদের উপর অত্যাচার করে। এক-একদিন এক-একজনের কাছে গিয়ে সেলাম বাজাইয়া বলে—আজ মদের ইলেমটা কিন্তু আপনার কাছে পাওনা গোমস্তামশাই।

যমের কাছে অনুনয়-বিনয় চলে, কিন্তু যমদূতের নিকট অনুনয় করিলে কোনো ফল হয় না; তাহারা কেহ একটা আনি, কেহ বা দু'-আনি ফেলিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

রতন অকৃতজ্ঞ নয়, সে আবার সেলাম করিয়া বলে—বাবুর গোলাম আমি, আপনারও গোলাম। যখন যা কাজ পড়বে, হুকুম দেবেন।

নিরীহ কর্মচারী কাষ্ঠ হাসিয়া বলে, আমাদের আবার কাজ কি রতন? রতন বুঝাইয়া বলে—হুজুর, মানুষ হ'লেই কাজ আছে। আপনার দুশমন নাই? যে যেমন মানুষ তার তেমন দুশমন, তার তেমন কাজ। এই দেখেন রজতপুরের জমিদারের এক সরকার, বুঝলেন, তার ঝগড়া লাগলো তার গাঁয়ের মাতব্বরের সঙ্গে। মশাই, এক বেটা সেঁকরা গোটাকতক পয়সা ক'রে যেন সাপের পাঁচ-পা দেখলে। সরকার আমাকে ধরলে, রতন আমাকে বাঁচাতেই হবে, নইলে মান-ইজ্জত তো আর রইলো না। পঁচিশ টাকা ঠিক হলো। তিনদিন না যেতেই ছুটে গেল বেটার চালে লাল ঘোড়া।

কর্মচারীটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—আগুন!

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে রতন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, লাল ঘোড়া আগুনকেই বলে। তা আপনার একবার নয়, তিন-তিনবার। শেষে বেটা সেঁকরা টিন দিলে ঘরে। তখন একদিন করলাম কি জানেন, গাঁয়ের সদর রাস্তার উপর বেটা দাঁড়িয়েছিল, বেটার কানটা ধরে গাঁয়ের ইধার থেকে উধার পর্যন্ত ঘোড়দৌড় করে দিলাম।

কর্মচারীটি চুপ করিয়া রহিল, সে আর কথা বাড়াইতে নারাজ, রতনের হাত হইতে রেহাই পাইলেই সে বাঁচে। রতন কিন্তু রেহাই দিল না, সে তাহার ভয়ঙ্কর মুখ আরো বীভৎস করিয়া কৌতুকের হাসি হাসিতে-হাসিতে বলিল—লালঘোড়া খুব সস্তা হুজুর। এক দেশলাইয়ের কাঠি হ'লেই—ব্যাস্। এক টাকা দিলে ঘরের এক কোণে দিতাম, দু'টাকা দিলে দু' কোণে, তিন টাকায় তিন কোণে, চার টাকায় বেড়াজাল—একেবারে ইধার থেকে উধার পর্যন্ত।

কর্মচারীটি এবার বিরক্ত হইয়া বলিল—কিন্তু যমের ঘরে তো জবাবদিহি করতে হবে রতন!

হি-হি করিয়া হাসিয়া রতন বলিল—সেদিন আর কাউকে পয়সা লাগবে না হুজুর, রতন নিজের গরজেই যমের দালানে আগুন লাগাবে।

এই বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * *

একদিন রতনের কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্প্রতি একখানি নূতন মৌজা হেমাঙ্গবাবু খরিদ করিয়াছেন, সেইখানে প্রজাদের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুকেও দোষ দিতে পারা যায় না, তিনি বিরোধ করিতে চাহেন নাই। বিরোধ করিল—প্রজারাই। নজর, সেলামী বা কোন আবওয়াবই হেমাঙ্গবাবু দাবী করেন নাই, তিনি দাবী করিলেন, আইনসঙ্গত প্রাপ্য খাজনা। কিন্তু তাও প্রজারা দিবে না।

তাহারা বলে—খাজনা কিসের? মাঠ চষা—তার আবার খাজনা?

হেমাঙ্গবাবু নালিশ করিলেন। প্রজারা তাঁহার কাছারীতে আগুন দিল। একদিন পথে তাঁহার গোমস্তাকে ধরিয়া কান মলিয়া অপমান করিয়া ছাড়িল। গোমস্তা আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর পায়ে গড়াইয়া পড়িতেই হেমাঙ্গবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন! তিনি রতনকে তলব করিলেন। রতন আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—এতদিন তুই বসে খেলি, হাতীর মত তোকে পুষলাম। এইবার কাজ দেখাতে হবে।

রতন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—নতুন মৌজা পলাশবুনি পোড়াতে হবে।

রতন প্রশ্ন করিল—পলাশবুনি?

—হাঁ, একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত—যেন একখানি ঘরও না বাঁচে, বুঝলি? যদি কেউ দেখতেই পায়, কি বাধাই দেয়—তবে তাকে শেষ ক'রে দিয়ে আসবি।

—খুন? রতন হুকুমটা বেশ করিয়া সমঝাইয়া লইতে চাহিল।

—হাঁ খুন! হেমাঙ্গবাবু সকম্পিত কণ্ঠস্বরে ইআদেশ দিলেন।

রতন আর কোন কথা বলিল না, চলিয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু উৎকণ্ঠিতচিত্তে রতনের প্রত্যাবর্তনের পথ চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁহার মনে হইল, উত্তেজনাবশতঃ এ হুকুম না করিলেই তিনি পারিলেন। কিন্তু রতন কি সে কাজ ফেলিয়া

রাখিয়াছে! তৃতীয় দিন তিনি রতনের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন. রতন ধরা পড়িল না তো! চতুর্থ দিন তিনি অন্য একজন পাইককে ডাকিয়া বলিলেন—রতনের বাড়ীটা খোঁজ ক'রে আয় তো!

পাইকটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে, কারও দেখা পেলাম না। তার পরিবার কোথা গিয়েছে। ঘরে শেকল রয়েছে।

কিন্তু রতন তো ফেরে নাই। চিন্তিত হইয়া হেমাঙ্গবাবু পলাশ-বুনিতেই লোক পাঠালেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই সব সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। অপরাহ্ণেই জানা গেল, রতন দ্বিতীয় দিন রাত্রে তাহার স্ত্রীকে লইয়া এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছে। ঘরে তৈজসপত্রের মধ্যে পড়িয়া আছে, কয়েকটা ভাঙা হাঁড়ি। পলাশবুনি হইতে সংবাদ আসিল, গ্রামও পোড়ে নাই—রতনও ধরা পড়ে নাই।

হেমাঙ্গবাবু স্তব্ধবিস্ময়ে বসিয়া রহিলেন। নায়েব গোমস্তারা বলিল—এই লোকের ঐ ধারাই বটে। বেটা সেদিন কিছু টাকা খেয়ে পালাবার ফন্দি করেছে আর কি!

হেমাঙ্গবাবু সেদিনটা সমস্ত কুকুর দুইটার পরিচর্যায় মত্ত থাকিলেন

* * *

বৎসরখানেক পরে হেমাঙ্গবাবু তাহার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে গেলেন হুগলী জেলায় একখানা গ্রামে। বন্ধুও তাঁহার অবস্থাপন্ন জমিদার সেইখানে সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাঁহার রতনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—এবার আমি এক বাঘ পুষেছি, দেখবে?

হেমাঙ্গ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বাঘ?

—হ্যাঁ, বাঘ। যাকে বলে শেলেদা বাঘ।

—চলো, দেখি, কোথায়?

হেমাঙ্গবাবু উৎসুক হইয়া উঠিলে বন্ধু বলিলেন, ব'সো না, এইখানে আনছে। ওরে, তারাচরণকে ডেকে দে তো!

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—বাঘ এখানে আনবে কি হে? না-না—এ সাহস ভাল নয়। এখনও বাচ্চা বুঝি?

—বাচ্চা নয়, বরং প্রৌঢ়।

—বলো কি? হেমাঙ্গবাবুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—সেলাম হুজুর!

আভূমি নত সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই রতন হেমাঙ্গবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবুরও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই বন্ধুটি রসিকতা করিয়া বলিলেন—নরব্যাঘ্র। শিকার দেখিয়ে শেকল খুলে দিলে তার আর নিস্তার নাই।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হুঁ।

এই সময় একজন কর্মচারী আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর বন্ধুকে কি বলিতেই তিনি উঠিয়া বলিলেন—আলাপ করো এর সঙ্গে, আমি আসছি।

রতন হেমাঙ্গবাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—তুই পালিয়ে এলি কেন?

রতন বলিল—আমি যে পারলাম না হুজুর কাজ করতে।

—কেন?

—কখনও যে আমি ও-কাজ করিনি। আমি যে সব মিথ্যা করে বলতাম। যেখানে যে খুন দাঙ্গা হতো, সব আমি নিজের নাম দিয়ে মিথ্যা ক'রে বলতাম।

হেমাঙ্গবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু কেন করতিস? কে তোকে এ বিদ্যা শেখালে?

রতন শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তারপর মাথা হেঁট করিয়া অন্যমনস্কভাবে মাটিতে দাগ কাটিতে-কাটিতে বলিল, হুজুর দশ বছর আগে, তখন আমার একটি মাত্র ছেলে। সেবার দেশে আকাড়া হলো এমন যে, না খেয়ে মানুষ মরতে লাগল। পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে আপনার সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখা হয় ঐ চাকলায় আসি। এ চাকলায় ধান-টান চারটি হয়েছিল, আমার সেই উপোষ সার! শরীরে বল ছিল না, খাটতে পারতুম না, ভিক্ষেও কেউ দিত না। তার উপর ছেলেটার হলো অসুখ। কোন কিছু ক'রেও কিছু জোগাড় করতে

পারলাম না। এক জমিদারের বাড়ী গেলাম—সেখানেও ভিক্ষে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। পথে আসতে-আসতে আবার ফিরলাম। জমিদারকে গিয়ে বললাম, খুন, জখম, ঘরে আগুন লাগানো—যা বলবেন, তাই করব। আশ্চর্য বাবু, জমিদারবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা টাকা বকশিস্ দিয়ে দিলেন। ছেলেটা মরে গেল সে অসুখেই, আমি কিন্তু ফন্দিটা শিখে নিলাম। যেখানে যা খুন জখম হতো, বলতাম আমি করেছি। লোকে ভয় করত, যার দোরে দাঁড়াতাম সেই আঁচলটা ভ'রে দিত, খাতিরও করত—বলে রতন চুপ করিল।

হেমাঙ্গবাবুও নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—চল্, তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল্। তোকে কিছু করতে হবে না।

রতন তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া বলিল—আর জন্মে আপনি আমার সত্যিই বাপ ছিলেন হুজুর।

* * *

আশ্চর্য! পরদিন প্রত্যুষেই কিন্তু দেখা গেল, রতন স্ত্রীকে লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।

এবার আর হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইলেন না। তিনি কল্পনানেত্রে দেখিলেন—আবার কোন দূরদেশে রতন আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া কোন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতেছে—সেলাম হুজুর!

———

দুইটি চিঠি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

—বনফুল

১

ভাই নবদ্বীপচন্দ্র,

আশা করি, মঙ্গল-মতো আছো। অনেক দিন তোমার খবর পাই নাই। আমিও অবশ্য খবর লইবার চেষ্টা করি নাই। আমাদের আর খবর কি আছে বলো। এখন খবর মানে, পারের খবর। সে খবরও তো জানাই আছে, আর যেটুকু অজানা, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা যখন জানিব, তখন কাহাকেও জানাইতে পারিব না। বয়স পঁচাত্তর হইল। পারঘাটাতেই তো বসিয়া আছি। কিন্তু নৌকা আসে কই? চোখে ভালো দেখিতে পাই না। ছানি কাটাইয়াও সুবিধা হয় নাই। একটু ঝাপসা ভাব থাকিয়াই গিয়াছে। খাওয়া হজম হয় না। দাঁত নাই। দিনে গলা-গলা ভাতে-ভাত আর রাত্রে খান-চারেক সরুচাক্‌লি খাই। অনেক পাঁউরুটি দুধে ভিজাইয়া খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁউরুটির গন্ধটা আমি বরদাস্ত করিতে পারি না ভাই। খই দুধ খাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও পেটে বায়ু জন্মে। সরুচাক্‌লিটা আমার বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছে।

তুমি কি এখনও আগের মতো মাংস খাও? আমার তো মাছ মাংস ছুঁইবার উপায় নাই। সর্বাঙ্গে বাত। বিশেষত ডান হাঁটুটায় এত ব্যথা যে লাঠি ছাড়া চলিতে পারি না। তোমার শরীর কেমন আছে? এখনও কি তুমি কবিতা লেখো? সব খবর দিও।

দিবার মতো একটা খবর অবশ্য আমার আছে এবং সেইটি বলিবার জন্যই এতক্ষণ ভণিতা করিলাম। আমি আবার দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছি। মেয়েটি খুব গরীবের মেয়ে। পিতৃ-মাতৃহীনা হইয়া একেবারে

অনাথিনী হইয়া পড়িয়াছিল। ভাই-বোন নাই। এক জমিদারের ছেলে তাহার উপর কু-নজর দিয়াছিল। আমি তাহার দাদামহাশয়ের বন্ধু বলিয়া সে আমার কাছে আসিয়া আশ্রয় লয়। আশ্রিতার মতোই থাকিত। কিন্তু পাড়ার লোকের রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ গজাইয়াছে।

আমার ছেলেমেয়েরাও কড়া-কড়া চিঠি লিখিতে লাগিল। মেয়েটির অবস্থা যাহা হইল তাহা বর্ণনাতীত। শেষটা তাহাকেই বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। তাহার সমস্যারও সমাধান হইল, আমারও। আমারও সমস্যা অনেক। বৃদ্ধদেরই জীবন সমস্যা-সঙ্কুল, বিশেষত যদি তাঁহারা বিপত্নীক হন।

পূর্বেই, বলিয়াছি আমার শরীর নানাভাবে অপটু হইয়াছে। এ বয়সে সেবার দরকার। কিন্তু সেবা করে কে! ছেলেরা নিজের নিজের বউ লইয়া কর্মস্থলে থাকে। থাকাই উচিত। মেয়েরাও নিজেদের ঘর করিতেছে। সেটাও কাম্য। সুতরাং আমি একা পড়িয়া গিয়াছি। চাকর রাখিয়া সেবা ক্রয় করা যায় অবশ্য। কিন্তু মূল্য এত অধিক যে আমার পেন্সনে কুলায় না। চব্বিশঘণ্টা আমার নিকট হামে-হাল হাজির থাকিবে, এরকম একটি সমর্থ চাকরের খরচ মাসে প্রায় একশত টাকা। আমি মাত্র দেড়শত টাকা পেন্সন পাই। চাকর রাখিলে অনাহারে থাকিতে হইবে। একটি বুড়ী চাকরাণী রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহারই সেবার দরকার, সে আমাকে সেবা করিবে কিরূপে। কমবয়সী চাকরাণী রাখিবার উপায় নাই, পাড়ার গার্জেনরা আছেন। এই মেয়েটি আসিয়া আমার বেশ সেবাযত্ন করিতেছিল, কিন্তু ওই গার্জেনদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই শেষে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

মেয়েটি বেশ নেটি-পেটি, আমার খুব সেবা করে। নাম যদিও কালী, কিন্তু দেখিতে বেশ ফরসা, ঠোঁটের উপর ছোট্ট একটি তিল থাকাতে আরও সুন্দর দেখায়। তাছাড়া চোখে সরু করিয়া কাজল পরে বলিয়া রূপ আরও খুলিতেছে।

আমার ছেলেরা আমাকে তাহাদের কাছে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই বিস্তৃত-পরিসর বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া তাহাদের কোয়ার্টারের পায়রা-খোপে যাইতে ইচ্ছা করে না। আমার বউমারা কেউ খারাপ লোক নন, কিন্তু আমার প্রস্রাবের বোতল পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহাদের যে কুঞ্চিত-নাসা মুখভাব দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহাদের ওসব নোংরা কাজ করিতে দিতে ভদ্রতায় বাধে। সর্বদাই যেন তাঁহাদের কাছে অপ্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আমি নিজেও এসব করিতে পারি না, অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিবার জন্যও একজন লোক দরকার। প্রত্যহ ঘসিয়া-ঘসিয়া সর্বাঙ্গে গরম তেল মালিশ না করিয়া দিলে শরীর ভালো থাকে না। রাত্রে সরুচাক্‌লি চাই। কে এসব করিয়া দিবে বলো?

কালীদাসী হাসিমুখে সব করিতেছে। সমস্যার সমাধান হইয়াছে। চার্লি চ্যাপলিন বাট্রাণ্ড রাসেলের মতো মনীষীরাও বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। ছেলেরা যদি আমাকে মাসে-মাসে টাকা পাঠাইত, তাহা হইলে ভালো চাকর রাখিতাম, বিবাহ করিতে হইত না। কিন্তু তাহাদের নিজেদের কুলায় না, আমাকে পাঠাইবে কি করিয়া। মাঝে-মাঝে আমার কাছেই টাকা চায়।

তুমি বলিবে কালীদাসীর মতো একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি। এক হিসাবে তাহা সত্য বটে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কি সকলের প্রতি সুবিচার করা চলে? আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শাস্ত্রেই একথা বলে। মাছ-মাংস, দুধ, শাক-পাতা ডালভাত যাহাই খাও অপর প্রাণীকে পীড়ন করিয়া বঞ্চিত করিয়া বধ করিয়া খাইতে হইবে। অর্থ দিয়া যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব, তাহা অবশ্য আমি করিব। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে সব কালীদাসীকেই লিখিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কালীদাসী যদি আবার বিবাহ করিতে চায়, তাহাও সে করিতে পারিবে এ-কথাও লিখিয়া দিয়া যাইব। দেশের আইনও এখন তাহার স্বপক্ষে থাকিবে।

তুমি বাল্যবন্ধু বলিয়া অনেক কথাই তোমাকে লিখিলাম। বিবাহ

করিয়াছি বলিয়া সমস্বরে সকলেই যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতেছে। আশা করি তোমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পাইব।

তুমি কোথায় আছো, তাহা জানি না। তোমার পুরাতন ঠিকানাতেই পত্রখানি পাঠাইতেছি। যেখানেই থাকো, আশা করি ইহা তোমার নিকট পৌঁছিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা লও। ইতি—

তোমার বাল্যবন্ধু
রসিকলাল

২

বন্ধু

কল্য তোমার পত্র ঘুরি দিগ্বিদিক
ঠিকানায় অবশেষে পৌঁছিয়াছে ঠিক।
আমারও সমস্যা ছিল তোমারি সমান
হোটেলে আশ্রয় লয়ে করিয়াছি তাহা সমাধান।
আমারও গৃহিণী গত,
চারি পুত্র সংসারে বিব্রত।
বৃদ্ধের জরার ভার হাসিমুখে বহিবার
তাহাদেরও কারও সাধ্য নাই,
কলিকালে যযাতিরে কোথা পাব ভাই!
মোরও কণ্ঠে দুলাইতে মালা
হাজির হইয়াছিল কয়েকটি বালা
কিন্তু ভাই পারি নাই
কণ্ঠটিরে সামালিয়া, চাপি বক্ষে মেলে
আশ্রয় লয়েছি এসে বিদেশী হোটেলে।
তুমি যে দিয়েছ যুক্তি, ঠিক তাহা, হাঁসালো ও জোরালো
কিন্তু ভাই মোর চিত্তে বহু পূর্বে যে বালিকা
জ্বেলেছিল আলো,
আজও তার শিখা,

চেয়ে আছে মোর পানে মেলি তার দৃষ্টি অমানিশা।
উজ্জ্বল অম্লান,
দ্বিতীয় শিখার আর নাই সেথা স্থান।
তবু যেন শান্তি নাই, মাঝে-মাঝে কি যে হয় মনে
বসন্তে-শরতে-শীতে, সমুদ্রের তরঙ্গ নর্ত্তনে
চলন্ত মেঘের মুখে কি যে বার্ত্তা পাই অভিনব
উড়ন্ত পাখীর কণ্ঠে কী যে শুনি, কেমনে তা কব।

যেমন আজিকে ধর
চতুর্দিকে বর্ষা ঝর ঝর
বিব্রত বসিয়া আছি অভিভূত অনির্দিষ্ট প্রেমে
শিরো'পরে পাংখা ঘোরে তবু, সখা, উঠিয়াছি ঘেমে।

দাঁড়ায়ে দ্বারের পাশে, ভাদ্র আর্দ্র-বাসা
চোখে মুখে সর্ব-অঙ্গে ভাষা
কৃষ্ণ-আঁখি-তারকায় চমকিছে বিজলী নিদয়
গুরু-গুরু-গুরু-গুরু করিতেছে মেঘ, না, হৃদয়!
ভেক কলরব ও কি ? কেকার ক্রেংকার ?
অথবা এ আর্ত্তনাদ নিষ্পিষ্ট অবচেতনার ?
করিতে পারি না ঠিক তাহা
ব্যাকুল পাপিয়া কণ্ঠে ভেসে আসে—কাঁহা, পিউ কাঁহা!
মনে হয় যাই অভিসারে
খুঁজি তারে এ জীবনে পাইনি যাহারে
চলে যাই চিরন্তন পথ চিনে-চিনে
কিন্তু হায় পায়ে বাত, শুগার ইউরিনে!
লজ্জা পাই, দুঃখ পাই, ভেবে সারা হই
হেনকালে শুনিলাম—মাভৈঃ, মাভৈঃ।

কালী আমারেও ভাই দেখাল শরণী
(নয় তব তিল-ঠোঁটী কাজল-নয়নী)

কালীর দোয়াত মোর,—সে আমারে ডাক দিয়া কহে
"ডুব দাও এই কালীদহে,
কামনা নাগের শিরে দাঁড়াইয়া পাসরি
কবি তুমি, বাজাও বাঁশরী।"
কবিতায় পত্র তাই লিখিনু নির্ভয়
বাঁশরী বাজিল কি না তুমি তাহা করিও নির্ণয়।

কবিতার সার মর্ম এই
কালী পূজা ভিন্ন জেনো বাঙালীর অন্য গতি নেই !
সে কালী মানবী কভু, লজ্জা-বতী, ঘোমটা-টানা,
কোমল-রসনা
কভু তিনি লোল-জিহ্বা, খড়্গ-হস্তা দেবী দিগ্বসনা।
কখনও দোয়াতে তিনি যাদুকরী কালী,
কলমের মুখে বসি করেন ঘট্‌কালি,
মিলাইয়া দেন নিত্য কবি ও রসিকে।
নিখিলের মর্মবাণী কাব্যে যান লিখে।

ইতি
তোমার বাল্যবন্ধু
নবদ্বীপচন্দ্র

———

আদর্শ

বুদ্ধদেব বসু

রমলা বাড়ি ফিরেছে দশ মিনিটও হয়নি, এমন সময় পরদা ঠেলে অনিমেষ ঘরে এলো।

তিনদিক-খোলা লম্বাটে ঘর; দু-দিকে দু-সেট সোফা আড় করে পাতা; দেয়াল ঘেঁষে মাছের বাক্স, শেলফে নানা রঙের শাঁখ, বেতের ঝুড়িতে একটি অসূর্যম্পশ্যা লতা বড়ো হচ্ছে। ধবধবে সাদা দেয়ালে একটিমাত্র ছবি : সরু কালো ফ্রেম থেকে একটি দু-বছরের সুশ্রী গোলগাল মেয়ে কিছুটা অবাক-চোখে জগতের দিকে (বা ক্যামেরার দিকে) তাকিয়ে আছে। ঘরটিতে আকারের পক্ষে আসবাব কম, বেশ একটা খোলামেলা ভাব, মানুষের নিশ্বাস তাকে বেশি আবিল করে না ব'লে ভিতরকার বাতাস যেন টাটকা ও পবিত্র।

দক্ষিণের জানলার ধারে এলিয়ে ব'সে ছিলো রমলা, তার পিছনে একটি দাঁড়ানো আলো জ্বলছে, অর্ধেক ঘর অন্ধকারে। অনিমেষ হালকা শরীরে ছায়া থেকে আলোয় এগিয়ে এলো। রমলা বললে, 'অনেকদিন পর।' তার ভঙ্গির কোনো বদল হ'লো না।

'হ্যাঁ, অনেকদিন আসিনি', অনিমেষ আহ্বানের অপেক্ষা না-ক'রে ব'সে পড়লো। মিনিটখানেক কেউ কোনো কথা বললে না।

আগে একটি, তারপর দু'টি মস্ত বড়ো অ্যালসেশিয়ান নেকড়ের মতো হেলে-দুলে কাছে এলো। তারা অনিমেষের জুতো শুঁকলো প্রথমে, তারপর পা শুঁকলো, গা শুঁকলো। ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিয়ে তাদের আদর করলো অনিমেষ। জিগ্যেস করলে, 'কোথায় ছিলো এরা?'

'যেখানে খুশি থাকে।'

'ছেড়ে রাখো সব সময়?'

'প্রায়—কিন্তু আমি ঠিক জানি না, মালি ছাখে ওদের।'

'কাউকে তাড়া করে না?'

'তোমাকে করবে না—নিশ্চিন্ত থেকো। একদিন শেষরাত্রে আমার ঘরে এসে খুন ক'রে রেখে যেতে পারো আমাকে।'

বিস্ময়, প্রায় বেদনা ফুটলো অনিমেষের মুখে। রমলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী হয়েছে? মেজাজ অত খারাপ কেন?' তার দৃষ্টি তখনই স'রে এলো না, লক্ষ্য করলো রমলার গোল ছাঁদের মুখ, গালে রঙের আভা, ঠোঁটে ঘন প্রলেপ, চোখের কোলে ক্লান্তি। 'এইমাত্র ফিরলে কাজ থেকে?'

রমলা জবাব দিলো না।

'হঠাৎ এসে তোমার অসুবিধে করলাম বোধহয়। কিন্তু আমার টেলিফোন নেই, মরজিও অস্থির, ও-সব খবর-টবর দিয়ে দেখাশোনা পোষায় না।'

এবারেও কথা বললে না রমলা। রাজা-রানী, অ্যালসেশিয়ান দম্পতি, কর্ত্রীর হাঁটুতে একবার-একবার মাথা ঘঁষে অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান সেরে বেরিয়ে গেলো। মুখের উপর দৃষ্টি অনুভব করলো অনিমেষ, একটি তীক্ষ্ণ, চেতন অথচ নিস্তাপ দৃষ্টি, যা, সিনেমার পরদায় অসংখ্যবার উদ্ভাসিত হ'য়ে, সারা বাংলার মনোহরণ করেছে। পানওলা সেই চোখের তলায় গ'লে যায়, তরুণী স্ত্রীর পাশে শুয়ে কলেজের প্রোফেসর তার স্বপ্ন ছাখে।

পকেট থেকে একটা হলদে রঙের প্যাকেট বের করলো অনিমেষ। একটি মাত্র সিগারেট ছিলো তাতে, সেটি ধরিয়ে তুমড়ে ছুঁড়ে ফেললে প্যাকেটটা। পা দুটো মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি কেমন আছি জিগ্যেস কোরো না। ভালো আছি।'

'আমি তো জিগ্যেস করিনি।'

'আমি জানি আমি দেখতে খুব বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছি—তা বয়সও তো হচ্ছে। কাপড়-চোপড়ের দিকে আর তাকাই না—গায়ের জামাটা খুব ময়লা মনে হচ্ছে তোমার?'

রমলা তাকিয়ে ছিলো মেঝের দিকে, দেখছিলো অনিমেষের বিবর্ণ স্যাণ্ডেল, পায়ে সাত রাজ্যির ধূলো। হঠাৎ বললে, 'একটা নাপিত ডাকিয়ে নখগুলো তো কাটাতে পারো।'

'সময় হয় না। তা তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। শুটিং ছিলো?'

রমলার বড়ো-বড়ো তরল চোখ দু'টি বুঁজে এলো মুহূর্তের জন্য।

ভোর ছ-টায় বেরিয়েছে। সাতটা থেকে দশটা মহামায়া ফিল্মস, এগারোটা থেকে একটা ইন্দ্রপুরী, দেড়টায় দু'টো স্যাণ্ডউইচ আর এক পেয়ালা কফি, তিনটেয় টালিগঞ্জ থেকে বরানগর, পাঁচটায় আবার টালিগঞ্জ। বার-বার নতুন মেক-আপ, রং ধুয়ে নতুন ক'রে রং মাখা; একটি কথা, একটি হাসি, একটি ভঙ্গির কতবার ক'রে পুনরাবৃত্তি। এমনি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কিন্তু···ভালো তো। টাকা চাই, এইবেলা ক'রে নিতে হবে, ক-দিন আর হুজুগ থাকবে তার। দশ বছর আগেকার প্রাণেশ্বরী বিজলী দাম আজ মায়ের পার্ট পেলে ব'র্তে যায়। প্রযোজকদের দোরে-দোরে ঘুরে বেড়ায় রেখা মল্লিক।···আর তাছাড়া সময়ও কাটে। এত ক্লান্ত হয় যে বালিশে মাথা রাখামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। সেটাও মস্ত বাঁচোয়া।

নেপালি আয়া ঘরে এসে একটি বড়ো ধোঁয়া-ওঠা পেয়ালা রাখলে রমলার সামনে। দোমড়ানো হলদে প্যাকেটটা মেঝে থেকে তুলে নিলে, অ্যাস্-ট্রে এগিয়ে দিলে অনিমেষকে।

'দুধ খাবো না, কাঞ্চী। ঠাণ্ডা এক গ্লাশ লেবু-জল দাও। —তুমি? চা, কফি কিছু?'

'আমি সন্ধ্যের পর কী খাই, তা-তো জানো। আর তুমি তা রাখো না তাও আমি জানি।'

'রোজ খাও?' যেন অনিচ্ছায় বেরিয়ে গেলো রমলার মুখ দিয়ে।

'জোটাতে পারি কই রোজ। তা দুধটা খেয়ে নাও না তুমি—ভালো জিনিষ, শরীর ভালো থাকবে।'

চোখ ঝলসে উঠলো রমলার। 'হ্যাঁ, শরীর ভালো রাখা চাই। শরীর ছাড়া আর কী আছে আমার?'

'কোনো মেয়েরই নেই। কোনো মানুষেরই নেই।'

'শুধু বোধহয় তোমার মতো দু-চারজন মহাপুরুষের আত্মা নামক একটা পদার্থ আছে?'

একটি সরল হাসি ছড়িয়ে পড়লো অনিমেষের মুখে। তার রোগা, প্রৌঢ়, অকালপ্রৌঢ় মুখটাকে মুহূর্তের জন্য শিশুর লাবণ্য ছুঁয়ে গেলো। পকেট থেকে একটি সিকি বের ক'রে বললে, 'এক প্যাকেট চারমিনার যদি আনিয়ে দাও।···না, আর-কিছু খেতে পারি না আজকাল। তোমার কি খারাপ লাগে চারমিনারের গন্ধ?'

'লাগলেই বা উপায় কী।' রমলা হাত বাড়িয়ে সিকিটি তুলে নিলে, ড্রাইভারকে ডেকে আনতে দিলে চারমিনার।

'তাই তো। ওটা খুব ফ্যাশন হয়েছে আজকাল, তোমাদের মহলেও চলে নিশ্চয়ই? বাঁচা গেছে। যা দাম অন্য সিগারেটের।'

রমলার মনে পড়লো তার বিয়ের পরে প্রথম মাসটা—কী ভালো লাগতো ভেসে-আসা গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ, আর সেই গন্ধে-ভরা অনিমেষের মুখের নিশ্বাস। কেমন একটা পুরুষালি প্রকাশ পেতো ওতে, আর সিগারেট মুখে তুলতে গিয়ে পাঞ্জাবীর ঢোলা হাতা যখন স'রে যেতো, সেই পুষ্ট মজবুত হাতের কব্জিটা! লোকটা কোথায় নিয়ে এসেছে নিজেকে।

কাঞ্চী দুধ সরিয়ে নিয়ে লেবুজল দিয়ে গেলো। আর চারমিনারের প্যাকেট। অনিমেষ বললে, 'কই, আমার কথার জবাব দিলে না? শুটিং ছিলো আজ?'

'ছিলো।'

'অনেকগুলো?'

'অনেকগুলো।' রমলা নিজের মনে অবাক হ'লো যে সব কথার জবাব দিচ্ছে।

'বিরক্ত লাগে তো বোলো। কেটে পড়বো। শুটিং করা যা কষ্ট, সত্যি। ঐ দশ হাজার পাওয়ার আলোর গরমে ভূতের মতো রং মেখে হাত-পা নাড়া! কী ক'রে পারো?'

রমলা সরু চোখে তাকালো—'তোমার কি মনুষ্যত্ব ব'লে কিছু আছে, অনিমেষ রায় ?'

ঠোঁটের কোণে হাসলো অনিমেষ। সদ্য-আনা টেবিলে-শোওয়ানো প্যাকেট থেকে বাঁ হাতে একটি সিগারেট টেনে নিলে। নিজের কথার জের টেনে বললে, 'সিনেমায় যারা অভিনয় করে আমার মনে হয় তারা আশ্চর্য প্রতিভাবান।'

'তা মনে হওয়াটা অনিমেষ রায়ের পক্ষে খুব সুবিধাজনক।'

'আমি ঠাট্টা করছি না—এ-বিষয়ে কিছু ভেবেওছি।' মাথা উচু ক'রে সীলিঙের দিকে ধোঁয়া ছাড়লো অনিমেষ। 'শুধু যে শরীরের কষ্ট তা নয়। সিনেমার ধারাবাহিকতা নেই। দু-মিনিট, এক মিনিট, কুড়ি সেকেণ্ডের এক-একটি "দৃশ্য" এক-এক বারে তোলা হচ্ছে। শেষেরটা আগে, আগেরটা পরে, পুরো ব্যাপারটা কী তাও ভ'লো করে জানে না কেউ, শুধু সেই মুহূর্তের ভাবটিকে সেই মুহূর্তেই ফুটিয়ে তোলা। আর এমনি—দিনে একবার নয়, তিন, চার, পাঁচবার—কোনোটায় পল্লীবালিকা, কোনোটায় কলকাতার ধনীর দুলালী, আর কোথাও হয়তো দস্যু মোহনের বীরাঙ্গনা। একই দিনে, পর-পর এত-গুলো মুখোশ পরতে হবে, হ'তে হবে এতগুলো ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কোনোটায় কান্না, কোনোটায় চটুলতা, কোনোটায় বা অশ্বপৃষ্ঠে দেশোদ্ধার। আশ্চর্য না ? আর এই সব—প্রত্যক্ষ ভদ্র-মণ্ডলীর চোখের বাইরে, হাততালির আড়ালে, ইন্সপিরেশনের পরপারে। রঙ্গমঞ্চের ব্যাপার বোঝা যায় ; সেখানে রচনার পারম্পর্য আছে, নিজের একটা গতি আছে, সামনে আছে উৎসুক দর্শকেরা—মিনিটের পর মিনিট কাহিনী যেমন এগিয়ে চলে, অভিনেতাও মেতে উঠতে পারেন, আবিষ্ট হ'তে পারেন, তখনকার মতো ভুলে যেতেই পারেন তিনি রাম বা নিমচাঁদ বা জীবানন্দ ছাড়া আর-কিছু। দর্শকদের উৎসাহও তাঁকে ঠেলে দিতে পারে চূড়োয়। তিন বা চার ঘণ্টার জন্য এক হয়ে যায় তাঁর আর্ট আর জীবন—আর তিন বা চার ঘণ্টার জন্য সেটাকে সম্ভব বলেও ধারণা করা যায়। কিন্তু দেড় মিনিটের জন্য আর্টিস্ট হওয়া!

পঁচিশ সেকেণ্ডের জন্য আর্টিস্ট হওয়া! শুনতে হাসি পায় কথাটা, কিন্তু তা-ই তো ঘটছে আজকের দিনের জগৎ ভ'রে—দিনের পর দিন। আর সবচেয়ে যা আশ্চর্য, সেই দেড় মিনিট বা কুড়ি সেকেণ্ডের অসংলগ্ন টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে-দিয়ে, সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে জোড়া দিয়ে-দিয়ে, শেষ পর্যন্ত যা রচিত হচ্ছে তা রীতিমতো একটি ধারাবাহিক উপাখ্যান, তাতে হাসিকান্না সবই ঠিকমতো বিন্যস্ত হয়েছে—দেখে কে বলবে যে মায়ের শোকের দৃশ্যটি অভিনীত হয়েছিলো সন্তানের মৃত্যুর হয়তো আটমাস আগে, চোখের সামনে রোগী ছিলো না, রোগশয্যা ছিলো না—শুধু ছিলো কতগুলো জোরালো আর্কল্যাম্প আর জোরালো ক্যামেরা, আর তাদের পিছনে কয়েকজন পরিশ্রমী, উপার্জনকারী বাস্তব মানুষ! কিন্তু ঠিক সেই কারণেই সিনেমায় অভিনয়কে আমি অত্যন্ত উঁচু দরের একটি আর্ট বলবো—তাতে সবই বানানো ব'লে, কৃত্রিম ব'লে, তাতে প্রেরণার স্থান একেবারেই নেই ব'লে। সেই কবি—যিনি তাঁর সনেটের ত্রয়োদশ লাইন আজ লিখলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন পরের মঙ্গলবারে, একমাস পরে নবম লাইন, আর এমনি ক'রে-ক'রে রচনা করলেন একটি বেগবান, অমোঘ, বহুলাঙ্গ কবিতা—সেই কবিকে পাবার জন্য কী আমরা না-দিতে পারি! কিন্তু তা হবার নয়, লেখায় তা কখনোই হবার নয়—ফিল্মের অভিনয়ে ছাড়া আর-কিছুতেই তা সম্ভব হয়নি এখনো।'

অনিমেষ যতক্ষণ কথা বলছিলো, রমলা লেবুর গ্লাশে চুমুক দিচ্ছিলো মাঝে-মাঝে, আর কেমন একরকম অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে দেখছিলো অনিমেষকে। ঘরে আর-কেউ থাকলে তার মনে হ'তে পারতো রমলা কথাগুলোতে মন দিচ্ছে না, যদিও বিষয়টা এমন, যাতে তার বিশেষ-কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। অনিমেষের কথায় খুশী হ'তে পারতো সে, কেননা সিনেমার অভিনেত্রীকে নিয়ে লোকেরা রাস্তায় দাঙ্গা বাধালেও সাধারণত কেউ তাকে শ্রদ্ধার চোখে ছাখে না—কিংবা পারতো প্রতিবাদ করতে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারতো যে অভিনয় ব্যাপারটা কোনো "আর্ট"ই নয়, তাতে যা প্রয়োজন হয় তা—

প্রতিভা নয়, সপ্রতিভা—আর অবশ্য রূপযৌবন—যে তার রহস্য খুঁজতে খুব বেশীদূর যেতে হয় না, পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্নটি মুখবিকৃতি আয়ত্ত ক'রে নিলেই মোটামুটি কাজ চালানো যায়। তার, রমলার এই পাঁচ বছরেই ব্যাপারটা একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে: সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, ঈর্ষা, স্নেহ, প্রেম, ঘৃণা প্রভৃতির জন্য এক-একটি নির্দিষ্ট বোতাম আছে যেন, টিপলেই মুখে আলো জ্বলে ওঠে, কণ্ঠস্বর ওঠা-নামা করে। কতবার সে শুনেছে যে শুধু তাকে দেখতে—তার গোল-ছাঁদের মুখ আর বড়ো-বড়ো চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখার জন্য—সকাল ন-টা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছাত্র মজুর বৃদ্ধ বেকার হাজার-হাজার। তাও ছবিতে, ঘেন্না!

কিন্তু রমলা যা বললে তা শুধু এই—'তুমি সিনেমা ছ্যাখো?'

'দেখি মাঝে-মাঝে। রাত ন'টায় হঠাৎ এক-একদিন ঢুকে পড়ি কোথাও। চমৎকার বিশ্রামের জায়গা, যা-ই বলো। ঠাণ্ডা ঘর, আরামের আসন, আর চোখের সামনে দিব্যি পর-পর ঝকঝকে ছবি ভেসে যাচ্ছে। ভালো না-লাগলে বেরিয়ে যাই, বেশী গান থাকলে বেরিয়ে যাই। ঘুমিয়েও পড়ি কখনো-কখনো।'

'মাঝে-মাঝে শেষ পর্যন্ত ছ্যাখো?'

'বাঃ, তা দেখি বইকি।'

'আগে তো একেবারেই যেতে না,' খুব হালকা ক'রে বললো রমলা।

হঠাৎ অনিমেষ একটু লাল হ'লো। কথাটার সোজাসুজি জবাব না-দিয়ে বললে, 'তোমার "স্বপ্নভঙ্গ" দেখে এলাম সেদিন। অভিনয় ভালো করেছো, কিন্তু কী নির্বোধ গল্প!'

'ধন্যবাদ। তোমার কাছে সার্টিফিকেট চাইনি। জেনে রাখো —তিন সপ্তাহে দু-লক্ষ টাকা বিক্রি হয়েছে—এখনো খুব চলছে— তোমার কেমন লাগলো বা না লাগলো তাতে কিছু এসে যায় না।'

অনিমেষ নরম গলায় আওয়াজ ক'রে হেসে উঠলো। 'সত্যি, আশ্চর্য তুমি! মাত্র পাঁচ বছরে কী করেছো! জমি, বাড়ি, গাড়ি, অ্যালসেশিয়ান কুকুর পর্যন্ত। একটা বাচ্চা দিলে না আমাকে?'

রমলা জবাব দিলো না কথার। টালিগঞ্জের অতি নির্জনে এই বাড়ি

তার, হঠাৎ যেন খেয়াল হলো কী নির্জন তার চারদিক, কী নিস্তব্ধ। আধ বিঘে জমির মধ্যে ছোট্ট মনোরম একতলা; লোহার গেট, গেটে দারোয়ান, ভিতরে শিকারি কুকুর, সিন্দুকে কোন না সত্তর হাজার টাকা—ইনকাম-ট্যাক্সের ভয়ে ব্যাঙ্কে পাঠাতে পারে না—মাঝে-মাঝে পাগলের মতো গয়না কেনে। গয়নাগুলো খুকুর জন্য—কিন্তু খুকুই বা কী করবে অত গয়না দিয়ে, টাকা দিয়ে?

'বাচ্চা তোমাকে দেবো না—মেরে ফেলবে। এক-একটা বেচে দিয়েছি পাঁচশো টাকায়। হ্যাঁ, অনেক করেছি এই ক-বছরে, বিস্তর টাকা বাড়িতেও থাকে, একদিন আমাকে খুন ক'রে নিয়ে যেতে পারো।'

'কেন, খুন না-করলে দেবে না?'

'তাও তো বটে। যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কি মারে কেউ?'

'এটা অন্যায় বললে। আমি তো বেশী নিই না তোমার কাছে—খুব বেশি দরকার না-হ'লে নিইই না।'

'তা নেবে কেন—মহানুভব ব্যক্তি তুমি! তা একটা কথা বলি—ও-রকম জামা-কাপড় প'রে রাস্তায় বেরোতে লজ্জা করে না তোমার?'

'তা করে না তা নয়, কিন্তু উপায় কী। আমার বইয়ের তো বিক্রি নেই—আর আজকাল লিখিও খুব কম।'

'তাহ'লে করো কী সারাদিন?'

'কী করি তা তো জানো তুমি। লিখি।'

'তবে যে বললে কম লেখো?'

'মানে—লিখি, আর ফেলে দিই। পছন্দ হয় না।'

'বাবুগিরি!' রমলার মুখ দিয়ে কথাটা আস্তে বেরিয়ে এলো।

'তা কোথাও একটা বাবুগিরি থাকা তো চাই। অন্তত একটা। সেই একটিকে বজায় রাখতে গিয়ে অন্যগুলিকে ছাড়তে হয়, তো সেও ভালো। মাঝে কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করলাম।'

'কী চাকরি?'

'মাষ্টারি, কেরানিগিরি, সব-এডিটরি—যা হয়। ক-টাই বা চাকরি আছে দেশে। কিন্তু হ'লো না। আমার কোনো যোগ্যতা নেই।'

'সেটা তোমার মত ? না চাকরিদেনেওলাদের ?'

'কোথাও যখন হ'লো না, তার মানেই আমার যোগ্যতা নেই। একটা স্কুলমাস্টারি প্রায় পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁরা কী ক'রে জেনে গেলেন আমার চরিত্র ভালো না, স্ত্রীকে ত্যাগ করেছি।'

মুহূর্তের জন্য আধো চোখ বুঁজলো রমলা। ভিতরে-ভিতরে বুক তার ফেটে যাচ্ছিলো।

'স্ত্রীকে ত্যাগ করেছি—সে-বেচারা পেটের জ্বালা সইতে না-পেরে ফিল্মে নেমেছে। এমন লোকের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ তুলে দেয়া যায় কী ক'রে। কথাটা সত্য, কাজেই—' অনিমেষ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কুড়িটা টাকা দাও তো।'

'মাত্র কুড়িটা ?'

'আচ্ছা, পঁচিশটা দাও। হরিপদর একমাসের মাইনে, আর আমার জন্য পাঁচটা।'

'ক-মাস বাকি পড়েছে হরিপদর ?'

'সে আর শুনে কী করবে।' হাসলো অনিমেষ। 'মুশকিল এই, সে আমাকে ছেড়েও যায় না। আমার আজকাল্ দিব্যি চ'লে যায় ওকে ছাড়া, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে ছেড়ে ও-ই টিঁকতে পারবে না। বিশেষত, তুমি আলাদা হ'য়ে গেছো ব'লে করুণা করে আমাকে। আমার ভালো লাগে না সেটা—কিন্তু সহ্য করি।'

'একদিন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতে পারো না তাকে ?'

'ছি!' অনিমেষ গম্ভীর হলো। 'তুমি কি ভাবো কাউকে আমি আঘাত দিতে পারি ?'

'বলছে কী লোকটা ? উন্মাদ!' রমলার দাঁতের ফাঁক দিয়ে চাপা একটা চীৎকার বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু অনিমেষের ভাবান্তর হ'লো না ; রমলার আর্তস্বর যেন শুনেও শুনলো না সে। নীচু গলায় বললে, 'হরিপদকে ভক্তি করি আমি। সে আমার চেয়ে অনেক, অনেক উঁচু দরের মানুষ। কিন্তু সেটাই আরো বেশী অসুবিধে আমার পক্ষে—আমার বিবেকের উপর মস্ত বোঝা

হ'য়ে বসেছে লোকটা। আমার নিজের ছোটোখাটো কাজ আছে দু'একটা—আমি চাই না অন্য কারো ভার নিতে, অন্য কারো উপর ভার হ'তে—অন্য কারো জন্য বা কারো কাছে দায়ী হ'তে চাই না আমি।' অনিমেষ হঠাৎ থেমে গেলো, যেন বড্ড বেশী ব'লে ফেলেছে। অন্য রকম গলায় বললে, 'টাকাটা দাও। যাই।'

রমলা নীচু হ'য়ে একটি হালফ্যাশানের বেতের হাতব্যাগ তুলে নিলো মেঝে থেকে। ডালা খুলে একগোছা নোট রাখলো টেবিলের উপর। 'যা ইচ্ছে নাও।'

'সব তো একশো টাকার নোট দেখছি। খুচরো নেই?'

'ও-ঘরে আছে। উঠতে ভালো লাগছে না এখন।'

'কেউ ভাঙিয়ে আনতে পারে না!'

'তুমি সব নিয়ে গেলেও কিছু টের পাবো না আমি।'

'তাহ'লে একটা নিই। হরিপদর সঙ্গে আধাআধি বখরা হবে না কি আগে বাড়িওলাকে—' কথা শেষ না-ক'রে একটি একশো টাকার নোট ছোটো ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখলো অনিমেষ, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো দরজার দিকে, যেন চ'লে যাচ্ছে।

তার বর্তমান বাসস্থানটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো রমলা। কিন্তু মনের চোখে ভেসে উঠলো সেই জামির লেনের একতলা, যেখানে বিয়ের পরে দু-বছর ছিলো তারা। পাড়া তেমন ভালো না, বাড়িটাও পুরোনো, কিন্তু সেইজন্যেই পিছনে একটু জমি ছিলো, একটা বেঁটে আর মজবুত কাঁঠালগাছ পর্যন্ত। মাঝে-মাঝে সেই বাড়িটার স্বপ্ন ছাখে রমলা—আর-কিছু নয়, শুধু সেই বাড়িটা, আকারে-প্রকারে হয়তো কিছু অন্য রকম, হয়তো স্থানকালও ভিন্ন—ছেলেবেলার বেড়াতে-যাওয়া জশিডিতে হয়তো, বা একরাত-কাটানো সিলেটের নদীর ধারের বাংলো—কিন্তু ঠিক সেই বাড়ি ব'লেই স্বপ্নের মধ্যে চিনতে পারে সে, আর একটা অসহ্য বুকচাপা কষ্টে ঘুম ভেঙে যায়। এখনকার বাড়ি কেমন? বাড়ি? না একটা ঘর শুধু? কোনোরকম একটা বাসস্থান? বাড়ির রাস্তা, নম্বর, কিছুই জানে না রমলা, অনিমেষ বলেনি, সেও জিগ্যেস করেনি।

শুধু শুনেছে, সস্তার জন্য এই টালিগঞ্জের বন-বাদাড়ের মধ্যে কোথায় উঠে এসেছে।

ভারী চোখ তুলে তাকালো রমলা, কিন্তু সেই মুহূর্তে অনিমেষ দাঁড়িয়ে ছিলো তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, দু-বছরের মেয়েটির ফোটো-গ্রাফের সামনে। প্রায় পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো সে। স'রে এসে খুব সহজ সুরে বললে, 'খুকু কেমন আছে?'

'খুব ভালো।'

'খুশিতে আছে?'

'হ্যাঁ, অনেক বন্ধু হয়েছে, মাদাররাও ভালোবাসেন খুব।'

'তুমি শেষ কবে গিয়েছিলে?'

'এই তো দু-মাস আগে। দু-একটা দিন ফাঁক পেলেই চ'লে যাই। সেদিন ছবি পাঠিয়েছে—দেখবে?'

রমলা উঠে পাশের ঘরে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো মস্ত একটা খাম হাতে ক'রে। নানা বয়সের, নানা ভঙ্গির খান-পঁচিশ ছবি ছড়িয়ে দিলে টেবিলের উপর। আশ্চর্য একটা কোমল আভা ছড়িয়ে পড়লো তার চোখে-মুখে।

অনিমেষ জিজ্ঞেস করলে, 'শেষ ছবি কোনটা?'

'এই যে! তেমন ভালো হয়নি, স্কুলেরই একটি মেয়ের তোলা।'

'খুব স্বাস্থ্যবতী হয়েছে।'

'তা-ই না? একেবারে বিলিতি মেয়েদের মতো। আটও পোরেনি, এখনই সাড়ে-চার ফুট লম্বা! পড়াশুনোতে—'

'বাংলা শিখেছে?'

'বাংলাও আছে ওদের, তবে কথাবার্তা তো ইংরেজিতেই। মাদার বলছেন একটু অল্প বয়সেই ওকে যদি বিলেতে পাঠানো যায়—'

'হ্যাঁ, ফিরিঙ্গির সংখ্যা বাড়বে আরকি। রামায়ণ মহাভারত পড়ায় ওরা?'

ছোট্ট একটি আশার কণা রমলার চোখে জ্ব'লে উঠলো। মুখ উঁচু ক'রে বললে, 'তুমি কাছে রাখো না মেয়েকে। পড়াবে। মানুষ করবে।'

'পাগল!'

'আচ্ছা ধরো কার্সিয়াঙের কনভেন্ট থেকে ছাড়িয়ে আমার কাছেই এনে রাখলাম। তুমি রোজ এসে পড়াবে? মাঝে-মাঝে?'

'মাপ করো।'

'কেন, মাষ্টারি খুঁজছিলে তো। আমি মাইনে দেবো তোমাকে। কত চাও?'

অনিমেষ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো। 'এ-সব ছেলেমানুষি ছাড়ো। তোমার মেয়ে—তুমি যে-ভাবে যা পারো তাই করবে তাকে নিয়ে।'

'তোমার কিছু নয়?'

'সবই জানো, তবু কেন জিগ্যেস করো। বাবা হওয়া ধাতে নেই আমার।'

'কিন্তু হয়েছিলে তো।'

'বাবা হওয়া অতই সোজা নাকি? কত ত্যাগ, কত ধৈর্য, কত কষ্ট, তবে তো বাবা।'

'সবই বোঝো দেখছি।'

'বুঝি বইকি। আমি মানুষটা যে ভালো নই তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে।'

'বোঝো যদি, তবে শোধরাবার চেষ্টা করো না কেন?'

'পারি না।'

'চেষ্টা ক'রে দেখেছো?'

'পারি না মানে ক্ষমতা নেই তা নয়। উপায় নেই।'

'উপায় নেই কেন?'

'তাতে অন্য দিকে ক্ষতি হয়।'

কোন দিকে ক্ষতি হয়, তা রমলা জিগেস করলে না। ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললে, 'দাঁড়িয়ে আছো কেন অতক্ষণ? আমার ঘাড় ব্যথা হ'য়ে গেলো। বোসো।'

এবার অনিমেষ বসলো রমলার মুখোমুখি নয়, তার পাশের চেয়ারটিতে। রমলা তার দিকে এগিয়ে দিলে অ্যাশট্রে, সিগারেট প্যাকেট। ঘুরে বসতে গিয়ে একবার চোখাচোখি হলো অনিমেষের

সঙ্গে। অনিমেষ চোখ নামিয়ে নিলে, তার মনে হ'লো কেমন অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে রমলার চোখ।

'যদি উপার্জন করতে চাও তার উপায় ব'লে দিতে পারি তোমাকে।'

'বলো।'

'ফিল্মের জন্য গল্প লেখো।'

'তাও ভেবেছি। কিন্তু আমি পারবো না—পারি না।'

'ঠাট্টা ক'রে বাজি রেখেও পারো না?'

'না। যার মধ্যে যা নেই। আমি যা লিখতে পারি তা কোনো ফিল্মওলার পছন্দ হবে না।'

'পছন্দ হবার ভার আমি নিচ্ছি'—বলে নিবিড় আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো রমলা। তুমি লেখো।'

'তোমার মন রাখার জন্য কেউ হয়তো রাজী হবে। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তির লোকশান ঘটাবে কেন?'

'সেই "নিরপরাধ ব্যক্তি" যদি আমি ভাবছি প্রোডিউসার হ'য়ে যাবো এবার। অভিনয় ছেড়ে দেবো আস্তে-আস্তে, লোকেরা সরিয়ে দেবার আগে নিজেই স'রে পড়বো। তাছাড়া খুকুর কথাও ভাবি। তাহ'লে ও আমার কাছে এসে থাকতে পারবে, আমি বাড়ি থাকার সময় পাবো। দেবে একটা গল্প লিখে আমাকে?'

'তোমার টাকাই বা নষ্ট হ'তে দেবো কেন আমি!'

'নষ্ট হবে না। গল্পটাও ব'লে দিতে পারি তোমাকে—'

'ও। গল্প ব'লে দেবে?' ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি ফুটলো অনিমেষের।

কিন্তু রমলা সেই বিদ্রূপের সেই গর্বিত ভঙ্গির কোনো জবাব দিলে না। মধুর ও বিষণ্ণ দেখালো তাকে, যখন বললে, 'হ্যাঁ, দু-একটা গল্প আমিও বলতে পারি বইকি। যদি দয়া ক'রে শোনো।'

'বলো।'

'মফস্বলের একটি মেয়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলো। সরল, ঔৎসুক, বিশ্বাসপ্রবণ, দেখতে ভালোই। দ্বিতীয় বছরে একটি যুবকের

সঙ্গে দেখা হ'লো তার। যুবকটি এম-এ পড়ে, উশকোখুশকো অস্থির দেখতে, কাগজেপত্রে লেখা বেরোয়। নাম আছে ছাত্রমহলে, প্রোফেসররাও খাতির করেন। তাকে দেখে মাথা ঘুরে গেলো মেয়েটির। মনে হ'লো যুবকটিরও তাকে ভালো লাগছে। এক বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেলো।

'মেয়ের বাপ মফস্বলে উকিল, উপার্জন প্রচুর, কিন্তু সন্তানও অনেক। হাতে কিছুই থাকে না। মা সেকেলে হিন্দু মহিলা, ভালোমানুষ গোছের, সংসারের চেয়ে পুজো-আর্চায় মন বেশি। ব্রাহ্মণ তারা।

'কিন্তু যুবকটি কায়স্থ। তা নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই তার, বলে— "চলো না যে-কোনোদিন রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসি।" কিন্তু মেয়ের মন কিছুতেই সায় দেয় না এতে। পুজোর ছুটিতে আসানসোলে গিয়ে (ধরো জায়গাটা আসানসোল) লজ্জার মাথা খেয়ে বাবাকে সে বললে সব। বাবা গম্ভীর হলেন, কিন্তু ছুটির পরে কলকাতায় এসে যুবকটিকে ডেকে পাঠালেন। তার, এবং কন্যারও দেহমনের যে-রকম অবস্থা দেখলেন তিনি তাতে বিয়েতে অনর্থক বাধা সৃষ্টি করা সমীচীন মনে হ'লো না তাঁর। মা হুলুস্থুল করলেন, কিন্তু বাবা টললেন না। তাঁর কী-রকম একটা ধারণা হয়েছিলো যে ছেলেটি ভালো।

'রেজেষ্ট্রি ক'রেই বিয়ে হলো। মেয়ের বাবার খুব টানাটানি চলছে সে-সময়ে। সাত-সাতজন স্কুলে পড়ুয়া সন্তান তার, কিছুদিন আগে নিজের অসুখে বিস্তর খরচ হ'য়ে গেছে। তবু তৈজসপত্র দিলেন কিছু, অল্প গয়না। ঘটাপটা কিছু হ'লো না। মেয়েকে বললেন, "একটা বড়ো কেস পেয়েছি, কিছুদিনের মধ্যেই সব দিতে পারবো তোকে, আর তখন একটা অনুষ্ঠানও করবো ভালো ক'রে।" কাকে বললেন? মেয়ের মন কি অন্য কোথাও আছে তখন?

'যুবকটির মা নেই, বাবার সঙ্গেও সম্বন্ধ ছিলো না। বি-এ পড়ার সময় দাদামশায়ের কিছু টাকা পেয়েছিলো সে—হাজার পাঁচেক— উড়িয়ে-পুড়িয়েও কিছু অবশিষ্ট আছে তখনো। বিয়ের পরে বোর্ডিং ছেড়ে বাড়িভাড়া নিলো—এবং এম-এ পড়াও ত্যাগ করলে।

'মেয়েটি অবাক হ'লো। "পড়া ছেড়ে দিলে?"

'ধ্যেৎ! কী হবে প'ড়ে? যত বাজে—! তুমিও ছেড়ে দাও।

'তা-ই হ'লো। কলেজ নেই, ভাবনা নেই, গৃহস্থালির আর কত-খুকু। কোনোদিন রেস্তোরায় খায়, কোনোদিন স্টোভে রেঁধে ভাত আর ডিমের ডালনা। যেন পাখির ঝাঁক আকাশে, এমনি উড়ে চললো দিনগুলি।

চারমাস পরে মেয়ের বাবা হঠাৎ থ্রম্বোসিসে মারা গেলেন। ছুটে গিয়ে মেয়ে তাঁকে দেখতে পেলেন না। শোকার্ত নিষ্ঠাবতী মা ভালো ক'রে কথা বললেন না, তাঁর ধারণা হয়েছিলো মেয়ে "বেজাতে" বিয়ে করার অপরাধেই এই সর্বনাশ ঘটলো। শ্রাদ্ধ পর্যন্ত কোনরকমে কাটিয়ে মেয়ে ফিরে এলো স্বামীর কাছে। আর ফিরে এসে পাপীয়সী বাপের শোকও ভুলে গেলো। "তুমি আছো, তুমি আমার সব।"

'কয়েকদিন আগে সে টের পেয়েছে সে অন্তঃসত্ত্বা।'

'বৌ ছাড়া আর-একটি নেশা ছিলো যুবকটির, পড়া। বাঁধা-ধরা কিছু না, হয়তো পুরো একটা সপ্তাহ কেটে যায় বই-পত্র কিছু না-ছুঁয়ে—বেরিয়ে গিয়ে, স্ত্রীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও, আজে-বাজে জিনিশ কেনে, বন্ধুদের জুটিয়ে পিকনিকে চ'লে যায় ডায়মণ্ড হারবার, কি বাড়ির পিছনের জমিতে ডালিয়া ফোটাবে ব'লে মাটি কোপাতে লেগে যায়। কিন্তু হঠাৎ এক-একদিন কোনো-একটা বই খুলে ব'সে একেবারে তলিয়ে যায় সে, ডাকলে শুনতে পায় না, চোখ তুলে বৌকে যেন ঠিক চিনতেও পারে না দু'এক সেকেণ্ড। ও-রকম মুহূর্তে মেয়েটির ভয় করে মনে-মনে, মনে হয় যেন অন্য আর-একটা মানুষ বেরিয়ে এসেছে ঐ ছিপছিপে বেপরোয়া ছেলেটির ভিতর থেকে—অচেনা কেউ, বড়ো কেউ। মাঝে-মাঝে কাগজ নিয়ে ব'সে লেখেও, কিন্তু লেখার ঝোঁক টেঁকে না।

'কী পড়ে? কী লেখে? কবিতা আর দর্শন পড়ে, গণিতের বই, বিজ্ঞানের বই, "হিস্ট্রি অফ উইচক্র্যাফট" নামে একটা মস্ত মোটা বই দু-দিনে শেষ ক'রে উঠলো। আর তার লেখা? কী লেখে, মেয়েটি ঠিক বুঝতে পারে না, এমনকি, ব্যাপারটা গদ্য না পদ্য, শেষ হয়েছে কি

হয়নি, তাও তার কাছে অস্পষ্ট। "লেখা শেষ করো না কেন?" জিগেস করলে মুখভঙ্গি ক'রে উঠে যায়।

'ভারি মাসে পড়লো বৌটি; পড়ার ঝোঁক, লেখার ইচ্ছে নিবিড় হ'লো স্বামীর। স্ত্রী বেশী বেরোতে পারে না, সেও সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে বন্দী। প্রেম করার সময় ও সুযোগ ক'মে এলো; রাত্রে লিখতে বসে, ঘুমোয় কম। আসন্ন ঘটনাটি নিয়ে মাঝে-মাঝে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে—ডাকে ডাক্তার, কেনে ওষুধ, শিয়রে ব'সে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়। আর-কোনো মেয়ে নেই বাড়িতে—মেয়ের মা দীর্ঘকালের জন্য তীর্থে গেছেন, আর ছেলেটি তার তরফের কোনো আত্মীয়কে ডাকতে রাজি নয়। অবশেষে, শীতের এক সন্ধ্যায়, আট ঘণ্টা যন্ত্রণার পর ঘটনাটি ঘটে গেলো। কে জন্মালো পৃথিবীতে? শুধু কি একজন নতুন মানুষ? না, একজন মা, আর-একজন মা। যারা কখনো মা হয়নি তারা কী করে তার অর্থ বুঝবে?'

'মন্তব্য শুনতে চাই না,' হঠাৎ বললো অনিমেষ, 'গল্পটা সংক্ষেপে বলো।'

রমলার রং-মাখা সুন্দর মুখ মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। লেবুর জলের তলানিটুকু এক ঢোঁকে গিলে ফেললো সে, ঝাপটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আবার ব'সে পড়লো তক্ষুনি। কপালে রেখা পড়লো, হাতের মুঠো বন্ধ হ'লো, ঘামের ফোঁটা চিকচিক করলো গালে। ফিশফিশ ক'রে বললে, 'শয়তান! রাক্ষস! মনে-প্রাণে ঘৃণা করি তোমাকে, কিন্তু তবু আজ আর-একবার আমি ছোটো হবো তোমার কাছে, হাঁটু ভেঙে লুটিয়ে পড়বো তোমার পায়ে, পোকা হ'য়ে হামাগুড়ি দেবো তোমার সামনে—আর এই শেষ, এই শেষ! তুমি কি ভাবো আমি যে তোমাকে সহ্য করি তা তোমার জন্য? তোমার মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছি ব'লে?'

অনিমেষ জবাব দিলো না কথার। তার চোখ কাঁচের মতো স্থির, ঠোঁটের কোণে হালকা একটু হাসি পর্যন্ত।

'মেয়ে হলো,' প্রায় একই রকম গলায় বলতে লাগলো রমলা,

'সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তন এলো তাদের জীবনে। এলো দায়িত্ব, বাধ্যতা, দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। রান্নার লোক রাখতে হ'লো, ঠিকে ঝি না-রাখলেও চলতে চায় না। বৌটি দুর্বল থাকলো অনেকদিন, পরিচর্যায় ত্রুটি করলেন না স্বামী। এত ভালোবাসে বৌকে, হাসপাতালে না-দিয়ে বাড়িতেই বড়ো ডাক্তার এনেছিলো, তিন সপ্তাহের জন্য ধাত্রী, থোকে পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেলো। বৌয়ের শরীর সারাবার জন্যেও কত যত্ন তার—আজ একটা দামী টনিক আনে, কাল আর-একটা, একদিন হয়তো পাঁচ টাকার আপেলই নিয়ে এলো। রাত্রে ব'সে-ব'সে লেখে, বাচ্চা কাঁদলে উঠে আসে, কিন্তু থামলেই আবার ফিরে যায় টেবিলে। দিনের বেলা, যখন ঝি থাকে, শিশুটার দিকে ফিরেও তাকায় না।

'শিশু যখন তিন মাসের তখন ধরা পড়লো সব টাকা ফুরিয়েছে। এদিকে সংসারে বাজে জিনিশ অনেক জমেছে, কিন্তু অপরিহার্য অনেক কিছুই নেই। আছে দশ রকমের চায়ের ট্রে, কটকি মান্দ্রাজি কাশ্মিরী পর্দা, নানা রঙের নানা ছাঁদের জামা জুতো, কিন্তু হাতা-খুন্তি নেই, শিল-নোড়া নেই, বাচ্চার ঠিকমতো বিছানা-বালিশ নেই পর্যন্ত।

যুদ্ধ চললো বেশ কয়েক মাস। শুধু অভাবের সঙ্গে নয়, স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যেও একটা হিংস্র, নিঃশব্দ অবিরাম যুদ্ধ। বৌটি চাকরি খুঁজলো, কিন্তু কি পাবে সে—বি-এ পর্যন্ত পাশ করেনি। তাছাড়া মেয়েকে ফেলে বেশিক্ষণ বাইরেই বা থাকে কেমন ক'রে। তাছাড়া কলকাতার হালচালের সঙ্গে, জীবনসংগ্রামের টেকনিকের সঙ্গে, তার তো কোন পরিচয় নেই। সবেমাত্র একুশ তার বয়স, আঠারো পর্যন্ত মফস্বলেই কাটিয়েছে, আর তার বাপের বাড়িতে মেয়েদের একটু আড়াল-আবডালও ছিলো। তবু সে সকালে একটা ট্যুশনি নিলে—স্বামী তখন বাড়ি থাকেন, ঝি তুলে দেয়া হয়েছে ব'লে মেয়েটার দিকে তাঁকে তাকাতেও হয় মাঝে-মাঝে।

স্বামীর অবশ্য উপার্জনের পথ খোলা ছিলো। সে অন্তত বি-এ পাশ, উঠে-পড়ে লাগলে জোটে কিছু। কিন্তু চাকরি? সপ্তাহে ছ'দিন নির্দিষ্ট সময়ে অন্যের হুকুমে বাড়ি ছেড়ে বেরোনো? না, পারে না,

সম্ভব নয় তার পক্ষে। কোনো এক রহস্যময় কারণে সকলে যা পারে সে তা পারে না। ছাত্রমহলে তার খ্যাতির স্মৃতি টাটকা ছিলো তখনো; ভালো টাকায় ট্যুশনি পাওয়া শক্ত হয় না, মাঝে-মাঝে নেয় না তাও নয়, কিন্তু দু-এক মাস পরেই ছেড়ে দেয়—পুরো টাকাও আদায় হয় না সব সময়। "বড্ড বোকা মেয়েটা!" "বিশ্রী বাজে বই!" এর উপর আর কথা নেই।

অথচ এই অবস্থার জন্য, আর নিজের এই অক্ষমতার জন্য, মনে-মনে অত্যন্ত ব্যথিত সে, খুবই চিন্তিত—এমন এক-একটা দিন যায় যখন স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি করে না। তাতে স্ত্রীর কষ্ট আরো বেড়ে যায়। কী সে না করতে পারে, কী সে না দিতে পারে ঐ একটি মানুষকে সুখী দেখতে, তার মনখোলা হাসি শোনার চেষ্টায় ভিতরে-ভিতরে দগ্ধ হচ্ছে সে। কেন ও চুপ করে থাকে, ব'সে থাকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, পায়চারী করে আনমনা—কেন বলে না, কাছে আসে না, টেনে নেয় না তার দুঃখের বুকে আমাকে? আমাকে দূর ক'রে দিচ্ছে কেন? না-না, আমি রাগ করিনি, আমি দাসী হয়ে থাকবো তোমার, ঘরে-ঘরে দাসীর কাজ করবো—শুধু আমার মেয়েটাকে দেখো তুমি, আর—আমাকে ভালোবেসো।

খুব নীচু গলায় বলছিলো রমলা, শেষের কথাটা প্রায় শোনাই গেলো না, একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে ডুবে গেলো।

মেয়ের প্রথম জন্মদিনের কয়েকদিন পরে স্বামী বাড়ি এলেন এক বন্ধুকে নিয়ে। সঙ্গে একজন অচেনা ভদ্রলোক। স্বামীর বন্ধুরা স্ত্রীরও বন্ধু হ'য়ে গেছে ততদিনে, অনেক খাওয়া-দাওয়া আড্ডা আনন্দে সঙ্গী হয়েছে তারা—কিন্তু মাঝে অনেকদিন কেউ আসেনি। চেনা গলার আওয়াজে খুশি মুখে এলো বৌটি। চা-বিস্কুট খাওয়ানো হ'লো।

তারপর অচেনা ভদ্রলোকটি আস্তে-আস্তে কাজের কথা পাড়লেন। বন্ধুটির দাদা তিনি, কাজ করেন উষা ফিল্মস-এ, আগে ক্যামেরাম্যান ছিলেন, ডিরেক্টর হ'য়ে ছবি করছেন এই প্রথম। "একটা ছোটো পার্ট আছে—কলেজের ছাত্রী—মাত্র তিন দিনের 'শুটিং' দশ-বারোটির বেশি

কথা নেই। আপনি দয়া ক'রে রাজী হ'লে অত্যন্ত আনন্দিত হবো।"

'পাগল নাকি!' শোনামাত্র বৌটি ব'লে উঠলো।

স্বামী বোঝালেন, স্বামীর বন্ধু বোঝালেন, বন্ধুর দাদা বোঝালেন। একেবারে "নির্দোষ" পার্ট, প্রেম-ফ্রেম কিছু নেই, বইখাতা হাতে ক'রে একবার ক্লাসে বসা; মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে (তিনিই নায়ক) একটু তর্ক, নায়িকার সঙ্গেও একবার দেখা হওয়া আছে। ব্যস। যাওয়া-আসার গাড়ি পাঠাবে, স্বামী যাবেন সঙ্গে, টাকা দেবে পাঁচশো।

'না-না, তা কী হয়!'

কিন্তু তা-ই হ'লো। ডিরেক্টরটি আর-একদিন এসে ফিরে গেলেন। "ভেবে দেখবেন, আবার আসবো আমি। কিন্তু বেশি আর সময় নেই, ব'লে যাচ্ছি।"

স্বামী বললেন, "কেন রাজি হচ্ছো না বলো তো?"

"তুমি সত্যি চাও আমি সিনেমায় নামি?"

"নামা কথাটা বিশ্রী—আমি সত্যি চাই তুমি ফিল্মে অভিনয় করতে পারবে—আর যে যা পারে তা না-করাটাই সত্যিকার অন্যায়।"

"কী করে জানলে পারি?"

"একবার করে দ্যাখো তো—ভালো না হয় আর কোরো না।"

মাত্র পাঁচ মিনিটের পার্ট, কিন্তু কী আশ্চর্য অনেকের চোখে পড়লো। কোনো কোনো কাগজেও নাম বেরোলো তার। পনেরো দিনের মধ্যে আর একটা প্রস্তাব এলো। এক বছরের মধ্যে তিনটে বড়ো বড়ো নায়িকার পার্ট করলো সে। ডিরেক্টর শতদল পাল তাকে রিজেন্টস পার্কে জমি কিনিয়ে দিলেন; বাড়ি তৈরি আরম্ভ হ'লো।

আর সেই বাড়ি যখন শেষ আর মেয়ের বয়স বছর তিনেক, স্বামী প্রস্তাব করলেন যে এবার তারা আলাদা হ'য়ে যাক। "তাতে তোমারও ভালো, আমারও ভালো। তোমার জীবন নিয়ে তুমি থাকবে, আমার জীবন নিয়ে আমি। চাও তো মাঝে-মাঝে দেখাশোনা হবে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর থাকবে না। আইনমাফিক ডিভোর্স তুমি

চাও তো হবে, তুমি না চাও তো হবে না। একটা কথা ঠিক জেনো যে আমি আর বিয়ে করবো না। বিয়ে—ঘরকন্না—ও-সব আমার জন্য নয়। কিন্তু তুমি যদি মনোমত আর কাউকে পাও তাহ'লে—

"বোলো না! আর বোলো না!" কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়েটি, তারপর অনেকদিন ধ'রে কাঁদতে-কাঁদতে প্রায় হিস্টিরিয়ায় ধরলো তাকে। কিন্তু রাজি হ'তে হ'লো। পারলে না স্বামীকে অমান্য করতে। উঠে এলো রিজেন্টস পার্কে একলা, তিন বছরের শিশুটাকে রেখে এলো কার্সিয়ঙের কনভেন্টে। এখন সে সেখানে থাকে, বিধবার মতো, বুড়ি-কুমারীর মতো, অনাথার মতো। আর তার বস্তিবাসী স্বামী একটি মাস্টারপীস লেখার চেষ্টা করে।'

* * *

রমলা থামলো। অনিমেষ স্তব্ধ হ'য়ে শুনছিলো গল্পটা, চেয়ারে একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে, রমলার দিকে না-তাকিয়ে, মুখ উঁচু ক'রে। একটু পরে তার গলার আওয়াজ শোনা গেলো—'তারপর?'

'তারপর তুমি বলো! তুমি তো একজন লেখক।···হাসছো কেন?'

ভাঙা গলায় ভূতুড়ে গোছের হাসি থামিয়ে অনিমেষ বললে, 'লেখক ব'লেই হাসছি। একশো গল্প আরম্ভ করা যায়, হাজার গল্প আরম্ভ করা যায়—কিন্তু শেষ? শেষ করার দায় না-থাকলে কে না লেখক হ'তো সংসারে?'

'যা হোক একটা শেষ ব'লে দাও—যে-কোনো রকমের সমাপ্তি একটা। মিলনান্তিক বা বিয়োগান্তিক, কোনোটাতেই আপত্তি নেই আমার।' একটু থেমে হঠাৎ জুড়ে দিলে, 'জানো তো কান্নার বইও খুব চলে আজকাল।'

'উঃ!' চলতে-চলতে নোংরা কিছু মাড়িয়ে দিলে যেমন হয় তেমনি একটা আওয়াজ ক'রে উঠলো অনিমেষ। বিতৃষ্ণা ফুটে উঠলো তার চোখে-মুখে।—'আর যা-ই করো, আমার সামনে ফিল্মকে "বই" বলো না, রমলা, আর ঐ "চলে" কথাটা—উঃ!' তার নাকের চামড়া কুঞ্চিত হ'লো, রেখা পড়লো কপালে।

রমলা যেন মজা পেয়ে বললে, 'কেন? "চলে" কথাটার দোষ কী! বিশুদ্ধ বাংলা ইডিয়ম। ওর বদলে আর-একটা কথা বলতে পারো কি?'

'তর্ক করো না,' অনিমেষ গম্ভীর হ'লো। 'তোমার গল্পের শেষ ব'লে দিচ্ছি আমি—মধুর না হোক মিলনান্তিক পরিসমাপ্তি।'

'বলো!' রমলা মুখ নীচু করলো, সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দিলে গলাটি, ম্লান দেখালো তাকে, ম্লান ও নিশ্চল, যেন সর্বশরীরে সংহত হ'য়ে কোনো-একটি দৈববাণীর অপেক্ষা করছে।

'কিন্তু চুলোয় যাক তোমার উপন্যাস—সোজাসুজি কথা বলাই ভালো। রমলা, তুমি আবার বিয়ে করছো না কেন?'

রমলার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শিউরানি নেমে গেলো, কিন্তু তার মুখের কোনো ভাবান্তর হ'লো না। শুধু একটু ছোটো দেখালো তার আশ্চর্য চোখ দুটি, যখন মরা গলায় বললে, 'কী ক'রে করি। আমি যে বিবাহিত।'

'সে-কথা পরে হবে—কিন্তু অন্য অসুবিধেটা কী? আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে যে কোনো সুযোগ্য পুরুষ তোমাকে এখনো প্রেম-নিবেদন করেননি?'

'ইতর! ছোটোলোক!' রমলা গর্জন ক'রে উঠে দাঁড়ালো, 'পাপিষ্ঠ! বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনা থেকে—এই মুহূর্তে—আমার দৃষ্টিকে আর দগ্ধ কোরো না তুমি, এই ঘরের বাতাসকে আর কলুষিত কোরো না! যাও।'

নেপালি আয়া নিঃশব্দে এসে পিছনে দাঁড়ালো। 'মাঈজী, কিছু চাই?'

রমলা ফ্যালফ্যাল ক'রে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর-এক গ্লাশ লেবু জল।'

'তোমার খাবার সময় হয়েছে, মাইজী। নাইবে না? হাতমুখ ধোবে না।'

'যা বলছি তা-ই করো তুমি।'

কাঞ্চী অনিমেষের দিকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে বেরিয়ে গেলো। অনিমেষ, অবিচলিত, অলস হাতে আর-একটি চারমিনার ধরালো।

'বোসো, রমলা। তুমি অত উত্তেজিত হ'লে কোনো কথাই বলা যাবে না। জানো তো যাকে তথ্য বলে তাতে ভালো বা মন্দ ব'লে কিছু নেই। এই সিগারেটে আমার জামা পোড়ে কতবার—সেটা জামার দোষ নয়, তাতে ভালো-মন্দের বালাই নেই কোনো, সেটা একটা নিছক তথ্য, এবং সে-তথ্যটি এই যে আগুনের দাহিকাশক্তি আছে। ঐ তথ্যটাকে পছন্দ বা অপছন্দ করার কোনো অধিকার নেই আমাদের। আমি তোমাকে যা বলতে চাচ্ছি তাও তেমনি। এতে রাগ করার কী আছে?'

রমলা ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলো। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে তখনো, কান দুটো গরম। হঠাৎ সচেতন হ'য়ে আঁচল টেনে দিলে বুকের উপর। আবার কী মনে ক'রে সরিয়ে দিলে। আঁটো অর্গ্যাণ্ডির চোলির পিছনে কাঁচুলির আভা দেখা দিলে, ঝলসে উঠলো শুভ্র, মসৃণ রাজহাঁসের গলার মতো একটি উদর।

টুকটুকে লাল গালার ট্রে হাতে ক'রে কাঞ্চী ফিরে এলো। টেবিলে নামালো বড়ো এক গ্লাশ লেবুজল, আর এক প্লেট ছোটো-ছোটো কাবাব। বললে—'কিছু খাও মাইজী, খেলে ভালো লাগবে।'

ব্যগ্র হাতে একটি কাবাব তুলে খেয়ে নিলো রমলা, আর লম্বা চুমুকে অনেকখানি লেবুজল। অনিমেষ বললে, 'গায়ের আঁচল ফেলে ব'সে আছো কেন—কাঞ্চী আসে যায়, কী ভাবে।'

'আসে যায় তো কী হয়েছে। ওরা সবাই জানে তুমি আমার স্বামী। স্বামীর সামনে অত লজ্জা কিসের। যা গরম!' ঐ একটু খাদ্যপানীয়ে যেন অদ্ভুতরকম সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠলো রমলা, তার মুখের রং ফিরে এলো, চোখে দীপ্তি, গলার আওয়াজে লঘুতা—এমনকি ফুর্তির সুর। 'আর কাঞ্চী তো মেয়েই। আর অন্য কেউ না-ডাকলে ঘরে আসবে না। কাছাকাছি কোনো বাড়িও নেই যে দেখা যাবে। কোনো ভয় নেই তোমার।' রমলা হাত বাড়িয়ে আর একটি কাবাব নিলে। 'তুমি খাও না!'

'না।'

'না কেন? অনেক দুর্বাক্য বলেছি, নিজগুণে ক্ষমা করো। কিছু খাও।'

'খিদে নেই।'

'খিদে না-থাকলেও খাও। শোভনতার জন্য, সৌজন্যের জন্য। একজন মহিলা অতিথিকে বসিয়ে রেখে নিজে খাচ্ছেন—এটা কি ভালো দেখায়? তুমি তো খুব আদবকায়দা মানো।'

'আমি অন্য কথা ভাবছি। তোমাকে দু-একটা কথা বলার আছে আমার। খেয়ে নাও।'

'তোমার অনুমতির অপেক্ষা রাখিনি, দেখছো তো।' ঝকঝকে দাঁতের ফাঁকে দ্বিতীয় কাবাবটি চেপে ধ'রে রমলা হাসলো। অর্ধেক খেয়ে, বাকি অর্ধেক আঙুলের ফাঁকে ধরে আবার বললে, 'কিন্তু তুমি খাচ্ছো না তাও ভুলতে পারছি না। শ্যাম্পেন ইচ্ছে করো কি?'

'শ্যাম্পেন!' অনিমেষের মুখের ভাবের অল্প একটু বদল হ'লো, কঠিন পেশী শিথিল হলো যেন। আর সেই ক্ষণিকের সুযোগটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রমলা।

'হ্যাঁ গো মশাই, শ্যাম্পেন। খাশ ফরাশি দেশের। দুটি আনকোরা বোতল শোভা পাচ্ছে আমার আলমারিতে। মনে হচ্ছে একটু অবাক হ'লে?'

'না, অবাক হবার কী আছে।'

'অবাক হবার এই আছে যে শ্রীমতী রমলা রায়, যাঁর সম্বন্ধে এই সুনাম বা দুর্নাম সবাই জানে যে ফিল্মের জগতে তিনি একটি অসহ্য পিউরিটান, যাঁকে কখনো একফোঁটা মদ খাওয়াতে পারেনি কেউ, সিনেমার জড়াজড়িতে রাজি করাতে পারেনি, সারাদিন প্রণয়গুঞ্জন শুনে-শুনেও যাঁর দেহমন বোবা হ'য়ে আছে এখনো, কাজের পরে রাত্রে বাড়ি ফিরে যিনি চুপচাপ বাড়িতেই ব'সে থাকেন—সেই রমলা রায়ের আলমারিতে শ্যাম্পেন থাকে কেন। তা শোন, কী ক'রে এলো তাও বলি তোমাকে। বোতল দুটি শতদল পালের জন্মদিনে উপহার পাঠিয়েছিলো মাধুরী মজুমদার, নায়িকার পার্টের জন্য বহুদিন ধরে

ঘুরঘুর করছে মেয়েটা, কিন্তু শতদলবাবুর রমলা ভিন্ন রোচে না। তা সেই মহাপ্রাণ সে-দুটি বোতল নিজে না রেখে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমি বাড়ি ছিলাম না, নিজে এসে রেখে গেছেন দারোয়ানের কাছে। সঙ্গে চিঠিঃ "তোমার বাড়িতে ছোটো একটা পার্টি দাও তো এই মহার্ঘ মদিরার সদ্গতি হতে পারে; মাধুরীকে বোলো, আর যাকে তোমার ইচ্ছে"।'—শোনো, কথা শোনো, কী আহ্লাদ! উনি পার্টি দেবেন আমার বাড়িতে! নাথিং ডুয়িং—ওঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবো, দু-বোতলের জায়গায় দশ বোতল দিতেও আপত্তি নেই। আমি শান্তি চাই—নিরিবিলি চাই—আপন মনে থাকতে চাই—ভাগো সব! তাহলে আনি একটা? লক্ষ্মী তো, না বোলো না, তুমি খেলে আমিও খেতে পারি। এত নাম শ্যাম্পেনের—দেখি একদিন খেয়ে ব্যাপারটা কী। Sorry—কথাটা ঠিক অরিজিনাল হ'লো না—শতদলবাবুও বললেন আমাকে আজ—কানের কাছে মুখ এনে বললেন—"ও-শ্যাম্পেন আমি যদি খাই তোমার সঙ্গে বসেই খাবো, নয়তো ড্রেন দিয়ে ফেলে দিয়ো।" ঐ এক বদভ্যাস ভদ্রলোকের—বড্ড কানে-কানে কথা বলেন, আর আমার এমন শিরশির করে গা-টা। তা দেখো তাঁর মুখের কথা আমি আবার তোমাকে বলছি। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!' একটু জোরে চেঁচিয়ে হেসে উঠলো রমলা, স্খলিত আঁচলে উঠে দাঁড়ালো। যেন সম্মোহিত হয়ে তাকে দেখতে লাগলো অনিমেষ। মুখ টুকটুকে লাল, চোখ দুটি অস্বাভাবিক ঝকঝকে, এক গোছা চুল লুটিয়ে পড়েছে কপালে, ধবধবে ফর্সা গলায় নীলচে শিরা দেখা যাচ্ছে। অনিমেষ তেমনি করে দেখতে লাগলো, যেমন ক'রে সে ছবি ছাখে, সিনেমা ছাখে—ব্যাপারটা যেন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু নয়, সম্পূর্ণ বাইরের, তার উপর তার কোনো হাত নেই, কিছুই তার দরকার নেই তা নিয়ে।

ভিতরের ঘর থেকে রমলা নিয়ে এলো দুটি গ্লাস আর শ্যাম্পেনের বোতল।—'খুলতে পারবে? এই যে, কর্কস্ক্রু। দেখো, সাবধান, আস্তে—কর্কটা যেন—বাঃ, বেশ, কেমন ফেনা—দাঁড়াও, আমি ঢালছি।

আরো কিছু খাবারও এনেছে কাঞ্চী—শুকনো ফল, চীজ, সার্ডিন—জানতাম না এত সব ঘরে ছিলো। সব উপহার। অনেক কিছুই কিনতে হয় না আমাকে—বেশ আছি। কিন্তু কার ভোগে লাগে? ফেলা যায়! বিলকুল ফেলা যায় সব—এদিকে—**hence loathed molancholy**—মনে আছে সেই বিয়ের আগে ইংরেজি কবিতা পড়ে শোনাতে আমাকে?' এক হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাশ, আর এক হাত কোমরে, মেঝেতে একবার পাক খেলো রমলা। অনিমেষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, 'এসো তাহলে—'

কিন্তু অনিমেষ অন্ধকার মুখে হেঁট হ'য়ে চুমুক দিলে গ্লাশে।

'বেশ! উঠে দাঁড়ালে না, গ্লাশ ঠেকালে না—একেবারে বর্বর তুমি! তা হোক, ক্ষমা করলাম তোমাকে। মেজাজটা খুব ভালো লাগছে এখন। একেবারে খোলা, দরাজ, বেপরোয়া—আঃ, এখন একবার শতদলবাবু আমাকে দেখলেন না! কিন্তু টক দেখছি? শ্যাম্পেন টক হয় নাকি? আবার একটু তেতো-তেতো। তা হোক, বেশ লাগছে। দেখছো তো, ঠিকঠাক রকম গ্লাশও আছে আমার—ছোটো, বড়ো, চ্যাপ্টা, বেঁটে নানা রকম গ্লাশ সাজানো আছে থরে-থরে। কিনিনি, সব উপহার পেয়েছি। আর শুধু শতদলবাবুর কাছ থেকেই নয়। কোনো এক রহস্যময় কারণে এঁরা অনেকেই আমাকে নানা রকম মদ উপহার দেন, নানা রকম গ্লাশ, নানা রকম টিনের খাবার—আমাকে একটা ককটেল পার্টি দেবার জন্য পায়ে ধরতে বাকি রেখেছেন এঁরা। কেন বলো তো?'

'তোমাকে নেশা হওয়া অবস্থায় পেলে এঁদের কিছু সুবিধে হতে পারে—তাই।' এতক্ষণে অনিমেষ কথা বললো, কিন্তু তেমনি অন্ধকার মুখ করে, চোখ তুলে না তাকিয়ে।

'ও, তাই বুঝি? খিলখিল করে হেসে উঠলো রমলা। 'কী বুদ্ধি তোমার! কত বোঝো! তা আমার কিন্তু তাঁদের কোনো সুবিধে করে দেবার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু এখন তো তাঁরা কেউ নেই

এখানে—এখন একটু নেশা হলে দোষ কী। এসো, খাও—খাবার খাও কিছু—এসো আজ মাতাল হওয়া যাক দু-জনে।'

অনিমেষ ভুরু কুঁচকে বললো, 'মদের নাম শুনলেই যাদের নেশা হয় তুমি দেখছি তাদেরই একজন হয়ে উঠছো।'

'একটু ভুল হলো। মাতাল হবার জন্য মদ খেতে হয় না আমাকে, মাতাল আমি হয়েই আছি। বলো তো কিসে? হেসো না—আমার সবচেয়ে গোপন কথাটা এখন বলছি তোমাকে—আমি তাদেরই একজন যারা ভালবাসার জাত-মাতাল। হ্যাঁ—ভালোবাসা—এত ভালোবাসা আমার মনে যে তা এই পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিতে পারে, একটা বিরাট বয়লারের বাষ্পের মতো মুচড়ে, ভেঙে, ছিঁড়ে, দুমড়ে ফাটিয়ে দিতে পারে আমাকে। মুচড়ে, ভেঙে, ছিঁড়ে, দুমড়ে।' আস্তে-আস্তে, যেন এক অদ্ভুত অবৈধ আনন্দে, বিশেষ জোর দিয়ে দিয়ে কথাগুলো আবার উচ্চারণ করলো রমলা। 'কিন্তু ফেটে গেলে তো চলবে না, তাই চেপে রাখতে হয়। চেপে, চেপে, চেপে, চেপে—এমনি করে।' এক হাত বুকের উপরে চেপে ধরলো সে, গ্লাশ নামিয়ে রেখে আর এক হাত চাপা দিলে, মুখের লাল রং আরো বেশি গভীর দেখালো। 'কিন্তু অসুখ চেপে রাখতে গেলে একদিন যেমন একেবারে কাৎ করে ফেলে, তেমনি—তেমনি—আমার ভালোবাসাতেও আমার দেহমন বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে এক-এক সময়, আর যার নাম বিষ, তার নামই তো নেশা। যেমন এখন—আমি পাগল হ'য়ে যাইনি, আমাকে শুধু ভালোবাসার নেশায় পেয়েছে। তুমি চুপ করে আছো? দেখছো না আমাকে? শুনতে পাচ্ছো না আমার কথা? বিশ্বাস করছো না আমার কথায়? যদি আমার এই বুকের ভিতরটা, আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে দেখতে পারতাম তোমাকে! তা পারি না ভেবেছো? দেখবে?'

হঠাৎ রমলা দুই হাতে গায়ের জামাটা টেনে খুলে ফেললো। তার সোনালি-ব্রাউন কাঁধের চামড়ায় সাপের মতো আলো পিছলে পড়লো, দুটি বুক ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো রুদ্ধ, ব্যর্থ, বিক্ষুব্ধ আক্রোশে।

অনিমেষের একটা হাত সবলে টেনে নিয়ে তার বুকের উপর চেপে ধরে বললে—'ছাখো—অন্তত শোনো। একটা রাক্ষুসে এঞ্জিনের শব্দ শুনছো না? কী বলো, দেবো নাকি ফাটিয়ে একদিন?'

অনিমেষ তাকে দুই হাতে জাপটে ধ'রে আস্তে সোফায় বসিয়ে দিলে। জামাটা তুলে দিয়ে বললে, 'প'রে নাও। শান্ত হও। চেঁচিয়ো না—কাঞ্চীরা সব ভাববে কী?'

হাত বাড়িয়ে শ্যাম্পেনের গ্লাশে চুমুক দিলো রমলা। একটু যেন শান্ত হ'লো তাতে। সোফার পিঠে মাথা এলিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে রইলো কয়েক মিনিট, তারপর জামা পরে, গায়ে আঁচল টেনে সোজা হয়ে বসলো। খুব নরম গলায় বললে, 'আমার পাশে এসে বসবে একটু?'

অনিমেষ তক্ষুনি তার পাশে বসে বললে, 'শান্ত হও, রমলা।'

'শান্ত আমি আছি তো। তুমি কি ভেবেছিলে ও-সব সত্যি? অভিনয়—অভিনয়—অভিনেত্রীর লীলাখেলা। অভিনয় করতে-করতে ভান আর সত্য এক হয়ে গেছে আমার কাছে। যা বানানো তাতেও সুখ পাই, দুঃখ পাই, মেতে উঠি। কিন্তু কোথাও একটা সত্য নেই কি? কোনো সত্য, যার বদল নেই, ভাঙন নেই, অবসান নেই?'

রমলা একটু চুপ করলো, যেন অনিমেষের কোনো উত্তরের আশায়। কিন্তু তার সময় না-দিয়ে তখনই আবার বললে, 'এখন তোমাকে যা বলছি সব সত্যি। কাজের কথা, সাংসারিক কথা! তুমি জ্ঞানী, তোমার কাছে আমি উপদেশ চাই। তোমার গ্লাশটা ভরে দিই আবার?'

'না। আচ্ছা, দাও।' হঠাৎ অনিমেষ বুঝতে পারলো তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে গেছে। জলের মতো খেয়ে নিলো শ্যাম্পেনটুকু। নিজের হাতে আবার ঢেলে নিলে।

'শোনো, কথাটা এই। এ-মুহূর্তে আমার প্রাণিপ্রার্থী অনেক। ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন তাঁরা। ডিরেক্টর শতদল পাল যদিও সবচেয়ে অগ্রণী, অন্যদেরও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ক্যামেরাম্যান মহীতোষ চক্রবর্তী, নামজাদা সাহিত্যিক ভূপেশ রুদ্র, তরুণ এবং দারুণ

অভিনেতা নীলাভ দাশ, এমনকি, সিনেমাজগতের গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান এস. কে. পালিত পর্যন্ত। এঁরা কেউ অকৃতদার, কেউ বিপত্নীক কেউ বা বর্ত্তমান স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন। কোনো এক রহস্যময় কারণে এঁদের প্রত্যেকেরই ধারণা হয়েছে যে আমাকে স্ত্রীরূপে পাওয়াও যা, সশরীরে স্বর্গে যাওয়াও তা-ই। আমি কারো কাছেই ধরা দিচ্ছি না, কাউকেই একেবারে হঠিয়ে দিচ্ছি না, সকলকেই বুঝে-সুঝে খেলিয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু একদিন তো কিছু-একটা মনস্থির করতে হবে। কী করি বলো তো ?'

'ঠিক এই কথাটাই তোমাকে বলতে চেষ্টা করেছিলাম এতক্ষণ ধরে। এদের মধ্যেই একজনকে বেছে নাও তুমি। তাকে বিয়ে করো। তাতে তোমার ভালো হবে। খুকুরও ভালো হবে।'

'কিন্তু কাকে বলো তো ?'

'যাকে ভালো লাগে।'

'কাউকেই ভালো লাগে না।'

'কাউকেই না ?'

'এমনিতে অনেককে ভালো লাগে। কিন্তু বিয়ের জন্য ?—নাঃ ! একসঙ্গে বিছানায় শোওয়া ?—ছি !'

অনিমেষ মেঝের উপর চোখ নামালো।

'আর তাছাড়া এঁদের মনের কথাটা জানবো কী ক'রে। কী ক'রে জানবো, আসলে আমার টাকার পিছনেই ছুটছেন না এঁরা ? টাকা তো সোজা নয়। অনেক জাঁদরেল ডিরেক্টরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি এখন। জানো, বেশি খরচ করি না, অনেক জমাই। আর খরচই বা কী, একলা একটা মানুষ। ব্যাঙ্কে রাখতে ভয়, মাঝে-মাঝে শুধু জমি কিনে চলেছি। জানো, সর্বসাকুল্যে চার লাখ টাকার মালিক আমি এখন ? কেউ জানে না, তোমাকেই শুধু বললাম। কিন্তু অত কি ওদের আছে ? নীলাভ দাশ এই তো মাত্র দু-বছর হ'লো উঠেছে, কুড়ি হাজারে কনট্র্যাক্ট করে এখনো—আমার অর্ধেকও না। ওদের পক্ষে আমি একটা মস্ত দাঁও তো।'

'ছি, রমলা, তুমি কেন কুৎসিত ভাষা বলবে?' প্রায় আদরের স্বরে বললো অনিমেষ।

এ-কথার উত্তরে অনিমেষের কোলের উপর পা তুলে দিলো রমলা। পিঠের নিচে কুশান দিয়ে আধো-শোয়া আরামে রাখলো শরীরটিকে। 'একটু-ঠিপে দেবে পা-টা? বড্ড কনকন করছে। আজ পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে হ'লো একটা দৃশ্যে—এখন মনে হচ্ছে লেগেছে। কী সব আবোলতাবোল যে করে!'

রম্‌লার ছোট্ট নরম পায়ের পাতা দুটি হাতের মুঠোয় একবার চেপে ধ'রে ছেড়ে দিলো অনিমেষ। 'তা এস. কে, পালিতের নিজেরই ঢের টাকা শুনতে পাই?'

'তা ঠিক। ক্লীন বারো-চোদ্দ লাখ?'

'তাহ'লে?'

'বয়স যে পঁয়ষট্টি।'

'তা ভালো। বাপের মতো দেখাশোনা করবে। সেটাই তো দরকার তোমার?'

'কিন্তু বুড়ো বয়সে রিপু যদি প্রবল হ'য়ে ওঠে? যদি খুকুকে ভালো না বাসে? সময়মতো বিয়ে করেনি, বাপ হয়নি, রক্তের টান গিয়ে পড়েছে একরাশ ভাইপো-ভাইঝি আর তৎসংক্রান্ত নাতি-নাতনিদের উপর। সেখানে আমিই বা কে, আর খুকুই বা কে। এ একটা মনের বিকার বই তো নয়। ধোপে টিঁকবে না।'

'এক কাজ করো। খুকুকে এনে কিছুদিন রাখো এখানে, সকলকে বাড়িতে ডাকো, আলাপ-পরিচয় হোক। ওর মধ্যে খুকু যার ভক্ত হবে তাকে বেছে নেবার বাধা কী?'

'মেয়ের হ'য়ে মা অনেক সময় কোর্টশিপ চালান বটে, কিন্তু মায়ের হ'য়ে মেয়ে! এ একটা নতুন কথা শোনালে বটে!' রমলা ছোট্ট ক'রে হাসলো।

'তাহ'লে এটা তোমার পছন্দ হয়েছে?' একটু উৎসুক হ'লো অনিমেষের গলা, যেন কোনো সংকটে মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছে।

'কী ক'রে বলি,' অন্য কী এক চিন্তায় রমলার মুখে ছায়া পড়লো
'যদি উল্টো ফল হয় ? যদি খুকুর প্রাণে ঈর্ষা জেগে ওঠে ? যা
আর ভালো না বাসে আমাকে ? মাগো মা, তা'হলে আমি বাঁচবে
কী ক'রে ?' অসুখী নারী হাতের পাতায় মুখ ঢাকলো।

চুপচাপ কয়েক মিনিট।

'কথা বলছো না যে ?' মুখ থেকে হাত সরিয়ে রমলা তী
চোখে অনিমেষের দিকে তাকালো। 'কিছু বলো! কী বলবো বে
দাও আমাকে।'

'যেমন আছো তেমনি থাকো না কেন—সকলের সঙ্গে বন্ধুতা রে
—রানীর মতো ?'

'রানীর মতো ? কিন্তু আমি যে দাসী হতে চাই।'

'কাউকে তার যোগ্য মনে হ'লে দাসী হবে।'

'আর যোগ্য! পাবার হ'লে কি পেতাম না এতদিনে ? আমা
বয়স তিরিশ ছোঁয়-ছোঁয় তা মনে রেখেছো ?'

'বাড়িয়ে বলছো। ছাব্বিশ তোমার।'

'প্রায় সাতাশ। তা নারীর যৌবন তো ক্ষণিক। আর ক-দি
বা এই সব লোভীরা! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ক-দিনও বেশ কয়ে
বছর। দশ বছর—হয়তো পনেরো। কুড়ি হতেই বা বাধা কী
তুমি যা বলছো তার মানে বোঝো ?' আঙুলের মধ্যে আঙুল চালি
হাতের উপর মাথা রাখলো রমলা। পা দুটি টান করলো অনিমেষে
কোলে। 'জানো না, কী আগুনের মধ্যে বাস করি আমি ? দিনে
রাত্রে কত প্রলোভন আমার চারদিকে ? রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ক
কষ্ট হয় নিজেকে সরিয়ে রাখতে, দূরে, বাইরে, আড়ালে রাখতে ? বোঝে
তুমি ? ওগো কবিমশাই, বোঝো ?'

অনিমেষ জবাব দিলো না। তার ভয় হ'লো, কথা বলতে গে
তার গলা ধ'রে যাবে। রমলার পা দুটি ভারি লাগছে কোলের উপ
—একেবারে গা ছেড়ে দিয়েছে যেন সে—কিন্তু—থাক।

'কিন্তু একবার যদি আড়াল ভেঙে দিই, একটুখানি ফুটো হ'

দিই কোথাও—কী হবে জানো? হাতে-হাতে লোফালুফি হ'তে-হ'তে চিটচিটে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো হ'য়ে যেতে থাকবো ক্রমশ, তারপর চল্লিশ পেরিয়ে সাধুবাবাদের খপ্পরে প'ড়ে এত কষ্টের সব টাকা ভণ্ডের চরণে ঢেলে দেবো। তা-ই কি চাও তুমি আমার জন্য? বলো! তুমি তো এককালে আমাকে—'মুখে যে কথাটা প্রথম এসেছিলো সেটা গিলে ফেলে রমলা বললে, 'আমাকে চিনতে তো এককালে, আর আমি তোমার সন্তানের মা—তাও অস্বীকার করতে পারবে না। এই কি চাও তুমি আমার জন্য?'

রমলার পায়ের চাপে, বা অন্য কোনো কারণে, অনিমেষের শরীর যেন অবশ লাগছিলো। হাত বাড়িয়ে অর্ধেক-হওয়া গ্লাশ তুলে নিয়ে এক ঢোকে শেষ ক'রে দিলে।

'না, তা চাই না। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। অন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই যে-কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। আর দেরি না।'

'ঠিক বলছো?'

'ঠিক।'

'ঠিক?'

'হুরে!' বিদ্যুদ্বেগে সোজা হ'য়ে বসলো রমলা। গ্লাশ দুটো আবার ভরে নিয়ে বললে, 'এসো, সেলিব্রেট করা যাক। এতদিনে আমি জিতেছি!'

'জিতেছো?'

'তুমিও বলছো বিয়ে আমাকে করতেই হবে!'

'ও, সে-কথা!' এতক্ষণে একটু হাসি ফুটলো অনিমেষের মুখে। 'তা আমি তো কবে থেকেই বলতে চাচ্ছি তোমাকে—আজও বলছিলাম—তুমিই কান দাওনি।'

'ডবল জিৎ! তার মানে তুমি মানো বিবাহ একটা বিশেষ-কিছু!'

অনিমেষ আবার হাসলো—এবার একটু ফ্যাকাশেভাবে। 'হ্যাঁ, সুবিধাজনক নিশ্চয়ই।'

'আমার মতে তার চেয়ে একটু বেশি।'

'সে যা ই হোক। রাজি হ'লে তো? আমি এখন যেতে পারি?'

হঠাৎ রমলার ফুর্তি নিবে গেলো। বিমর্ষতার পাৎলা পরদা পড়লো মুখের উপর। একটি আখরোট তুলে আঙুলের চাপে ভেঙে টুকরো-গুলো ছড়িয়ে দিলে মেঝেতে।

'আর একটু বসো। আর একটা কথা জিগেস করি। কী ক'রে আমার বিয়ে হবে বলো তো? আমি যে বিবাহিত।'

'একটা ডিভোর্স ক'রে নিতে হবে অবশ্য। সহজেই হ'য়ে যাবে। জানা-জানি হবে না—কাগজে বেরোবে না—আমি তার ব্যবস্থা করবো। কালই কোনো উকিল ডেকে কাগজ সই ক'রে পাঠিয়ে দাও আলিপুর কোর্টে।'

'কাগজে সই? আলিপুর কোর্ট?' হঠাৎ যেন ফুলকি বেরোলো রমলার চোখ দিয়ে। 'না! অনিমেষ রায়, তুমি জেনে রাখো, ও-রকম কোনো কাগজে আমি কোনোদিন সই করবো না। কোনোদিন, কোনোদিন না। মেরে ফেললেও আমাকে দিয়ে কেউ বলাতে পারবে না আমি তোমার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ চাই। সে বিচ্ছেদ চাও তুমি! অতএব তোমাকে ঐ মামলা করতে হবে, অনিমেষ রায়!'

'আমাকে!' সভয়ে ব'লে উঠলো অনিমেষ। 'আমি কী ক'রে মামলা করবো তোমার নামে? তুমি তো কোন অন্যায় করোনি আমার উপর। অন্যায় করেছি আমি। অভিযোগ তোমার, মামলাও তোমার!'

'ন্যায় অন্যায় বুঝি না। আমি করবো না! কিছুতেই না, কখনোই না!'

'অত অবুঝ হোয়ো না, রমলা। শোনো; আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি, ভরণপোষণ করিনি—আইনের ভাষায় যাকে ডেজার্শন বলে, ঠিক তা-ই। এমনি ক'রে পাঁচ বছর হ'য়ে গেলো। ডিভোর্সের পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু আরো যদি কিছু দরকার হয়—যা ইচ্ছে বলতে পারো। আমি তোমাকে মেরেছি, বাথরুমে বন্ধ ক'রে রেখেছি, গরম শিকের ছ্যাঁকা দিয়েছি গায়ে—কিছুতেই আপত্তি নেই আমার। আমি সব মেনে নেবো, কোনো প্রতিবাদ করবো না।'

'প্রতিবাদ করবে না? কাপুরুষ! জোচ্চোর! মিথ্যে বলাবে কোর্টে দাঁড়িয়ে! আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলাবে! লজ্জা হ'লো না কথাটা মুখে আনতে? জিভ খ'সে পড়লো না?'

ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো অনিমেষ। সামনের গ্লাশটায় শ্যাম্পেন না জল, না লেবুজল কিছু না-ভেবে একঢোঁকে খালি ক'রে দিলো সেটাকে। আস্তে বললে, 'বেশ তো, মিথ্যে বোলো না। নিছক সত্যটুকু বললেই বিবাহবিচ্ছেদ হ'য়ে যাবে।'

'কিন্তু সত্যটা কী, জানতে পারি কি? কে জানে যে আমিই স্বেচ্ছায় তোমাকে ছেড়ে আসিনি? কে জানে যে তোমার সঙ্গে বসবাস আমারই অসহ্য হ'য়ে ওঠেনি? কে জানে যে টাকার স্বাদে, খ্যাতির স্বাদে মাথা ঘুরে যায়নি আমার? অন্যায় শুধু তোমারই, আমার কিছু নয়—কোন সাহসে বলছো এ-কথা, বেয়াদব!'

অনিমেষের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে তখন। একটু চুপ ক'রে থেকে নিষ্প্রাণভাবে বললে, 'বেশ। আমিই মামলা আনবো তোমার নামে। আমিই বলবো তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করেছো।'

'কিন্তু আমি যদি তা অস্বীকার করি?' বাঁকা হাসি ফুটলো রমলার ঠোঁটে। 'যদি বলি তুমি মিথ্যে বলছো—আর মিথ্যে নয় তা-ই কি বলতে পারো হলফ ক'রে? যদি আমার অভিনয়নৈপুণ্যে চোখে জল এনে বলি—"হুজুর, ধর্মাবতার, আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ফিরে যেতে চাই স্বামীর কাছে, মেয়ে তার বাবাকে চিনবে না এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন!"—তাহ'লে? কোনদিকে তখন হাওয়া বইবে তোমার মনে হয়?'

মুখের মধ্যে জিভটাকে বালির মতো শুকনো মনে হ'লো অনিমেষের। চোখে যেন ঝাপসা দেখছে সব, থরথর করছে স্নায়ুগুলো। ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলে, 'বুঝেছি। কোনো আশা নেই।' ব'লে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো।

রমলাও উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে।—'এক মিনিট আর। এই আমার শেষ কথা, শেষ প্রার্থনা তোমার কাছে।' এগিয়ে এসে একটি হাত

রাখলো অনিমেষের কাঁধে। চোখ দিয়ে তার চোখ বিঁধে বললে, 'অনিমেষ, পাঁচ গ্লাশ শ্যাম্পেন খেয়েও একটু ভালো লাগছে না আমাকে দেখতে?'

অনিমেষ চুপ।

'লোভনীয় মনে হচ্ছে না? পরস্ত্রী ব'লেও ভাবতে পারছো না? পরস্ত্রী ব'লেও লোভনীয় মনে হচ্ছে না তোমার?'

অনিমেষ নিস্পন্দ।

'বলো! বলো! বলো!' অনিমেষের ঘাড়ের মাংসে নখ ব'সে গেলো রমলার, জোরে ঝাঁকানি দিতে-দিতে বললে, 'জবাব দাও কথার! আমার মনের দিকে তাকিয়ো না—সত্য কথা বলো—"হ্যাঁ", "না", যা-ই হোক তাতে এসে যায় না—বলো, আমাকে দেখে একটুও কি গরম হ'য়ে উঠছে তোমার ঠাণ্ডা রক্ত?'

'রমলা! আমারও একটা শরীর আছে!' যেন গলা ছিঁড়ে কথাটা বেরিয়ে এলো অনিমেষের।

রমলার মুঠি শিথিল হ'লো তক্ষুনি, কিন্তু অনিমেষের কাঁধ থেকে হাত স'রে এলো না। খুব নরম গলায় বললে, 'তাহ'লে আজকের রাতটা থাকবে আমার কাছে? শুধু এই রাতটা? কয়েকটা দিন—কয়েকটা রাত? অন্তত এই একটা রাত শুধু! অনিমেষ, এখনো আমরা স্বামী-স্ত্রী—কেউ কিছু বলতে পারবে না। থাকবে?'

মাথা নিচু করলো অনিমেষ। শরীরের অণুতে-অণুতে কাঁপছে সে, কিন্তু বাইরে পাথরের মতো স্তব্ধ।

আবার কথা বললে রমলা, এবার আরো নিচু গলায়, যেন অনেক দূর থেকে ঝড়ের গর্জনে টুকরো-টুকরো কথা ভেসে এলো অনিমেষের মূর্ছিত চৈতন্যে।

'শোনো—শুনছো—আমি একটা সন্তান চাই তোমার কাছে, আর-একটি সন্তান। একটা ছেলে! মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যাবে—মা-কে ছেড়ে যাবে সে—কিন্তু ছেলে! আমার, আমার! আমি অভিনয় ছেড়ে দেবো, সিনেমার সংসর্গ ছেড়ে দেবো, যা টাকা আছে তিন পুরুষ

চলে যাবে। ছেলের যত্ন, ছেলের শিক্ষা, ছেলের জীবন—আমার বেঁচে থাকার একটা অর্থ হবে অনিমেষ। বড়ো হ'য়ে সে বিয়ে করবে—সার্থক হবে এই বাড়ি, বোকাদের চোখ ভুলিয়ে কুড়িয়ে-পাওয়া এই বিত্ত। আর তারপর—যদি তোমার ইচ্ছে কোনোদিন—বুড়ো বয়সে ক্লান্ত হ'য়ে যদি মনে পড়ে কখনো—হয়তো তুমিও ফিরে আসবে। কিন্তু না যদি আসো, আর যদি তোমাকে চোখে না দেখি সারা জীবনে, তবু—এই আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, ভগবানের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—তবু আমি তোমাকে আর বিরক্ত করবো না, সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ মুক্তি দেবো তোমাকে। আর এসো না কোনোদিন, কোনোদিন তাকিয়ো না আমার দিকে, আমার অস্তিত্ব ভুলে যেয়ো। সব মানবো। শুধু একটা ছেলে দাও আমাকে। দেবে? দেবে?'

বলতে-বলতে চোখ ফেটে জল আসছিল রমলার; কান্নার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে, থেমে-থেমে, গিলে-গিলে, তবু সব কথা ব'লে উঠলো সে; কিছু বাদ দিলে না। যখন শেষ হ'লো, তার দু-গাল বেয়ে দর-দর ক'রে জল পড়ছে। কান্না থামাবার কোনো চেষ্টা করলো না সে, শুধু তার ভেজা আর আরো আশ্চর্য চোখ দুটি আস্তে বুজে এলো।

'আমাকে ক্ষমা করো।' হঠাৎ অনিমেষ হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো মেঝের উপর, রমলার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে, দুই পায়ে দু-বার চুমু খেয়ে, আবার বললে, 'আমাকে ক্ষমা করো।' রমলা অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে তার দিকে, তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধ'রে পিষে ফেলবে এক্ষুনি—কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে, কেউ নেই। আর্তস্বরে লুটিয়ে পড়লো মেঝের উপর, অনিমেষ যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলো সেই ঠাণ্ডা পাথরের উপর পিষে ফেললো শরীর।

* * * *

অন্ধের মতো পথে বেরিয়ে এলো অনিমেষ। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, ঠাণ্ডা। পথে আলো দূরে-দূরে, দুই দিকে বাড়ি কম, মাঠে-মাঠে জমাট অন্ধকার, পথে লোক নেই। কোন দিকে যাবে তা যেন বুঝতে পারছে না সে, কোথায় থাকে মনে করতে পারছে না। নেশা হয়েছে? এটুকুতে?

অত সহজে কি ঘুমিয়ে পড়ে তার ক্ষমাহীন মন? পালকের মতো হালকা লাগছে শরীর, চলতে গিয়ে পা কাঁপছে, কিন্তু মনে তার একটুও কুয়াশা নেই। এতক্ষণ ধ'রে যা-কিছু শুনেছে, তার প্রতিটি কথা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চারদিকে, যেন একপাল প্রেত তাড়া করেছে তাকে, অদেহী কিন্তু জীবন্ত কতগুলো উপস্থিতি। অনেকবার হোঁচট খেলো সে, কয়েকবার চলতে-চলতে থেমে গেলো। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি; বাড়ে না, থামে না, আস্তে-আস্তে জামার পিঠ ভিজে উঠলো তার, চুল ভিজে ছুঁইয়ে পড়লো কপালে। কিন্তু যার জন্য তাকে মাঝে-মাঝে চলা থামাতে হ'লো তা বৃষ্টি নয়; বৃষ্টিটা সে টেরই পাচ্ছিলো না বলতে গেলে। মুখের পেশীর একটা কাঁপুনি, যা তার ইচ্ছার অধীন নয়, চেষ্টা ক'রেও থামাতে পারে না—হঠাৎ যেন সমস্ত মুখ বেঁকে চুরে দুমড়ে ওঠে, আর বিশ্রী একটা গরম পিণ্ড ঠেলে উঠতে চায় গলা বেয়ে। গিলতে পারে না, উগরে দিতে পারে এমনও তার সাধ্য নেই। তাই থামতে হয় মাঝে-মাঝে, ভেজা মুখটাকে রগড়ে নেয় দু-হাতে, একটু পরে ছিপছিপে শরীর নিয়ে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায় আধো-অন্ধকারে।

সে ফিরে তাকায়নি, কিন্তু আর্তস্বর শুনতে পেয়েছিলো। কেন দুঃখ, পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন? কেন একজনের দুঃখে অন্য একজন সেই দুঃখীর মতোই অসহায়? মেঘের ফাঁকে একটি তারা যেখানে ফুটে ছিলো, সেদিকে তাকিয়ে এই প্রশ্ন করলো সে। পরমুহূর্তে খুব নিচু, খুব নরম গলায় হেসে উঠলো।

মাত্র দু-মাইলের পথ প্রায় এক ঘণ্টায় পার হয়ে একটি জীর্ণ একতলার সামনে দাঁড়ালো সে। পাড়াটা ঠিক গ'ড়ে ওঠেনি; ভাটিয়া বণিকের আনকোরা হাল-ফ্যাশনের তেতলার পাশেই কোনো পুরোনো গ্রাম্য "কোঠাবাড়ি" দেখতে পাওয়া বিচিত্র নয় এখনো। তেমনি একটি জুটিয়ে নিয়েছে অনিমেষ; ইলেকট্রিক আলো নেই, রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল আনাতে হয়।

ছোট্ট ক'রে একবার কড়া নাড়তেই হরিপদ দরজা খুলে দিলে।

লণ্ঠন উশকে দিলে ঘরের ; পাশের বারান্দায় তোলা উনুনের নিবন্ত আঁচে খাবার ব্যবস্থায় ব'সে গেলো।

পকেটে হাত দিয়ে অনিমেষ সিগারেট পেলো না, ভাঁজ-করা একশো টাকার নোটটি উঠে এলো হাতে।

'হরিপদ!'

'আজ্ঞে।'

'এসো এখানে। এটা নাও। তুমি পঞ্চাশ নিয়ো—বাকিটা আমার।'

নোটটার দিকে তাকিয়ে হরিপদ গম্ভীরভাবে বললে, 'কাল সকালে দেবেন!'

'না, না, এখনই রেখে দাও। তোমার কাছে নিরাপদ থাকবে।'

হরিপদ দ্বিরুক্তি না-ক'রে সেটি তুলে নিলো।

'আর, হরিপদ!'

'বলুন।'

'সিগারেট চাই যে', করুণ ক'রে হাসলো অনিমেষ।

ঈষৎ অবজ্ঞার চোখে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হরিপদ বেরিয়ে গেলো। রাশভারি মানুষ, বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের পক্ষে একটু বেশি মোটা, অনিমেষ তাকে সমীহ করে মনে-মনে। একটু পরে সে ফিরে এলো দু-প্যাকেট চারমিনার নিয়ে, সঙ্গে একটি দেশলাইও।

'কত জমলো, হরিপদ?' চোখ হেসে উঠলো অনিমেষের।

'কাল সব শোধ ক'বে দেবো। খাবার দিই?'

'হ্যাঁ, দাও।' অনিমেষের হঠাৎ মনে হ'লো তার খিদে পেয়েছে।

'আপনি ভিজে গেছেন দেখছি। আর-একটা জামা দিই?'

'নাঃ, কিছু হবে না। দাও খাবার।—শোনো, কফি আছে?'

'দুধ নেই।'

'তা কালোই দাও। আর তোমার আটার রুটি-ফুটি যা আছে ওরই সঙ্গে—শিগগির। কাজ আছে আমার।'

'আজ ডালপুরি করেছি। ভাতও আছে।'

'ডালপুরি ? গ্র্যাণ্ড ! ও-সব ভাত-টাত তুমি খেয়ে নাও—আমি—মানে—' কথা শেষ করলো না অনিমেষ, লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঘরের কোণে টেবিলের কাছে চ'লে এলো। একটা ওল্টানো বিস্কুটের টিনের উপরে লণ্ঠন রেখে বইপত্রের স্তূপের তলা থেকে টেনে নিলে একটা বাঁধানো খাতা। সেই টেবিলেরই এক পাশে কফি, ডালপুরি, চ্যাঁড়শের চচ্চড়ি, আর একটা ডিমসেদ্ধ রেখে হরিপদ রাতের মতো অদৃশ্য হ'লো।

ভেবেছিলো বসলেই কিছু লিখতে পারবে, কিন্তু ভাবা উচিত ছিলো পারবে না। ও-রকম কখনোই হয় না তার। ভাবা, আর লেখা—এই দুটো ব্যাপারে দুস্তর ব্যবধান। দুটো দুই জাতেরই ব্যাপার। কী ভাবছি জানাই যায় না যতক্ষণ না লিখতে চেষ্টা করছি। আর লেখার কাজটা এত ভারি, এত দীর্ঘসূত্রী, আর—সবচেয়ে যা খারাপ, এমন পরিবর্তনপ্রবণ।

আজ পাঁচ বছর ধ'রে সে একটু-একটু ক'রে একটা উপন্যাস লিখছে। মাঝে-মাঝে অন্য কিছুও লেখে, বই ছাপা হ'লে টাকাও পায়, কিন্তু সেগুলো কিছু না। এটাই আসল। এটাই সব। উপন্যাস ? তা কিছু-একটা নাম তো দিতেই হবে। কিন্তু একটি বই, যার মধ্যে তার সারাটা জীবন পুরে দেবে সে ; তার সব আশা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, আনন্দ। ছোটো বই ঃ তিনশো, কি চারশো পৃষ্ঠা গদ্য, পাঁচশোর বেশি কিছুতেই না—মাঝে-মাঝে একটি-দুটি ক'রে কবিতা থাকবে, হয়তো একটা একাঙ্ক নাটক, আর পরিশিষ্ট হিসেবে বইটার একটা সমালোচনা। ছোটো বই, কিন্তু অখণ্ড, সম্পূর্ণ, পূর্ণ। কিন্তু মুশকিল এই যে যত বেশি বাঁচছে ততই তার মনের মধ্যে বদলে-বদলে যাচ্ছে বইটা ; এত বেশি বলবার আছে মনে হয়, এত সব বেলেল্লা দল দেব-মুখোশ প'রে ঘুরে বেড়ায়—ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হবে এই ভয়ে এগোতেই পারে না। যদি মনের মধ্যে কোনো পাম্প বসিয়ে শূন্য ক'রে ফেলতে পারতো নিজেকে, তারপর ছিপি দিয়ে এঁটে দিতে পারতো মুখটা, আর তারপর যদি বহুদিন ধ'রে চুঁইয়ে পড়তো একটি-একটি ক'রে ফোঁটা, নিজেরই মধ্য থেকে নিজেরই মধ্যে, আর অমনি

ক'রে যদি ছোটো একটি পাত্র কোনোরকমে ভ'রে উঠতো, তাহ'লে···

অন্যমনস্কভাবে সেদ্ধ ডিমটা খেয়ে নিলো সে, চুমুক দিলো কফিতে। খাতা খুলে, যেখানে প্রথম চোখ পড়লো, সেখানেই পড়া শুরু করলে :

'এই পৃথিবীতে, যেখানে বিচারপতি কয়েদিকে হত্যা করে, রাষ্ট্রনেতা যৌবনকে বিনষ্ট করে, পুরোহিত ভগবানকে ধ্বংস করে, আর বুদ্ধিবৃত্তিকে বধ করে শিক্ষক-সম্প্রদায়, যেখানে গতানুগতিকতার নাম নিষ্ঠা, নিঃসাড়তার নাম সংযম, আর একটি বই স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গে পরিচয় না-থাকাকেই বলে চরিত্র ; এই পৃথিবীতে, যেখানে রাজত্ব করে গুণ্ডা, বোকা অথবা ধূর্তেরা, পুরস্কৃত হয় মিনিমুখো ভালোমানুষের দল—মিনিমুখো, মিনিমুখো, মিনিমুখো, যারা নিরাপদে কারো সর্বনাশ করতে পারলে সর্বনাশ করে, তাতে নিজের কোনো লাভ না-থাকলেও ; আর সেই মানুষই শক্তিতে আরো বড়ো হ'লে তার পদধূলি ভক্ষণ করে, তাতে নিজের কোনো লাভ না-থাকলেও ! যেখানে কোনো-না-কোনো মিথ্যাচারণ না-ক'রে বেঁচে থাকা যায় না ; দেহ ছাড়া জীবন নেই এবং দেহ থাকলে মুক্তি নেই যেখানে ; যেখানে কিছু করতে গেলেই লিপ্ত হ'তে হয় পাপে, কিছু ভাবতে গেলেই ক্ষুব্ধ হ'তে হয় সংশয়ে ; যেখানে কোনো বাসনা নেই যা বিতৃষ্ণা আনে না , কোন বিপ্লব নেই যা আর-এক বিপ্লব দাবি করে না ; কোনো হীন অথবা মহৎ বৃত্তি নেই যা নিজের বিপরীতের জন্য ব্যাকুল নয় ; যেখানে মানুষকে হৃদয়হীন ব'লে না ভাবলে আইন প্রণয়ণ করা যায় না, নির্বোধ ব'লে না-ভাবলে গঠন করা যায় না শাসনতন্ত্র, পাষণ্ড ব'লে না-ভাবলে আবিষ্কার করা যায় না সমাজ :—সভায়, সংঘে, বক্তৃতায়, অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে ভারাক্রান্ত এই পৃথিবীর বিরামহীন বিলাপের মধ্যে সে চেয়েছিলো রচনা করতে একটি সাধু জীবন, ব্যক্তিগত, নির্মল, নির্লিপ্ত ; একটি পবিত্র জীবন :—নির্ঘুম রাত্রে খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে প্রথম-প্রেমে-পড়া কুমারী তরুণী যে-লঘু, ক্ষণিক ও চিন্ময় চুম্বন চৈত্রের বাতাসে উৎসর্গ ক'রে দেয়, সেই···

—নাঃ, বড্ড বেশি উপদেশ। অনিমেষ কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে গেলো।

'মাঝে-মাঝে, যখন বৃষ্টি পড়ে ঝরোঝরো ঝাপসা, ঘর ধূসর, জগৎ লীয়মান, তখন ইজি-চেয়ারে ব'সে ব'সে আনন্দে সে স্তব্ধ হ'য়ে যায় হঠাৎ; মনে হয় তার স্বাভাবিক আবাস বুঝি খুঁজে পেলো এতদিনে: পাখির যেমন হাওয়া, আর মাছেদের নীল সবুজ চঞ্চল পিছল জল, তেমনি এই বৃষ্টি তার, এই রেখাহীন ধূসরতা, এই নির্বিশেষ বন্য সবুজ, নাস্তিময় আকাশের বিস্তার, এর মধ্যে বেঁচে তার আনন্দ, শুধু বেঁচে থেকেই সার্থক সে। কিন্তু এমন একটা সময় আসেই যখন বৃষ্টি থামে, নিষ্ঠুর রৌদ্র আবার ফুটিয়ে তোলে দোকান, বাড়ি, আপিশ, ইস্কুল, ব্যস্ততা—তখন সূর্যের প্রহারে জেগে উঠে তার ভুল ভেঙে যায়, তাকে মানতেই হয় মানুষের কোনো স্বাভাবিক আবাস নেই: মন নামক একটা অস্থির অনিশ্চিত পরিবর্তমান মণ্ডলের উপর পোকার মতো কোনোরকমে আঁকড়ে ঝুলে আছে সে।'

আবার কতগুলো পাতা উল্টিয়ে:

"এসো, এসো, ফিরে এসো।" "ফিরে এসো।" এই প্রার্থনায় ক্রন্দসী প্রতিধ্বনিত। ফিরে এসো, যৌবন; ফিরে এসো, প্রেম; ফিরে এসো, মন্ত্রঃপূত ঋতুরা। কেন মাথা নিচু ক'রে আছো তোমরা, অঙ্গ কেন মলিন, গতি কেন ক্লান্ত? যারা পুঁথি না-প'ড়ে পা ফেলতে পারে না, মুখস্থ না-ক'রে কথা বলতে পারে না, ঘণ্টা নাড়ালেই পুণ্য ব'লে জানে যারা, তারা কি তোমাদেরও লুটিয়ে দিয়েছে ধুলোয়? সেই স্থূলকায় বিপুল পাণ্ডারা, যারা সব মন্দির দখল ক'রে নিয়েছে, তাদের কি এত শক্তি যে তোমাদের বুকেও শেল হানতে পারে? উষা, তোমাকে? নক্ষত্র, তোমাকে? কিন্তু তা-ই তো হবে, তোমরাও যে প্রাকৃত।...

'কিন্তু না, এই নিখিলক্রন্দনে যোগ দেবে না সে, কাকে বলবে ফিরে আসতে, ইচ্ছার দ্বারা চালিত নয় তারা, তারা শুধু তথ্য কতগুলো। সে ফরে যাবে নিজেই, সে পারে ফিরে যেতে, তার আছে সেই ইচ্ছার

ক্ষমতা। বহুদিন, বহুদিন লাগবে। পার হ'তে হবে পাহাড়, পাড়ি দিতে হবে সমুদ্র, সহ্য করতে হবে মরুভূমি। দাঁত প'ড়ে যাবে, পা কাঁপবে; অস্পষ্ট হ'য়ে যাবে অন্য যা-কিছু সব। টিঁকে থাকবে সেই পার্কের বেঞ্চি যেখানে প্রেম এসে বসেছিল তার পাশে। সেই লম্বা বারান্দা, যেখানে প্রথম দেখা হয়েছিলো। আর সেই চোখ, সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল স্বপ্ন-জাগানো চোখ। নিজেকে সে মিলিয়ে দেবে তাদের মধ্যে আর এমনি ক'রে ক্রমশ হ'য়ে উঠবে প্রেমিক—সেই প্রেমিক, যাকে চুমু না-খেয়ে কেউ কাউকে চুমু খেতে পারবে না, যাকে কষ্ট না দিয়ে কোনো কুকুর পৃথিবীর কোনো শহরে ভিজবে না বর্ষায়···

হঠাৎ খাতা বন্ধ ক'রে অনিমেষ উঠে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো কয়েকবার। কপাল কুঁচকে অস্ফুটে বললে,—'মন্দ না—কিন্তু এখনো এত ভার! আরো বেশি ছবি দিয়ে বলতে হবে, আরো বেশি ইন্দ্রিয় দিয়ে লিখতে হবে। আবার প্রথম থেকে শুরু করবো?'

ফিরে এলো টেবিলে, খাতা খুলে যে-কোনো জায়গায় লিখলো: 'রমলার একটা আদর্শ আছে। আমারও একটা আদর্শ আছে। তার আপ্রাণ চেষ্টা তার আদর্শে পৌঁছতে; আমার, আমার। একই কাজ করছি আমরা, একই সঙ্গে কাজ করছি; কিন্তু সেই জন্যেই আর কখনো দেখা হ'তে পারে না।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথাগুলো লিখলো, তক্ষুণি মনে হ'লো ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। খিদেও পেয়েছে;—এই যে, কিছু আছে দেখছি। বিদ্যুদ্বেগে ডালপুরি দুটো খেয়ে উঠলো, এক চুমুকে ঠাণ্ডা-হ'য়ে-সর-প'ড়ে-যাওয়া কফি। আলো নিবিয়ে বিছানায় শোয়া মাত্র অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। সারারাত ধরে বৃষ্টি হ'লো, কিছু টের পেলো না।

———

ধুত্‌রো-বিষ

আশাপূর্ণা দেবী

শুভ্রা সুরমার একমাত্র মেয়ে।

কিন্তু সুরমার ইচ্ছে ছিলো না মেয়ের বিয়ে দেন। কারণ মেয়েকে তিনি তার বালিকা বয়স থেকেই মনে মনে ভগবানের চরণে উৎসর্গ ক'রে রেখেছিলেন। রেখেছিলেন অবশ্য নিজের খেয়ালের বশে নয়, 'ঠাকুর মহারাজ'এর আদেশ পেয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "ওরে, তোর এই মেয়েটা যে-সে নয়, স্বয়ং রাধারাণীর অংশে এর জন্ম। একে তুই সংসারের পাঁকে পুঁতে নষ্ট ক'রে ফেলিসনি। গোবিন্দজীর চরণে সঁপে দে।"

যেমন-তেমন গুরু নয়, "ঠাকুর মুক্তেশ্বরানন্দ মহারাজ।" ভারত-জোড়া যাঁর খ্যাতি, ভারত জুড়ে যাঁর শিষ্য। যাঁর 'সফরতালিকা' খবরের কাগজে বেরোয়, আর দেশের যতো বড়ো বড়ো ঘাড় যাঁর কাছে ঘাড়-হেঁট। সাধারণ শিষ্যরা ক'দিনই বা দেখতে পায় তাঁকে? শুধুই তো ভারত নয়, সিঙ্গাপুর, সিলোন, মালয়, চীন, ব্রহ্ম থেকে বিলেত আমেরিকা পর্যন্ত তাঁর গতাগতি। সেই মহারাজ! তাঁর কিনা এই নিতান্ত অধম দীনাতিদীন সুরমার ওপর এতো করুণা! আনন্দে পুলকে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জেগেছিলো সুরমার, চোখে জল এসে গিয়েছিলো! আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে আগুন ছুটেছিলো সুরমার গুরুভ্রাতা-ভগিনীদের! গুরুদেবের এই আদেশকে অবশ্য 'খামখেয়াল' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি তাঁরা। খামখেয়াল না হ'লে এরকম অপাত্রে এহেন করুণা? মেয়েটা অবিশ্যি দেখতে ভালো, তা হোক,

তাই ব'লে একেবারে রাধারাণীর অংশ ব'লে ঘোষণা? অমন একটা মেয়ে কি তাঁদের এই বড়ো-বড়ো ঘরের মধ্যে কারো নেই?

তা সে যে যাই ভাবুক, সুরমা কিন্তু আহ্লাদের গৌরবে গরবে গরিমায় বিগলিত হয়ে, তদ্দণ্ডেই মেয়েটাকে গুরুদেবের চরণের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, "আমার গোবিন্দ আপনিই প্রভু, আর কোনো গোবিন্দ আমি জানি না।"

মহারাজজী প্রসন্ন-হাস্যে শুভ্রার মাথায় একটি হাত রেখে 'বাণী' দান করেছিলেন, "আজ থেকে তোর দেহ মন আত্মা সব ভগবানের হলো।" সুরমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিলো আনন্দের আবেগে।

সে দিনটার কথা আজও শুভ্রার স্পষ্ট মনে আছে। সেই প্রথম সে মহারাজ দর্শনে গিয়েছিলো। তখনো ফ্রকই পরতো, কিন্তু পাঁচজন গুরুভাই-ভগ্নি দেখবেন ব'লে মেয়েকে সুরমা একটু বিশেষ পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সিল্কের শাড়ী-টাড়ী পরিয়ে। বেণীতে জড়িয়ে দিয়েছিলেন চাঁপার মালা। সব মিলিয়ে এমনিতেই মনে একটা পুলকাবেশ, তার উপর মহারাজজীর স্পর্শ ও বাণী—শুভ্রার মনে হলো—তার বুঝি সব কিছু বদলে গেল, ঘটলো বুঝি বা জন্মান্তর!

মনে হলো এ দেহ এখন দেবতার আরতি-প্রদীপ, এ তনু মন্দিরের মঙ্গলঘট। অবিশ্যি ঠিক এতো নিখুঁত ভাবে ভাববার বয়েস তার তখনো হয়নি, তবু সেই একটা অলৌকিক আবেশ! যার জন্যে নিজেকে সে সেই অবধি আর পাঁচটা মেয়ের থেকে—পৃথক ভাবতে শিখলো। শুধু পৃথক নয়, উন্নত জীবও বটে।

সেই থেকে শুভ্রা জানলো—অতঃপর লোকের বাড়ীর মেয়েদের মতো বাজে নাটক নভেল পড়া তার পক্ষে অন্যায়, সিনেমা দেখার কথা মুখে আনাও পাপ, সাজসজ্জায় অভিরুচি অপরাধ। সে পুণ্যাত্মা, সে পবিত্র, সে নির্মল শুভ্র শুচি। তার শুভ্রা নামটাও একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত। নইলে কেনই বা তার জীবনের প্রারম্ভে এই নামটাই

নির্বাচিত হয়েছিল। অতএব স্কুলের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যদি কিছু পড়তেই ইচ্ছে হয় তো, আছে 'গুরুবাণী', গুরুগীতা'। কাজকর্ম করতে বাসনা জাগে, ঠাকুরঘর সাজাক! বেড়াতে যেতে হয় তো চলুক সুরমার সঙ্গে আশ্রম-ভবনে। আশ্রমে অবিশ্যি গুরুদেব দৈবাতই থাকেন, তা হোক, আশ্রমটা তো আছে? তাঁরই পরিকল্পিত অপূর্ব বিরাট প্রাসাদ। সেখানে অহরহ লোক সমাগম। আমোদে-আহ্লাদে খাওয়া-মাথায় আনন্দের জোয়ার বইছে।

সেখানে শুভ্রাকে সকলেই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। শুভ্রাও নিজেকে তা ভাবে। বিস্তর ভালো ভালো কথাও শিখে ফেলে সে।

আর কি চাই?

এর চাইতে কাম্য-জীবন আর কী আছে?

মেয়ের জন্য এই জীবনই বেছে দিয়েছিলেন সুরমা! দেবেন নাই বা কেন? সুরমা তো সুরমার মা বাপের মতো সংসার-কীট নয় যে, মেয়ের বোধবুদ্ধি জন্মাবার আগেই তাকে কুম্ভীপাকে ঠেলে দেবেন! সন্তানের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হওয়াই না মা বাপের প্রকৃত কর্ত্তব্য!

বলা বাহুল্য, সুরমার এসব উচ্চাঙ্গের কথায় তার আত্মীয়পরিজন যে খুব বেশী বিগলিত হতো এমন নয়; আড়ালে তারা যা সমালোচনা করতো সেটা সুরমার অনুকূল নয়। কিন্তু শুভ্রার জীবনে সুরমার মতামতটা কার্যকরী হয়ে উঠেছিল। ধাপে-ধাপে স্কুলের থেকে কলেজে উঠলো শুভ্রা, সাধারণ মেয়েদের মতোই, কিন্তু আচারে-আচরণে হলো সাধারণোত্তর।

মেয়ে যেন সুরমার জীবনের এক পরম সাফল্যের অধ্যায়।

তবু—শেষ রক্ষা হলো না।

সুরমার স্বামী যোগেশবাবু নিতান্ত নির্লিপ্ত নির্বিরোধী মানুষ, সংসারের কোনো ব্যবস্থাপনাতেই কখনো তিনি তাঁর মতামত চালান না, সুরমার রাজ্যের একটি নগন্য প্রজার মতোই অবস্থান করেন মাত্র, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মধ্যে একটি অদ্ভুত দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল। মেয়ের বয়স

যখন বাইশ, বি. এ পরীক্ষান্তে এম. এ. পড়বে কি পড়বে না এই দ্বিধায় দোদুল্যমান, সেই সময় প্রকাশ পেলো যোগেশবাবু নিতান্ত নিঃশব্দে অদ্ভুত রকমের চকচকে ঝকঝকে একটি জামাই খুঁজে ফেলেছেন, এবং মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন।

সুরমার আপত্তিকে নাকি গ্রাহ্য করতে রাজী নয়।

আশ্চর্য বটে! চিরদিন যে ব্যক্তি সুরমার ইচ্ছার দাস হয়ে কাটিয়ে এসেছে, হঠাৎ কেমন ক'রে ইচ্ছাশক্তি এমন অমোঘ হয়ে উঠলো তার?

সুরমা রুদ্ধস্বরে বললেন, "ওকে আমি এমন ক'রে মানুষ করলাম, শেষ পর্যন্ত সংসারের কাদা মাখাবার জন্যে?"

যোগেশবাবু মৃদু হেসে বললেন, "তেমন ক'রে যদি মানুষ ক'রে থাকো, কাদা ওর গায়ে লাগবে কেন?"

"যার সঙ্গে বিয়ে দেবে সে তো আর ব্রহ্মচারী নয়?"

চাপা ঝঙ্কার দিলেন সুরমা।

যোগেশবাবু হেসে উঠলেন, "ব্রহ্মচারী হ'লে আর টোপর মাথায় দিতে আসবে কেন?"

"তবে?"

"এর উত্তর এখন দেওয়া যায় না।"

এরপর মেয়ের রুচি পছন্দ ইচ্ছে। সেটাই সুরমার ভরসা।

কেঁদে পড়লো শুভ্রা—"বাবা, বিয়ে দিলে আমি মরে যাবো।"

যোগেশবাবু বললেন, "বিয়ে হয়ে বুদ্ধদেব মরেননি, শ্রীচৈতন্য মরেননি, রামকৃষ্ণ মরেননি, আর তুই মরবি?"

"তাঁরা তো পুরুষ!"

ক্ষুব্ধ আর্তনাদ করলো শুভ্রা।

যোগেশবাবু খবরের কাগজখানা মুখের সামনে তুলে ধ'রে বললেন, "তাতে কি? তোরাই তো বলিস, 'মেয়ে পুরুষ অভিন্ন, আত্মা একই বস্তু,' আরো সব কত কি। তবে ভাবনা ধরবার কি আছে?"

"আমাদের সমাজে মেয়েদের কি জোর খাটে ?"

যোগেশবাবু কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বললেন, "জোরটা যদি ভুল জায়গায় প্রয়োগ না করতে যাওয়া যায়, ঠিকই খাটে। মেলা কথা রাখ্. দেখ্‌গে দিকি আমার ভাত বাড়া হয়েছে কি না, আজ একটু সকাল সকাল বেরোবো।"

শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হলোই।

শোনা গেল ভাবী জামাতার কলকাতা সহরে খানকয়েক বাড়ী, গ্যারেজে খান-তিন-চার গাড়ী, ব্যাঙ্কে অবিশ্বাস্য রকমের টাকা! যোগেশ-বাবুর জোগাড় করার তারিফে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল, এবং সুরমার শুধু পিতৃকুলের আত্মীয়েরাই নয়—গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরা পর্যন্ত বললেন, "এ পাত্র হাতছাড়া করা নির্বুদ্ধিতার চরম।"

স্বয়ং গুরুদেব তখন সিঙ্গাপুরে! চিঠিপত্রের মাধ্যমে একটা ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া 'আশীর্বাদ' জোগাড় হলো। বোঝা গেল—এই মেয়েটিকেই যে একদা তিনি ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে দিতে বলেছিলেন সে কথা বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

যাই হোক তবু বিবেকের কাছে খাঁটি হওয়া গেলো। মহারাজজীর সেই আশীর্বাদী-পত্র মেয়ের মাথায় ঠেকিয়ে বিয়ের কাজে অগ্রসর হলেন সুরমা।

বিয়ে হয়ে—শ্বশুরবাড়ী এসে শুভ্রা যেন জলের মাছ ডাঙায় পড়লো। কোথায় তার সেই নিরাড়ম্বর স্নিগ্ধ শান্ত জীবনযাত্রা, আর কোথায় এই বিলাস বৈভব ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যে আবিল জীবনযাত্রা পদ্ধতি!

বিয়ের শাড়ী ছেড়ে বদলাবার সময় শুভ্রা বললো, "সাদা শাড়ী ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করিনা আমি।" শুনে সখী-সামন্তরা হেসে গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর প্রশ্ন করলো—"তোমার এই বারোশো বাহান্নখানা চকচকে ঝকঝকে জরি সিল্ক ঢাকাই বেনারসীগুলো কী হবে ?"

সত্যি কী-ই বা হবে।

এগুলো বিলিয়ে দিয়ে প্লেন শাড়ী কিনে এনে দেবার বায়না একখুনি করা যায় না। শুভ্রা ভাবলো—আচ্ছা তার 'দিন' আসুক।

তবে গহনাগুলো থেকে যতোটা সম্ভব হালকা ক'রে নিলো নিজেকে। ওটা অসহ্য।

কিন্তু অসহ্য কি শুধু শাড়ী গহনা?

অসহ্য নয় অমিতাভর ব্যবহারটা? প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে অশুচি আর পঙ্কিল মনে হ'তে থাকে শুভ্রার, চোখ ফেটে জল আসে। অথচ অমিতাভ যেন কোনো কিছুতেই দমতে রাজী নয়। 'অভিমান' নামক বস্তুটার বালাইমাত্র নেই তার। শুভ্রা যখন নিজেকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করে, ও তখন যেন পরম একটা কৌতুক অনুভব করে। খেলাধূলো-করা দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ তার। শুভ্রার 'রাজরাণী'র মতো কোমল সুকুমার ছোট্ট দেহখানিকে অনায়াসে তুলে লোফালুফি করতে পারে সে। আর করতে ছাড়েও না।

শুভ্রা যখন রেগে অস্থির হয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে তখন ছেড়ে দিয়ে বলে, "দূর ছাই, দেখেশুনে একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে বিয়ে করলাম, এখন দেখছি—একেবারে ক্লাশ ফাইভের খুকি।"

"আমি তোমার খেলার বল নই।"

গর্জে ওঠে শুভ্রা।

অমিতাভ হেসে ওঠে—"আরে তুমি তো আমার সব। খেলার বল, তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার ফল।"

শুভ্রা কৌচে ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "তুমি নোংরা নীচ ইতর।"

অমিতাভ সেই কৌচেই ব'সে প'ড়ে বলে, "তুমি যদি এম. এ. পড়ো, বাংলাটাই নিও। ওটায় রীতিমত দখল আছে তোমার।"

এ সব কি যোগেশবাবুর কারসাজি?

মনে মনে ভাবে শুভ্রা। বাবা কি আগে থেকে তালিম দিয়ে মজবুত ক'রে রেখেছেন জামাইকে? নইলে নববধূর দুর্বিনয়কে হেসে ওড়ায় এমন কোন পুরুষ জগতে থাকে?

যোগেশবাবুর কারসাজি সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আরও একটা কারণ ঘটলো। 'অষ্টমঙ্গলা'য় মেয়েকে নিয়ে যাবার যে চিরাচরিত রীতি, সেটা ভঙ্গ হলো শুভ্রার বেলায়। অফিসের কাজে নাকি মাসখানেকের জন্য এলাহাবাদ যেতে হলো যোগেশবাবুকে, আর জীবনে কখনো তিনি যা না করেন তাই করলেন এবার।

সুরমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সুরমাও মেয়ের চাইতে 'প্রয়াগযাত্রা'টাকেই বেশী প্রাধান্য দিলেন। বাবার ওপর অভিমান করতেও ইচ্ছে হয় না, কিন্তু মায়ের ওপর রাগে অভিমানে শুভ্রা জ্বলতে লাগলো। সুরমা বাড়ীতে থাকলে কি শুভ্রা এই হীন পঙ্কিল জীবনের মধ্যে প'ড়ে থাকতে বাধ্য হতো? কবে চলে যেতো।

এখন কোথায় যাবে?

অতএব প্রতিটি রাত্রি প্রভাত হয় শুভ্রার একটা অপরাধবোধের ভার নিয়ে। অনেক কাঠিন্য অবলম্বন ক'রে সে না হয় তার কৌমার্যটুকু রক্ষা ক'রে চলেছে, কিন্তু এই যে এক শয্যা, এক ঘর, এটাই কি গ্লানিকর নয়? তার উপর অমিতাভর ওই বেপরোয়া প্রকৃতি। সারারাত ভয়ে বুক কাঁপে, ঘুম আসে না।

ঠিক করলো রাত্রে ননদের কাছে শোবার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বিধাতা এমন বাদী, অমিতাভর মা টের পেয়ে গেলেন এ ষড়যন্ত্র। এবং গম্ভীর ও সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানিয়ে দিলেন ওসব আদিখ্যেতা চলবে না। বৌয়ের নিরামিষাহার তিনি সহ্য করেছেন, সহ্য করেছেন হু'বেলায় চারঘণ্টা 'পূজো'। তাব'লে এসব বেয়াড়াপনা সহ্য করবেন না।

এমন রাশভারী লোক যে তাঁর কথার প্রতিবাদ করবার সাহস শুভ্রারও আসে না।

অতএব যেখানে সাহস আসে, সেখানেই একেবারে ফেটে পড়লো শুভ্রা। আশ্রমে যাতায়াত করার দরুন এবং মাতৃদেবীর বান্ধবীবর্গের নিরঙ্কুশ আলোচনার শ্রোতা হওয়ার দরুন অনেক দামী দামী কথা শেখা

ছিলো শুভ্রার, তাই তীব্রভাবে বললো, "তোমাদের বাড়ীর ধারণা বুঝি মানুষ হচ্ছে শুধু জন্তুজানোয়ার ?"

অমিতাভ অবাক হওয়ার ভানে বললো, "কই, এরকম কোনো ধারণা কারো আছে ব'লে তো জানা নেই। কেন বলো তো ?"

"আমাকে এ-ঘরেই শুতে হবে তার মানে কি ?"

"ও হো হো—এই কথা ?" হেসে উঠলো অমিতাভ। বললো, "অবশ্যই কোনো মানে আছে। নইলে পৃথিবীর সর্বত্র আর সমস্ত সমাজে এ নিয়ম প্রতিপালিত হয় কেন ?"

"আমি যদি এই অভদ্র নিয়ম না মানি ?"

"লোকে—অন্ততঃ তোমাকে স্বাভাবিক বলবে না।"

"তাহলে কেউ নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করতে পাবে না ?"

"উত্তর দেওয়া শক্ত। ইচ্ছেটা খুব স্বাভাবিক না হলে রীতিমত লড়তে হবে।"

"বেশ তাই লড়বো। হার মানবো না।"

"আচ্ছা লড়ো।" বলেই অমিতাভ নিতান্ত বালকোচিত একটা কাজ ক'রে বসলো। শুভ্রার চাঁপাকলির মতো আঙুল-সাজানো হাতের চেটোটা তুলে নিয়ে, নিজের পাথর-কঠিন আঙুলগুলো দিয়ে পাঞ্জা-লড়াই ভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠলো, "কই লড়ো ? দেখি কতো জোর ?"

হাত ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ লাল ক'রে শুভ্রা বললো, "এটা হচ্ছে পশুশক্তি।"

"তা মানুষে আর পশুতে কতোটুকুই বা তফাৎ ? শুধু দুটো হাত পায়ের বিভিন্নতা ছাড়া ?"

"এ-কথা তোমাদের মতো লোকের মুখেই মানায়। জীবনে যারা অধ্যাত্ম-জগতের খবরও শোনেনি।" ঘৃণা ফুটে ওঠে শুভ্রার মুখে।

অমিতাভর কিন্তু লজ্জাও নেই রাগও নেই। মুখে ওর কৌতুক ফুটে ওঠে, "তুমি ওসব খবর অনেক রাখো, তাই না ?"

"তোমার পক্ষেই সম্ভব এসব কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করা !"

"আমার পক্ষে যে আরো কি সম্ভব, সে তুমি ধারণা করতেই পারবে না—" ব'লে চট ক'রে শুভ্রার রজনীগন্ধার পাঁপড়ির মতো সমস্ত দেহটার অবস্থাই ক'রে তুললো তার চাঁপারকলি আঙুলগুলোর মতো !

"ছেড়ে দাও শীগগির নইলে চেঁচাবো।"

ছটফট ক'রে উঠলো—শুভ্রা।

অমিতাভ আর একটু জোর দিয়ে বললো, "ছেড়ে দেবার জন্যে কি কেউ ধরে ?"

তা সত্যি তো চেঁচানো যায় না ?

অতএব শেষ অস্ত্র কান্না।

এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে নামিয়ে দিলো—অমিতাভ। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "তোমার জন্য দুঃখ হয়। পুরনো চীনের গল্প জানো ? তারা মেয়েদের পা ছোট ক'রে রাখতো সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে। শুনে আমরা হাসতাম ! হাসাটা আশ্চর্য্য না ?"

শুভ্রা ততক্ষণে বালিশে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েছে।

অমিতাভ একটু চুপ ক'রে থেকে—বললো, "পশুশক্তির চাইতে যেটা প্রবলশক্তি সেটার নাম আত্মিকশক্তি—তাই না ? দেখি, সেটারই সাধনা করা যায় কিনা। একটু স'রে শুতে জায়গা দাও দিকি, শুয়ে পড়ি, বড়ো ঘুম পাচ্ছে।"

অতঃপর কতকগুলো রাত্রি কাটলো এই একইভাবে। অমিতাভ ঘরে ঢুকেই বলে, "উঃ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

বলেই বালিশটাকে কাৎ ক'রে ঘাড়ের নীচে দেয়, আর মুহূর্তে ঘুমোয়। শুভ্রা নিষ্কণ্টক। শুভ্রা নিরুদ্বিগ্ন।

কিন্তু উদ্বেগ কি এত সহজে যায় ?

'ওর ঘুমটা কি সত্যি ঘুম ?

শুভ্রার বিশ্বাস হয় না। তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশঙ্কায় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, আর অন্ধকারে দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে দেখতে চেষ্টা করে 'মিথ্যাঘুমের' দেহটা ন'ড়ে উঠলো কিনা ! এ দেখাটা প্রায়

অপেক্ষার মতোই। শুভ্রা তো জানে, মানে, শুনে এসেছে এযাবৎ, পুরুষ জাত কতো দুর্বল আর লোভী। বিশেষ করে যারা অধ্যাত্ম-জগতের খোঁজ রাখে না।

কিন্তু 'মিথ্যা-ঘুম সত্যি-ঘুমে'র রহস্য ভেদ হয় না। তার আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে থাকতে থাকতে এক সময় নিজেই সে কেমন একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে কিন্তু যে কে সেই। প্রাণবন্যায় যেন টলটল করছে অমিতাভ। হাসিখুশি উচ্ছল সেই মানুষটাকে দেখে সন্দেহ করা চলে না, সারারাত মিথ্যাঘুমের সাধনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে সে।

বরং ক্লিষ্ট দেখায় শুভ্রাকেই।

তবু পূজোর আসনে ব'সে শুভ্রা বারবার বলে, "গুরু আমাকে রক্ষা করেছেন, মহারাজ আমাকে রক্ষা করেছেন।"

আবেগে আনন্দে বুকটা কেমন ক'রে ওঠে, চোখে জল আসে, মন্ত্র ভুল হয়ে যায়। মুক্তির আনন্দ কি সোজা আনন্দ?

অবশেষে প্রতীক্ষার দিনগুলো কাটলো। যোগেশবাবু ফিরে এলেন, এলেন সুরমা। এবারে মেয়ে নিয়ে যাবেন বৈকি।

শুভ্রা বললো, "মা আমাকে একেবারে নিয়ে চলো।"

সুরমা চমকে বললেন, "একেবারে মানে?"

"মানে, আর কখনো এদের এখানে যাতে আসতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করো মা।"

সুরমা থতমত খেয়ে বললেন, "কেন, জামাই কি কিছু—"

"এরা একেবারে সাধারণ মা।"

সুরমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সে তো জানা কথাই মা। জগতে কে সাধারণ নয়? তবে ভরসা এই, গুরুদেব শীঘ্রি ফিরছেন। একবার ওকে কোনো রকমে ধ'রে ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ে ফেলে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"সে আশা বৃথা মা। এরা ওসবের ধার ধারে না।"

"তা হোক। গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেলেই সব বদলে যাবে।"

শুভ্রা রাগ ক'রে উঠে বললো, "তবে কি তুমি চাও আমি সাধারণ মেয়েদের মতো সংসারই করি?"

সুরমা কপালে করাঘাত ক'রে বললেন, "হায়! হায়! গুরুদেব! আমিই চেয়েছিলাম বটে। যে চেয়েছিল, সে তো এসেছে। তার সঙ্গেই ঝগড়া কর, আমায় দোষী করছিস কেন?"

"আচ্ছা, বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া ওখানে গিয়েই হবে।"

যাবার সময় অমিতাভকে দেখতে পাওয়া গেল না। কি না কি জরুরী দরকারী কাজে কোথায় বেরিয়েছে।

সুরমা ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "জামাই কি ভালো নয় শুভ্রা?"

"ভালো নয় মানে?"

শুভ্রার মুখ লালচে হয়ে উঠলো।

"মানে, স্বভাব চরিত্রের কথা বলছি—"

"পাগলামী কোরো না। কে বলেছে এ-কথা?" আগুনের মতো ঝলসে উঠলো শুভ্রা।

"না না, বলেনি কেউ। যতোই হোক, বড়োলোকের ছেলে, বাপ নেই, উঠতি-বয়েস। তা তোকে কোনো অনাদর করেনা তো?"

আবার সিঁদুর ছড়িয়ে গেল শুভ্রার মুখে। ঘাড় ফিরিয়ে বললো, "অনাদর? বলে, আদরের ঠেলাতেই—"

সুরমা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "যাবার সময়ে দেখতে পাচ্ছিনা, তাই বলছিলাম। থাক্ থাক্ ষাঠ! সবই মহারাজের কৃপা! তা তুই এবার প্রস্তুত হয়ে নে?"

"প্রস্তুত তো হয়েছি।"

"সে কি? তোর অত গয়না-গাঁটির কিচ্ছু পরবি না?"

"সে সব আমি পরি না।"

সুরমা দ্বিধাযুক্ত স্বরে বলেন, "তা হলেও, সমস্ত বাক্সে নেওয়াও ঠিক নয়—"

"বাক্সে তো নিইনি।"

"বাক্সে নিসনি ?" আঁৎকে উঠলেন সুরমা।

"না, কি হবে ওসব জঞ্জালে ?"

"ক্ষ্যাপামী করিসনে ?" তাড়া দিয়ে উঠলেন সুরমা—"ন্যাকা মেয়ে! 'পরিনা' ব'লে সর্বস্ব ফেলে রেখে যা: তারপর সব এদিক-ওদিক হয়ে যাক! পরতে ইচ্ছে না হয়, আশ্রমে দিলেও পরকালের কাজ হবে। হকের জিনিশ হাতছাড়া করে ? যা সব নিয়ে আয় শাশুড়ীর কাছ থেকে।"

"সে আমি বলতে পারবো না।"

"আচ্ছা, তুই না পারিস আমি বলছি গিয়ে।"

"আঃ, কী দরকার মা ?"

"দরকার আছে বৈকি! সবাই জানে, মস্ত বড়োলোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে তোর, এমনি ন্যাড়াবোঁচা ভিখিরির মতো পাঁচজনের সামনে বার করবো কি ক'রে ?

শুভ্রা ভারীমুখে বললো, "বৈরাগ্যটা কি কিছুই নয় ?"

"লোকে তার মর্ম বুঝলে তো ?"

সুরমা উঠে গেলেন অমিতাভর মায়ের কাছে।

চিরদিন মাতৃ-ইচ্ছার ঐরাবত-তাড়নায় চালিত হয়েছে শুভ্রা, তাই আজও সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী প্রতিবাদ করতে পারলো না। তাছাড়া —মনটা কেমন এক রকম চঞ্চল হয়ে রয়েছে, এসব ঘটনা তেমন স্পর্শ করছে না।

এমন কি কাজ পড়লো অমিতাভর, যে ঠিক এই সময়টুকুতেই রসাতল হয়ে যেতো ? বাবা কি মনে করলেন, মা কি মনে করলেন!

শুভ্রা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে করুক, তাই ব'লে অনাদরের সন্দেহ ? কী লজ্জা! কী অপমান!

তাছাড়া—?

অমিতাভর সঙ্গে বোঝাপড়া হলো কই ?

গত রাত্রের সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি! কোনো আলোচনা হবে না সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা নিয়ে ? কাল যখন প্রতিদিনকার মতোই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়লো অমিতাভ, শুভ্রা একটু পরে নড়ে-চড়ে যেন দেয়ালকেই উদ্দেশ্য করে বললো, "আমি ঠিক করেছি—ওখানেই থাকবো। আর এম. এতে ভর্তি হবো।"

দেয়াল তো আর কথা কয়না, কাজেই উত্তর এলো না।

একটু থেমে শুভ্রা বলেছিলো, "শুনতে পাচ্ছো ? আমি এরপর ওখানেই থাকবো। তোমার মাকে ব'লে সেই ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

অমিতাভ তথাপি নিদ্রাতুর।

এতে কার না সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় ? শুভ্রা বিরক্ত স্বরে বললো, "তোমাদের বাড়ীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব—বুঝলে ?"

তবু ঘুমোতে থাকে অমিতাভ।

আর সহ্য হয় না শুভ্রার। সহসা দু'হাতে ওকে একটা ঠেলা দিয়ে ব'লে উঠলো, "তোমার মিথ্যে ঘুমের অভিনয়টা একটু রাখবে ?"

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড ক'রে বসলো অমিতাভ !

অপ্রত্যাশিত। ধারণাতীত। আশঙ্কাতীত।

মিথ্যা ঘুমটা কি সত্যি ঘুমের চাইতে বেশী ভয়ঙ্কর ?

শুভ্রা না বুঝে-সুঝে সেই মিথ্যাঘুমের বাঘকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলে ডেকে আনলো সর্বনাশ। ঘটলো প্রলয় ! সে প্রলয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল শুভ্রার সমস্ত সম্ভ্রম, ধূলিসাৎ হয়ে গেল এতদিনের যত্নরক্ষিত কৌমার্য্য ! পাথরের পুতুলের মতো হয়ে গেলো সে। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলো।

অমিতাভ উঠে ঘরের জানালাগুলো খুলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, "মনে কোরোনা মাপ চাইবো। শুধু এইটুকু জানিয়ে যাচ্ছি, ঘুমন্ত বাঘ

খেলার জিনিশ নয়, তাকে জাগাতে গেলে এমনি বিপদই ঘটে। দোরটা বন্ধ ক'রে শোও।"

সেই বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে, আর দেখা হয়নি শুভ্রার সঙ্গে। এখন যাত্রাকালে শুনছে বাড়ী নেই।

ধিক্কারে জর্জরিত ক'রে দেবার অবকাশটুকুও দিলো না! এমনকি —ক্ষমা পর্যন্ত চাইলো না। উল্টে শুভ্রাকেই দোষী ক'রে গেল! এই মন নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে শুভ্রাকে।

কিন্তু উপায় কি? দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী।

দৃঢ় সংকল্প ক'রে গাড়ীতে উঠলো শুভ্রা। এই শেষ। এই শেষ। জপে তপে কৃচ্ছ্র সাধনায় এই অশুচি দেহটাকে আবার শুচিস্নিগ্ধ ক'রে তুলতে হবে মহারাজজীর পায়ে সব নিবেদন ক'রে। তারপর বাকী জীবনটা দেবতার।

কিন্তু মানুষের হিসেবের সঙ্গে প্রকৃতির হিসেব মেলেনা কেন?

অন্ততঃ শুভ্রার বেলায় তো মিলছে না।

বাড়ী ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে এই ছিলো শুভ্রার ধারণা, উল্টে কেমন যেন হাঁফিয়েই উঠছে।

এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হবার কথাটাও মনে পড়ে না।

মনে হয় যেখান থেকে বিদায় নিয়েছিল, ওর সেই পরিচিত জায়গাটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এই ছোট্ট বাড়ীর মাপাজোপা সংসারে ওকে যেন আর আঁটছে না।

অমিতাভদের বাড়ী থেকে এসে অহরহই মনে হয় এ বাড়ীটা কী ছোট। এদের জীবনযাত্রার আয়োজনগুলো কী অকিঞ্চিৎকর। নিজের পুরোনো শাড়ী ব্লাউসগুলো টেনে বার করে মনে হলো কী দৈন্যদশাগ্রস্ত শ্রীহীন!

ঘন ঘন আশ্রমে যেতে সুরু করলো, তাও কেমন ভালো লাগেনা। মনে হয় কুমারীর শুভ্র সিঁথি নিয়ে 'রাধারাণীর অংশে'র যে মহিমা আর সমীহ কুড়িয়েছে এতদিন সিঁদুর প'রে সেটাও যেন খোয়া গেছে।

সকলেই শুভ্রার শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে কৌতূহলী।

শুভ্রা যেন ওদের মতোই, যেন ওদের থেকে অনেক উঁচু নয়। এখানে এসে সুখ কি। কিন্তু কোথায় বা সুখ? হঠাৎ সুখ নামক বস্তুটা যেন শুভ্রার ভাঁড়ার থেকে কোথায় পালিয়ে গেছে।

যোগেশবাবু এসে বললেন, "তোর শাশুড়ী যে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী পাঠিয়েছে।"

"তার মানে? কে এসেছে কে?"

অকারণ উত্তেজিত দেখায় শুভ্রাকে।

যোগেশবাবু শান্তভাবে বলেন, "এসেছে বাড়ীর পুরনো ড্রাইভার।"

"কিন্তু কেন?"

"কী মুস্কিল! শ্বশুরবাড়ী যাবি তার আবার কেন কি? ব'লে পাঠিয়েছেন—অনেকদিন তো থাকা হলো, এবার যাক কিছুদিন।"

"আমি তো তোমায় বলেছি বাবা, আর যাবো না ওখানে।"

যোগেশবাবু হেসে বলেন, "পাগল তুই।"

"কেন, তোমরা আমাকে একটু জায়গা দিতে পারো না?"

"ওরে বাবারে! কতো বড়োলোকের বাড়ীর বৌ তুই, তোকে জায়গা দেওয়া কি আমার কর্ম?"

"বেশ বেশ! আমাকে তাড়িয়ে দিয়েই যদি তোমরা বাঁচো, যাচ্ছি, একখুনি যাচ্ছি।" বলেই ভারী মুখে ছলছলে চোখে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চুলটা আঁচড়াতে বসে শুভ্রা।

সুরমা এসে বলেন, "ওর যখন অতো আপত্তি, আজ নাহয় যা হোক কিছু ব'লে গাড়ী ফেরৎ দাও না?"

যোগেশবাবু মৃদু হেসে বলেন, "আপত্তি কে বললে?"

"চোখ নেই আমার? অন্ধ।"

"চোখ বুজে থাকলে অন্ধের সঙ্গে তফাৎ কোথা।"

"কথা কখনো বুঝতে পারলাম না—" ব'লে রাগ ক'রে চলে গেলেন সুরমা মেয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। মেয়ের বিয়ে হয়ে-ইস্তক তিনি

যেন কেবলই স্বামীর ইচ্ছার কাছে পরাস্ত হচ্ছেন। কেন? কে জানে।

ননদ এসে ব্যঙ্গহাসি হেসে বললো, "ভয় খেওনা বৌদি, তোমার ধর্মেকর্মে ব্যাঘাত ঘটবে না, সব সেপারেট্ ব্যবস্থা।"

বুকটা কেঁপে উঠলো শুভ্রার। চেয়ে রইলো বোকার মতো।

"ওই যে ছাখোনা। দাদার পরিকল্পনা।" তুষ্টু হেসে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে পালায় সে। ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রা, এ তার সেই পরিচিত ঘরটা নয়। পাশের যে ঘরটা নানা আসবাবে সাজানো ছিলো বসবার ঘর হিসেবে, সেইটাই শুভ্রার একক বাসের উপযুক্ত ক'রে সাজানো হয়েছে। সরু একহারা একখানি খাট। পড়বার টেবিল-চেয়ার, প্লেন আনলা, ছোট্ট আলমারি, দেয়ালে কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি। ছুটো ঘরের মাঝখানে পুরু ভেলভেটের পর্দা! সুন্দর ব্যবস্থা।

তবু সহসা মনে হলো শুভ্রার, অমিতাভ যেন ঠাস ক'রে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে। এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় কি।

"তোমার দাদাটি গেলেন কোথায়?"

রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলো ননদকে।

"দাদা। দাদা তো সেই কখন বেরিয়েছে, রাত দশটার সময় আসবে ব'লে গেছে, কি যেন কাজ আছে।"

শুভ্রার ইচ্ছে হলো ওর ওই হাসি-হাসি মুখটা আর নিজের এই উত্তপ্ত মাথাটা, ছুটোকে ঠাই ঠাই ক'রে দেওয়ালে ঠোকে।

কিন্তু কেন। কেন এই অপমান সহ্য করবে শুভ্রা। কেন প্রশ্ন করবে না—শুভ্রাকে নিয়ে এই হাস্যকর ব্যবস্থা করবার কী অধিকার আছে অমিতাভর।

ব'সে থাকতে থাকতে রাত দশটা বাজলো।

সমস্ত বাড়ীটা আস্তে আস্তে নিঃঝুম মেরে আসছে। বোঝা যাচ্ছে না

অমিতাভ ফিরেছে কিনা। চুপচাপ নিজের এই বিছানায় প'ড়ে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। জবাব চাই।

এদিকের দরজায় খিল দিয়ে আস্তে-আস্তে মাঝখানের ভারী পর্দাটা সরিয়ে পুরনো পরিচিত ঘরটায় এসে দাঁড়ালো শুভ্রা। না, কেউ কোথাও নেই। শুধু কোথায় যেন গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, শাশুড়ী বুঝি প্রশ্ন করছেন, খাবে না কেন সে !

তবে। তবে তো আর দেরী নেই। খাওয়ার পাটই যখন বন্ধ। বুকটা কেমন ক'রে ওঠে, ব'সে পড়ে কৌচটার ওপর। ঘরটা ঠিক তেমনি আছে। তেমনি উঁচু পালঙ্কে রাজকীয় বিছানা, তেমনি বিভ্রান্তকারী মৃদু নীল আলো। তেমনি ঘরের সমস্ত বায়ুমণ্ডলে দামী-সেন্টের মৃদুমদির গন্ধ। যে গন্ধে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে আসে, রক্তপ্রবাহে নূপুর বাজতে থাকে !

অনেকদিন পরে এলে বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করাটা একটা কর্তব্য নয় কি ?

আর রাত যদি অনেকটা হয়ে যায়, কৌচে ব'সে থাকতে থাকতে অসতর্কে একটু ঘুমিয়ে পড়তে পারেনা মানুষ ? আর ঘুমিয়েই যদি পড়ে কেউ, সেকি টের পায় বেশবাসে কোথাও শৈথিল্য এসে গেছে কি না, আর নীল আলোয় মুখটা বড্ড বেশী করুণ দেখাচ্ছে কি না ?

রূপনারায়ণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত একদিন দু-জনেরই মনে হলো, এ-ভাবে আর চলতে পারে না। এক বছরের তিক্ততম অভিজ্ঞতায় বোঝা গেছে, জোর ক'রে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে না ; তিলে তিলে অশান্তির আগুনে জ্বলে যাওয়ার চাইতে সব একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভালো।

অথচ, এক বছর আগেও মনে হতো, পৃথিবীর সেই সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে সৌম্যেন—যে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে তারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল ; আর সুনেত্রাও হয়তো ভেবেছিল—সৌম্যেনই সেই একমাত্র পুরুষ, যার জন্যে এতদিনের সমস্ত কবিতা, গান আর স্বপ্ন দিয়ে তিলে তিলে সে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলেছে।

সৌম্যেন বলেছিল, গ্রামের স্কুলেই মাস্টারী নিলাম। অসুবিধে হবে না ?

সুনেত্রা হেসেছিল, অসুবিধা কেন হবে ? আমিও পাড়াগাঁয়েরই মেয়ে।

—কিন্তু আমাদের দেশের পাড়াগাঁ তো তুমি দেখোনি।

—সব পাড়াগাঁই সমান। বর্ষায় কাদা হয়, ইলেকট্রিকের আলো থাকে না, রাতে শেয়াল ডাকে। তাতে আমার খুব খারাপ লাগবে না।

—সময় কাটাবে কেমন ক'রে ?

—কেন, ছবি আঁকবো ?

সঙ্গে-সঙ্গে সৌম্যেন ভেবেছিল, সত্যিই তো ! সুনেত্রার জন্যে তার কিসের ভাবনা। কলকাতাতেও তো দেখেছে, সুনেত্রা ঠিক সাধারণ

মেয়ের মতো নয়। চরিত্রের দিক থেকে সে অসামাজিক—ভীড় কোনোদিন সহ্য করতে পারে না ; সামাজিক গল্প-গুজবের ক্ষেত্রে প্রায় নির্বাক—কাউকে প্রগল্‌ভ হতে দেখলে তার ভুরু কুঁচকে ওঠে। নিজের ভেতরে হারিয়ে গিয়ে সন্ধ্যের রঙ্‌ধরা আকাশের দিকে চোখ মেলে সে একা চুপ ক'রে থাকতে ভালবাসে—সৌম্যেন পর্যন্ত তখন তাকে বিরক্ত করে না।

ভালোই থাকবে সুনেত্রা। দুপুরবেলা সৌম্যেন যখন কাজে বেরিয়ে যাবে, তখন নিজেকে নিয়েই সময় কাটবে তার। দিনে কখনো ঘুমোয় না সুনেত্রা, হয় একখানা বই খুলে নিয়ে বসবে, নইলে দোতলার জানলা দিয়ে চেয়ে থাকবে বাইরের দিকে—যেখানে সবুজ ক্ষেত, সোনালি পলিমাটি আর টুকরো টুকরো আটকে থাকা গেরুয়া জল পার হয়েই রূপনারায়ণের বিশাল বিস্তার ; পালের ডানা মেলে দেওয়া নৌকো, চল্‌তি ষ্টিমার, পাখির ঝাঁক, অনেক দূরের কোলাঘাটের ব্রীজের একটু-খানি আভাস। তারপর নীল আর সবুজের দিগন্তরেখা—যার ওপরে সূর্য ওঠে পদ্মের পাঁপড়ির রঙ ছড়িয়ে—সুনেত্রার কপালের সিঁদুরের ফোঁটার মতো প্রথম চাঁদ দেখা দেয়।

সুনেত্রা ছবি আঁকবে। সুনেত্রার কোনো কষ্ট হবে না।

কিন্তু এক বছরে দেখা গেল, একখানাও ছবি শেষ হয়নি তার। সৌম্যেনের মাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারেনি, বাবাকে অত্যন্ত স্থূল এবং পাড়াগেঁয়ে মনে হয়েছে, সৌম্যেনের ভাইবোনদের সকালে এক-একধামি মুড়ি আর তাল-পাটালি খাওয়া দেখে তার গা রী-রী ক'রে উঠেছে। রূপনারায়ণের দিকে তাকিয়ে সে মন মিলিয়ে ব'সে থাকতে পারেনি—সংসারের প্রতিদিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাকে তিলে তিলে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে।

—একটু মানিয়ে চলা যায় না ?

—না।

—মা'র চাল-চলন হয়তো পাড়াগেঁয়ে, তাই ব'লে—

—আমিও পাড়াগাঁয়েরই মেয়ে। গ্রাম্য হলেই যে রুচি থাকবে না, সে-কথা বিশ্বাস করি না।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে সৌম্যেনের। একটা উগ্র কটু জবাব থমকে গেছে ঠোঁটে। খানিকটা কুৎসিত কলহকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তখনই বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

তারপর একদিন জিজ্ঞাসা করেছে স্পষ্ট ভাষায়।

—তুমি কি চাও, তোমাকে নিয়ে আমি সংসার ছেড়ে আলাদা হয়ে যাই ?

বিচিত্র হাসিতে ভ'রে উঠেছে সুনেত্রার মুখ, গালে ছোট্ট একটি টোল পড়েছে। আগে ওই হাসিটা নেশা ধরাতো সৌম্যেনের চোখে, মনে হতো সুনেত্রা এমন একটা জগতের মধ্যে চলে গেছে—যেখানে কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যায় না—নিজের আঁকা ছবির মতোই সেখানে সে আশ্চর্য সুন্দর আর সুদূর। কিন্তু আজ ওই হাসির অর্থ সৌম্যেন বুঝতে পারে। নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, উপেক্ষা। সৌম্যেনের মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠেছে।

—তুমি জানো, আমি বাপ-মা'র বড় ছেলে। ওঁদের আমি দুঃখ দিতে পারবো না।

সেই অসহ্য নিষ্ঠুর হাসিটা তেমনি জড়িয়ে থেকেছে সুনেত্রার ঠোঁটে।

—জানি। দুঃখ দিতেও শক্তির দরকার হয়। তা তোমার নেই।

—দুঃখ দেওয়াটাকে তুমি পৌরুষ মনে করো ?

—শিকলে অভ্যাস হয়ে গেলে তা ছিঁড়তেও দুঃখ হয়। যে বাঁচতে চায়—ও দুঃখটুকুও সে স্বীকার করে।

কথার শেষ নেই, বাড়ালেই বাড়ে। বুদ্ধিতে শান দিয়ে তলোয়ার খেলা যায় অনেকক্ষণ, আর সুযোগ মতো আঘাত করা চলে পরস্পরকে। কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হয় না সৌম্যেনের। তারপরে একটা কথাই এক-সঙ্গে স্বীকার করতে হয় দু-জনকে।

—আমরা ভুল করেছিলাম।

যে সিগারেটটা সবে ধরিয়েছিল, সেটাকে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সৌম্যেন। বলে—সে-কথা আমিও ভাবছি।

—এরপরেও কি আর এ-ভাবে থাকা উচিত?—স্পষ্ট জিজ্ঞাসা সুনেত্রার।

—তাহলে লিগ্যাল্ সেপারেশন ক'রে নেওয়াই ভালো।

—আমিও তাই বলতে চাচ্ছিলাম।

সুনেত্রার কপালের সিঁদুরের মতো চাঁদ উঠেছিল রূপনারায়ণের ওপারে। নদীটাকে দেখা যাচ্ছিল রূপকথার মতো, বকের শেষ ঝাঁক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছিল আশ্রয়ের দিকে। কিন্তু এই সময় সুনেত্রার চোখ তার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল না—একটা হিংস্র আলোয় সে দুটো ঝক-ঝক করছিল। আর তার চাইতেও হিংস্র হয়ে উঠেছিল সৌম্যেনের চোখ।

—বেশ, সেই কথাই রইলো।

সেই কথাই রইলো।

কয়েকদিন পরে ওইরকম আর-একটি সন্ধ্যায় বাড়ীর ঘাট থেকে নৌকা ছাড়লো।

মা ঘর থেকে বেরুলেন না পর্যন্ত। নিঃশব্দ গম্ভীর মুখে বাবা এসে ঘাটে দাঁড়ালেন—সুনেত্রা তাঁকে প্রণাম করলো। বাবার ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো একবার। হয়তো আশীর্বাদ করলেন, ঠিক বোঝা গেল না। আর সৌম্যেনের মনে হলো, যাওয়ার আগে এই অভিনয়টুকু না করলেও পারতো সুনেত্রা। কোনো ক্ষতি ছিল না।

নৌকো ছাড়লো।

জোয়ারের জল এসেছিল সকালে; ফসলের ক্ষেত আর সোনালি পলিমাটির ডাঙা ডুবিয়ে সৌম্যেনদের প্রায় গোয়ালঘর পর্যন্ত উঠে এসেছিল জল। এখন সে জল নেমে গিয়ে রাশি রাশি নরম কাদা আর আঁকাবাঁকা খাল। এখানে-ওখানে আটক-পড়া কচুরিপানা আর কচি-ধানের গন্ধ। প্রায় মাইলখানেক খাল পেরিয়ে রূপনারায়ণ। সেখান থেকে আরও মাইল-দুই কোনাকুনি পাড়ি জমিয়ে কোলাঘাটের স্টেশন। তারপর কলকাতা। সেখানে চিরদিনের মতো সৌম্যেনের কাছ থেকে

হারিয়ে যাবে সুনেত্রা। হাওড়া স্টেশনেই দু-জনের প্রথম আলাপ হয়েছিল, হয়তো শেষ দেখাও সেইখানেই। আ—আর একবার দেখা হতে পারে। কোর্টে।

নৌকো চললো। লগির শব্দ আর জলের আওয়াজ। কাদাখোঁচার পায়ের চিহ্ন আঁকা রেশমী শাড়ীর মতো পলিমাটির ওপর নেমে আসছে ধূপছায়া রঙ। আকাশে বিষণ্ণ শান্তি—ক্লান্ত জোনাকির মতো একটি তারা। খালের জলে মৃদু কান্নার কল্লোল। দু-জনেই ব'সে রইলো নিশ্চুপ হয়ে। কারো কিছু বলবার নেই। একটি কথাও না।

এই সন্ধ্যায়; এই কচুরিপানা, কচি ধান আর ভিজে মাটির গন্ধের ভেতর দিয়ে, এমনি জলের চাপা কান্না শুনতে শুনতে, কিংবা কখনো কখনো উদাস আকাশের শ্রান্ত জোনাকির মতো ওই তারাটির দিকে চেয়ে চেয়ে দু-জনেরই মনে হলো : কিছুই বলার নেই। ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই, অনুতাপও না! কারো কাছে কেউ অপরাধ করেনি, কেউ ঠকায়নি কাউকে। ভুল হয়েছিল আমাদের। ভেবেছিলাম, এক সঙ্গে জীবনের সমস্ত পথটা আমরা পেরিয়ে যেতে পারবো, মনে হয়েছিল : আমাদের দেহ-মন-আত্মা জন্মান্তরের বাঁধনে বাঁধা (যদিও সৌম্যেন জন্মান্তর মানে না, সুনেত্রা মানে কিনা কখনো ভেবে দেখেনি)। কিন্তু দেখা গেল, সমস্ত পথ কেন, কয়েক পা-ও আমাদের একসঙ্গে চলা সম্ভব নয়। ভালোই হলো—এ-ই ভালো হলো। অসহ্য সম্পর্কের জের টেনে চলার চাইতে এমনিভাবে তাকে ছিঁড়ে ফেলাই ভালো।

আজও শেষ বকের ঝাঁক চর পেরিয়ে, রূপনারায়ণ পার হয়ে, পূবের আকাশে মিলিয়ে গেল! দুটো গভীর চোখ তুলে, কালো তারায় বেলা-শেষের সোনালি আলো মেখে নিলে সুনেত্রা। আস্তে আস্তে বললে, আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি।

—কষ্ট তুমিই পেয়েছো, সুনেত্রা।—বিচ্ছেদের দূরত্ব এর মধ্যেই ঘনিয়ে এসেছে সৌম্যেনের গলায় : ক্ষমা চাইবার কথা আমারই। তোমার অনেক ক্ষতি করলাম।

—হয়তো লাভই হলো সৌম্যেন—কে বলতে পারে!

ঠিক কথা—হয়তো লাভই হলো। কিন্তু কী ভেবে সুনেত্রা কথাটা বলেছে কে জানে। জীবনে যা আসে, তা আমাদের কাছে কিছু না কিছু রেখেই যায়—একেবারে বঞ্চনা করে না। মৃত্যু দান করে মৃত্যুকে সহজ ক'রে দেখার শক্তি, দুঃখ দেয় দুঃখকে সহ্য করবার প্রেরণা, প্রথম প্রেম পদ্মটিকে সূর্যের আলো ছুঁয়ে দিয়ে যায়। কিংবা হয়তো সুনেত্রা ভেবেছে, এই ভুল আরো অনেক ভুলের হাত থেকে রক্ষা করলো তাকে, এর পরে যে আসবে, তাকে ঠিক চিনে নিতে পারবে সে, কোনো মোহ তার দৃষ্টিকে আড়াল করতে পারবে না। তবু—

দিনের শেষ আলো নিভলো রূপনারায়ণের ওপারে। আঁকাবাঁকা খালের জল এসে পড়লো নদীতে। ভাঁটার টানে নদী খরস্রোতে নামছে সমুদ্রে। আর দু-মাইল কোনাকুনি পাড়ি জমালেই কোলাঘাট। সেখান থেকে ট্রেন। তারপর আর এক সমুদ্র—কলকাতা। আর সৌম্যেন ভাবলো: আর একটুখানি কি অপেক্ষা করতে পারতো না সুনেত্রা? দু'দিন ধৈর্য ধ'রে সব সহজ ক'রে নিতে পারতো না?

দূরে কোলাঘাট-বন্দরের কয়েকটা আলো সুদূর কলকাতার মতো হাতছানি দিচ্ছে। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললো সুনেত্রা। কেন আর একটুখানি পৌরুষ দেখাতে পারলো না সৌম্যেন? কেন বলতে পারলো না—কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে উদ্ধার করবো এর ভেতর থেকে—কেবল আর ক'টি দিন আমায় সময় দাও?

নৌকো চললো। ভাঁটার টানটা কেমন থমথম করছে। একটা অনিবার্য নিয়তির মতো নৌকো এগিয়ে যাচ্ছে বন্দরের দিকে। আকাশের সব রঙ মুছে গিয়ে চারদিকে এখন অবিমিশ্র কালো—মাথার ওপরে আবছা-আবছা মেঘের ফাঁকে ক'টি তারা আর দূরের বন্দরে কিছু আলোর সংকেত। তাছাড়া শুধু কালো রঙের জল—এই রাত্রিতে রূপ-নারায়ণ যেন কূল ছাপিয়ে দিগদিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে।

নদী প্রায় হ্রদের মতো স্রোতহীন হয়ে গেছে হঠাৎ। শুধু ছোট ছোট ঢেউ উঠছে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে। তারপর কোথা থেকে কানে

এলো গভীর জল-কল্লোলের ধ্বনি—হ্রদের মতো ঘুমন্ত রূপনারায়ণ যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মাঝি বললে, জোয়ার আসছে বাবু। আর একটু আগে বেরুলে—মাঝির কথা শেষ হতে পেলো না। ঠিক তখনই জোয়ারের উচ্ছ্বাস এসে আছড়ে পড়লো নৌকোর গায়ে। মাঝির হাতের দাঁড়টার বাঁধন-দড়ি পট্ ক'রে ছিঁড়ে গেল, জলে পড়তে পড়তে সে সামলে নিলে নিজেকে, আর নৌকোটা একদিকে কাত হয়ে বোঁ করে পাক খেয়ে গেল একটা!

কতক্ষণ? আধ মিনিট? এক মিনিট? কিন্তু এরই মধ্যে যেন পার হয়ে গেল যুগ-যুগান্ত। রূপনারায়ণের কালো জল পরিণত হলো ঝড়ের মহাসমুদ্রে, দূরের আলোগুলোকে জীবনের নিষ্ঠুর কৌতুকের মতো বোধ হলো, রাত্রির হাওয়া কানের কাছে হা-হা করে হেসে উঠলো, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা রেলওয়ে ব্রীজটাকে কোনো অতিকায় কঙ্কালের হাতছানির মতো দেখালো।

—গেল—গেল—চিৎকার ক'রে উঠলো মাঝি।

আবার ঘূর্ণির আবর্তন, ছলকে উঠে এলো একরাশ জল, অসহায়ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হাত-তিনেক পিছিয়ে গেল নৌকোটা। আর বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করলো সুনেত্রা, যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো সৌম্যেনের বুকের ভেতর। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে সৌম্যেন ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই—কেউ নেই।

তখন মাঝি বৈঠা তুলে নিয়েছে। বললে, আর ভয় নেই বাবু—বেঁচে গেছি এ-যাত্রা।

আর ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলো সুনেত্রা—তাকে আশ্রয় দেবার জন্যে যে হাত দুখানা বাড়াতে যাচ্ছিলো সৌম্যেন, মুহূর্তে তারা সংকুচিত আর সংকীর্ণ হয়ে এলো। না—আর দরকার হবে না। সুনেত্রার কাছে নিজের শক্তি, নিজের পৌরুষের পরিচয় দেবার একটি অতি দুর্লভ অবসর পেয়েছিল সৌম্যেন; কিন্তু মাত্র ক্ষণিকের জন্যে যা এসেছিল, ক্ষণিকের মধ্যেই তা মিলিয়ে গেল আবার। মাঝি ফের ভরসা

দিয়ে বললে, আর ভাবনা নেই বাবু, আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে দেবো ঘাটে।

আর ভাবনা নেই। একটা ক্ষিপ্ত ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপলো সৌম্যেন। কী প্রয়োজন ছিল নির্ভাবনার? রূপনারায়ণের জোয়ারে ডুবে যেতো নৌকো, কালো জল এগিয়ে আসতো হিংস্র রাক্ষসীর মতো, আর তখন পুরুষের সমস্ত পরিচয় নিয়ে সুনেত্রাকে নিজের বাহুতে আশ্রয় দিয়ে সে সাঁতরে পার হয়ে যেতো, একবারের মতো অন্তত প্রমাণ করতে পারতো, সুনেত্রা তাকে সম্পূর্ণ জানেনি, এখনো তার অনেকখানি বাকী আছে।

আর সুনেত্রা ভাবলো, কেন তাকে জড়িয়ে ধরতে এসে এমনভাবে হাত গুটিয়ে নিলে সৌম্যেন? কেন তাকে কঠিনভাবে বেঁধে নিয়ে একবারও বলতে পারলো না: এই মরণের মুখে জেনে যাও সুনেত্রা, তোমাকে আমি ছাড়বো না, তোমাকে আমি জোর ক'রে ধ'রে রাখতে পারি?

কিন্তু একটা কথাও বললে না কেউ—আর একটা কথাও না। বৈঠার টানে টানে নৌকো এগিয়ে চললো তীরের দিকে—আলোগুলো উজ্জ্বল আর নিকট হয়ে এলো! তারপর দেখা গেলো বাঁধের মতো রেল-লাইন, রূপনারায়ণ পার হয়ে যা এগিয়ে গেছে কলকাতার দিকে।

একবারের জন্য বাধা দিয়েছিল রূপনারায়ণ; মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্য আশ্চর্য দুর্লভ একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল সামনে। কিন্তু সে সুযোগ ওরা কেউ নিতে পারলো না।

নিয়তির মতো নৌকো এসে ঘাটে ভিড়লো।

নিজের ছোট হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সুনেত্রা বললে, আর আঠারো মিনিট।

সৌম্যেন দাঁতে দাঁত ঘষলো আর একবার। তারপর বললে, হ্যাঁ, যথেষ্ট সময় আছে। ট্রেন আমরা ঠিকই পেয়ে যাবো।

———

কলতলায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তিনটে বাজতে না বাজতেই সরকারী কলের চারিধারে জটলা সুরু হয়।

প্রথমেই আসে পেসাদী—

মাথার চারিধারের চুল উঠে গিয়ে ব্রহ্মতালুর কাছে কগাছি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

দেখায় যেন ঝোড়ো কাকটি।

বিশ-বাইশ বছর মাত্র বয়স হ'লে কি হবে, চেহারা এরই মধ্যে যেন বরব-কাঠ!

চোখগুলো কোটরে সেঁধোনো। নিরক্ত মুখখানা সাদা হাঁস হাঁস করছে। গলাটি নয় যেন পাকা আমের বোঁটাটি, কখন মাথাটা ছিঁড়ে বুঝিপড়ে!

চিঁচি ক'রে বলে—"রোগে এমন করেছে মা—রোগে!"

ব'লে হাঁফাতে থাকে।

ছোট পাখীর মত এতটুকু বুক। কাঁধগুলো যেন পেছন দিকে কে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

পেসাদীর কথা শোনবার ধৈর্য এখন আর বড় কারুর নেই। দেখতে দেখতে কলের জল চলে যাবে। পঞ্চাশটা হাত কলের মুখ ধরবার জন্যে উঁচিয়ে আছে।

তবু বালতি কলসি নিয়ে জলের আশায় যারা কলতলা ঘিরে বসে আছে তাদের কেউ হয়ত নেহাৎ সময় কাটাবার জন্যেই জিজ্ঞাসা করে—

"হাঁফানির ব্যামো বুঝি মা?"

পেসাদী শ্বাস টেনে কিছু বলবার আগেই আবার কেউ পরামর্শ দেয় —"আমার ছোট ননদের শ্বশুরবাড়ি খুব ভালো মাদুলি আছে, কোন নেমকানুন, খাওয়া-দাওয়ার বাদ-বিচের নেই। খালি পাঁচটি পয়সা পেন্নামী।"

অনেক কষ্টে পেসাদী এতক্ষণে দম নিয়েছে। বলে—"শুধু হাঁফানি তো নয় মা—রোগের যে অন্ত নেই।"

যাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা তাদের কান পেসাদীর দিকে থাক বা না থাক নজর সেই কলের মুখে—উড়ে-ভারী যেখানে পর পর তার ক্যানাস্তারা ভরছে।

ওরই মধ্যে চাঁয়ীই একটু আগ্রহ দেখায়। বলে—"তা তো থাকবেই গো দিদি। ও হাঁফানি যে রোগের বাদশা, বাদশা থাকলে উজির নাজির সঙ্গে না থেকে পারে!"

কথাটা ঠিক দরদের হয়ত নয়, কিন্তু অত বিচার করতে গেলে পেসাদীর চলে না! তার কথা শোনবার গরজই বা এখন কার!

সে বিমলিও নেই আর সে দিনও গেছে পাল্টে।

এই কলতলায় তখন তাদেরই ছিল রাজত্ব।

আর কলতলার এই চেহারাই তখন ছিল নাকি?

এককালে ইট দিয়ে তলাটা বাঁধানো হয়েছিল। এখন সে ইটের অধিকাংশই ক্ষয়ে গেছে। খোদলে খোদলে তলার কাদায় ঘোলা জল জমে থাকে।

কল যখন প্রথম বসানো হয় তখন জায়গাটা ছিল ফাঁকা। গলিটা যেখানে বাঁক নিয়ে বড়রাস্তার দিকে চলে গেছে সেইখানেই। প্রায় খোলা-মেলার মধ্যেই বাঁধানো কলতলাটা ঝকঝক তকতক করত।

পেছনে ছিল কাদের পুরোনো বাগান। আম কাঁঠাল পেয়ারা জামরুল আর কলাগাছের ঝোপে দিনের বেলাতেই অন্ধকার।

অন্ধকার হোক, কাছের বস্তির বৌ-ঝি-দের সেই ছিল ভালো। নির্ভাবনায় জল নিতে আসা চলত। বিকেলে স্নান গা-ধোয়াটা পর্যন্ত সারার অসুবিধে ছিল না।

পূব-পাড়ার বড় পুকুরটা মজে গিয়ে ভরাট হবার পর এই কলতলাই ছিল মেয়েদের জটলার জায়গা।

তখন বস্তিতেই ক'ঘরই বা মানুষ। কলের জল ঘড়া ঘড়া নিয়ে গেলেও কারুর কিছু বলবার নেই। বালতি কলসি ছাপিয়ে কলের জল দুবেলা অমন কত উপছে পড়েছে। মেয়েদের জটলা আর শেষ হয়নি।

জটলা এখনও হয় তিনটে বাজতে না বাজতেই।

আর সেই পেসাদীই আসে সব-প্রথমে সেদিন যেমন আসত।

কিন্তু সেদিনকার সে পেসাদী আর নেই। জটলার চেহারাও বদলে গেছে।

পেসাদীই তখন প্রথম এসে কল দখল করত।

কিন্তু তাতে রাগ করবার কেউ ছিল না। "বলি কলতলাতেই কি রাত্তির কাটাস্ নাকি লা?"—বিমলি এসে মুখে ঝঙ্কার দিত, কিন্তু চোখে তার হাসি।

বিমলিই ছিল পেসাদীর সবচেয়ে সোহাগের সই!

কল টেপবার হাতলটা একটা বাঁখারীর টুকরো দিয়ে আটকে দিয়ে তার তলায় বিমলির বালতি কি পেসাদীর পেতলের ঘড়া পেতে রেখে তাদের গল্প চলত।

বিমলির বর বস্তির মধ্যে সবচেয়ে রোজগেরে। তার পায়ে মল, হাতে চুড়ি, গলায় দড়িহার, কিন্তু বিমলির তবু সুখ নেই। স্বামীর বাজারে পানের দোকান, বলতে গেলে সারা দিন-রাত প্রায় সেই পানের দোকানেই থাকে।

"সতীনের ঘর আর করব না, বুঝেছিস!" নির্ভয়ে গায়ের কাপড় আলগা ক'রে কলতলায় স্নান করতে করতে বিমলি হাসতে হাসতে বলত।

"ওমা, তোর আবার সতীন কোথায় লা?" —পেসাদী অবাক হয়ে শুধোতো।

"আছে রে আছে, মিনসে তো সেই সতীনের কাছেই প'ড়ে থাকে হরপহর।" ব'লে বিমলি হাসত।

"ও—তোর বরের সেই পানের দোকান! তা দোকান না দেখলে চলবে কেন ভাই! দোকান না থাকলে এই আমার মত নোয়া সার হতো?"

"নোয়া সারই আমার ভালো। সোমত্থ বয়সে সোয়ামীকেই যদি না পেলাম তো গয়না নিয়ে হবে কি?"

বিমলির কথার ধরণই ছিল অমনি। মেয়ে সব দিক দিয়ে ছিল কেমন দলছাড়া। তার সাধ আহ্লাদ সখও ছিল আলাদা। এক গা গয়নায় তার সুখ নেই। সকলের গোলপাতার ঘরের মাঝখানে টিনে-ছাওয়া পাকাবাড়ি পেয়েও তার মন ওঠে না।

একদিন সেই এক গা গয়না নিয়ে টিনের ছাদের বাঁশেই পরণের শাড়ি পাকিয়ে ঝুলিয়ে কোন্ সুখের সন্ধানে যে সে গেল সেই জানে।

প্রাণের সই পেসাদীকেও কিছু ব'লে যায়নি আগের দিন।

আগের দিন এই কলতলাতেই দুজনে ব'সে কত গল্প না করেছে। গলার দড়ি হার ভেঙে যে পাটি হার তৈরী করবার কথা হয়েছে, হাসা-হাসি করেছে তা নিয়ে।

বলেছে "ও পাটি হার কেন আবার, গলায় দড়ি-ই আমার ভালো!"

দড়ি সে যে সত্যিই গলায় জড়াতে ব্যাকুল কে তখন জানত!

কেই বা কি জানতে পারে!

তার শরীরে এমন রোগ যে আসবে তাই কি পেরেছিল কোনদিন ভাবতে।

বড় বড় দুটো বালতি দু-হাতে অনায়াসে বয়ে নিয়ে গেছে কলতলা থেকে সেই ঘর পর্যন্ত, আর সকলের মত রাস্তায় একবার নামায়নি পর্যন্ত।

তারপর সেই আকালের বছর এলো। চাকরি গেল গুলের বাবার। গুলে তখনও হয়নি। দিনের পর দিন উপোষ। উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। শেষে লুকিয়ে ভিন্ন পাড়ায় যেত ভিক্ষে করতে। তখনও সোমত্থ বয়স। ভিক্ষে যা মিলত তার বেশী নানান রকম গায়ে বিচুটি-লাগানো টিপ্পনি।

সেই দুঃখের দিনেই গুলে কোলে এলো, আর তার সঙ্গে সর্বনাশা রোগ। আঁতুড় থেকে উঠে-ইস্তক ভুগছে।

দুনিয়ার অনেক বদল হয়েছে এর মধ্যে। আকালের পর শহরের এদিকটার যেন বরাত ফিরেছে। দেখতে দেখতে বাড়ি উঠেছে গায়ে গায়ে, বস্তিতে গিজ গিজ করছে লোক। কোথায় গেছে সেই বাগান আর ফাঁকা মাঠ।

সে মানুষ জনও আর নেই।

পেসাদীর কথা শুনে একটু মায়া দেখাবে এমন ফুরসৎই বা কার আছে।

পেসাদী সবার আগে কলতলায় আসে।

ঘরে ফেরে সবার শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে।

চারীর মনে যাই থাক তার ওইটুকু আগ্রহেই সে তাই বর্তে যায়।

বর্তে গিয়ে বলে—"হ্যাঁ দিদি, হাঁফানির সঙ্গে জ্বর তো লেগেই আছে। দুদিন যায় চারদিন যায় আর জ্বর। সে কি যে-সে জ্বর মা—একেবারে বেহুঁস! কোথা দিয়ে কি হয়ে যায় সাড়ও থাকে না।"

চারী চালাক মেয়ে, কথা কয় তো কাজ ভোলে না! ভারী কল না ছাড়তে-ছাড়তেই কলের মুখে কলসীটি গিয়ে ধ'রে বলে, "হ্যাঁ দিদি, তারপর?"

পেসাদী তাড়াতাড়ি ওঠবার বৃথা চেষ্টা ক'রে বলে—"দোহাই দিদি, একটু ছেড়ে দে। আমি বসে আছি সেইখন আর এইখন! আর খানিক বাদে জল চলে যাবে।"

"এই যে দিই দিদি। এই ঘড়াটা আর বালতিটে বই তো নয়! তোমার কথা ফুরোতে না ফুরোতেই হয়ে যাবেখন!"

হতাশ হয়ে পেসাদীকে অগত্যা নিজের রোগের ব্যাখ্যানই করতে হয়।

"রোগের কথা আর কত বলব দিদি! রাত্তিরে আদ্দেক-দিন ঘুম নেই। একবার শুই একবার উঠে বসি—এই রাতভর। শুইছি কি মনে হবে, বুকে যেন কে দশমণি পাথর চাপিয়ে দিয়েছে, দম নিতে পারি না।"

অনেকগুলো কথা ব'লে পেসাদী দুটো হাত মাটিতে রেখে তার ওপর উবু হয়ে ভর দিয়ে হাঁফায়। কপালে কেঁচোর মত মোটা মোটা দুটো শির ফুলে ওঠে।

বালতি কলসি ভ'রে সরিয়ে রেখে চারী বাঁধানো ক্ষয়ে-যাওয়া ইটের ওপর পা ঘষতে ঘষতে বলে,—"গা-টাও একটু ধুয়ে যাই, এখুনি হয়ে যাবে!"

পেসাদী ছাড়া আপত্তি আরও অনেকেরই হয়। কিন্তু চারীর মুখ বড় খারাপ। সহজে কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না।

পা ঘসা সেরে কলতলায় ব'সে সর্বাঙ্গ ঘুরে-ফিরে নির্লজ্জের মত সকলের সামনেই ধুতে ধুতে চারী পেসাদীকে সান্ত্বনা দেয়—"তুমি ওই মাদুলিই একটা আনাও দিদি। যত রোগই থাক্ তার জড় মারতে ওই মাদুলি একেবারে ধন্বন্তরী। আমাদের একেবারে পেত্যক্ষ দেখা যে।"

পেসাদীর আর এ প্রসঙ্গ ভালো লাগে না। তবু চুপ ক'রে থেকেই বা লাভ কি!

শুকনো সজনে-ডালের মত শীর্ণ একটা হাত তুলে দেখিয়ে সে বলে, —"মাদুলির কথা যদি বললে তো এই দেখো!"

সত্যিই কনুইএর ওপর ময়লা সুতোয় একগোছা মাদুলি বাঁধা, ছোট বড় তাঁবার লোহার হরেক রকমের।

"কিছু হয়নি দিদি! যে যা বলেছে কারুর কথা হেলা করিনি; কিছুতে কিছু হয়নি!" ব'লে পেসাদী প্রমাণ দিতেই যেন কাশতে সুরু করে।

এরই মধ্যে আরও দু'চার জন আসে।

নাতনি নিয়ে বুড়ো কানে বৌ, ছেলে নিয়ে মোক্ষদা।

কাশির ধমক থামতে তাদের দিকে চেয়ে হতাশভাবে পেসাদী আবার বলতে সুরু করে,—"কি না করেছি এই রোগের জ্বালায়! বিয়ের জোড়া বেচে সেই কোথা দামুন্যে থেকে তের সিকে দিয়ে মাদুলি আনলাম। সবাই বললে,—আর ভয় নেই, শিবঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা। কই দিদি? বাবা আমায় বাঁ-পায়ে এমনি ক'রে ঠেলে দিলেন!"

কেউ কান দেয় ব'লে মনে হয় না। তবু পেসাদী ছোটখাটো ঢোলকের মত একটি মাতুলি দেখিয়ে বলে,—"এই যে রয়েছে দিদি, রোজ সকালে সন্ধেয় মাতুলি ধুয়ে জল খাই, কিন্তু আমার যে রোগ সেই রোগ। লুকিয়ে তোড়া বেচেছি ব'লে শুধু গুলের বাবার ঠেঙানি খেয়েই মরলাম।"

চারীর কোন আগ্রহ নেই। গা-ধোওয়া সেরে ভিজে কাপড়েই কাঁকালে ঘড়াটা তুলে নিয়ে হাতে বালতি ঝুলিয়ে ডান দিকে একটু হেলে চলে যেতে যেতে সে ব'লে যায়,—"তবু ওই মাতুলি একবার দেখই না আনিয়ে—! পাঁচটি পয়সা বইত নয়!"

এবারও পেসাদী কল পায় না। পর পর আগের তিনজন জল নিয়ে চলে যাবার পর মোক্ষদা একেবারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কলতলায় তার বালতিটা বসিয়ে দেয়।

মিনতি ক'রে কাঁদ কাঁদ হয়ে পেসাদী বলে,—"তোর পায়ে পড়ি মোক্ষদা, আমি এই কলসিটা একটু ভ'রে নিই। সেই কখন থেকে সবার আগে এসে ব'সে আছি।"

মোক্ষদা চারীর ওপরে যায়। চারীর জিভে তবু না খোঁচালে বিষ ঝরে না, মোক্ষদার মুখ বিষের হুল উঁচিয়েই আছে।

নাক মুখ বেঁকিয়ে ধমক দিয়ে মোক্ষদা মুখ-ঝামটা দেয়,—"ব'সে আছিস্ তো ব'সে থাক না। মার মাইটাও টেনে খেতে হয়। এগিয়ে এসে ধরিস্ নি কেন? ব'সে থাকলে কল পাওয়া যায়!"

আশা নেই তবু পেসাদী আর একবার অনুনয় করে,—"তাড়াতাড়ি উঠতে কি পারি দিদি! তাইত আগে এসে ব'সে থাকি! জল নিতে দেরী হ'লে কুঁতোতে কুঁতোতে সন্ধের আগে, আর কাজ কুলিয়ে উঠতে পারি না—সন্ধে হ'লে তো আর চোখে দেখতে পাব না, হাত পা পুড়িয়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে মরব।"

মোক্ষদা তার কথায় কানও দেয় না।

ডান হাঁটু দিয়ে কলটা টিপে ধ'রে বাঁ হাতে ক'নে বৌ-এর দিকে ফিরে নিজেদের আলাপ সুরু করে।

মোক্ষদা নিজের জলভরা সেরে বালতিটা সরাতে না সরাতেই ক'নে বৌ তার মাটির কলসিটা কলতলায় পেতে দেয়।

পেসাদী এবার আর প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না। শুধু তার চোখ দুটো নিস্ফল আক্রোশে জ্বল জ্বল করে। এবার তার সব রাগ গিয়ে পড়ে রুগ্ন ছেলেটার ওপর।

হাঁফাতে হাঁফাতে ক্ষীণ গলায় চীৎকার করবার চেষ্টা ক'রে বলে,—"অ গুলে, অ-মুখপোড়া, পরের টিন বাজাচ্ছ কেন ওলাউঠো? যমের বাড়ি যাবে কবে? আমার যে হাড়ে বাতাস লাগে তাহলে?'

একজন বিরক্ত হয়ে ধমকায়,—"সক্কাল বেলা ছেলেটাকে শাপান্ত করছ কেন গা! কি রকম মা তুমি! ছেলেটা তো এমনিতেই মরে আছে, তার ওপর আবার মরার গাল!"

কথাটা মিথ্যে নয়। অত্যন্ত নির্জীব রুগ্ন কঙ্কালসার চেহারা ছেলেটার। শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের বড় মাথাটা লাট্টুর মত ওপর থেকে নিচের দিকে সূচলো হয়ে এসেছে। মায়ের মত তারও গলায় হাতে সর্বাঙ্গে মাতুলি বাঁধা। মাতুলির বাঁধনে কোনরকমে যেন পৃথিবীতে বাঁধা আছে। পাকাটির মত হাত দিয়ে নিতান্ত নির্জীবভাবে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে পাশের কার টিনের গায়ে ধীরে ধীরে শব্দ করছিল। মার শাসনে এবার ভয়ে জড়সড় হয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে ব'সে থাকে।

ক'নে বৌএর বা অন্য কারুর এদিকে নজরই নেই। একটা কলসি ভ'রে আর একটা কলসিতে জল নিতে নিতে তারা উৎসাহভরে পাড়ার সব কেচ্ছা-কাহিনী আলোচনা করতে থাকে।

বিমলি অমন ক'রে গলায় দড়ি দেবার পর তার স্বামী কিছুদিনের জন্যে বুঝি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। অত সাধের পানের দোকান তুলে দিয়ে কোথায় যে বিবাগী হয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না।

কিন্তু দুনিয়ায় সব কিছুই বদলায়।

বিমলির স্বামী আবার ঘরে ফিরে সংসারী হয়েছে। এবারের বৌটা যেমন হিংসুক তেমনি দজ্জাল। কিন্তু বিমলির স্বামী এখন আর পানের

দোকানে দিন-রাত কাটায় না। পানের দোকানই সে তুলে দিয়েছে। তার বদলে মুড়ি মুড়কির দোকান দিয়েছে বস্তিতেই।

লোকে বলে বৌ ছেড়ে সে নাকি নড়তে চায় না। সারাক্ষণ বৌকে চোখে চোখে রাখবার জন্যেই নাকি তার ঘরে দোকান দেওয়া।

দোকান চলে না ভালো। স্বামী-স্ত্রীতে সারাক্ষণ ঝগড়া লেগেই আছে;

বৌ সারাক্ষণ উঠতে-বসতে খোঁটা দেয়, "এমন ঘরকুণো মেনিমুখো পুরুষ কেউ দেখেছে গা! না খেয়ে উপোষ ক'রে মরবে তবু ঘর ছেড়ে নড়বে না!"

কিন্তু বিমলির স্বামী তবু বৌকে চোখে চোখে রাখবার জন্যেই এক পা কোথাও নড়তে চায় না।

বিমলির মত এ বৌও ফাঁকি দিয়ে কোথাও পালাবে এই কি তার ভয়!

পাড়ার লোকের এই নিয়ে রসালো আলোচনার আর শেষ নেই—

কানে বৌ রসিয়ে রসিয়ে সেই সব কথাই বলে,—"পাকাটির বেড়ায় আগুন ঠেকানো যায় গা! তা ছাড়া খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে যে! সব দেখে-শুনে বোবা হয়ে আছি ভাই, নইলে আগের বৌ বিমলি কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল তা কি আর কারুর জানতে বাকি আছে!"

জানতে বাকি থাক বা না থাক সবাই বিজ্ঞতার ভান ক'রে মুখ টিপে হাসে।

কানে বৌএর জলভরা শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি নিজের বালতিটা তুলে কল দখল করতে গিয়ে মতি ব'লে ওঠে,—"ও কানে বৌ, তোর কলসি ফুটো নাকি লা? সব জল যে গড়িয়ে গেল!"

"কলসি ফুটো!" কানে বৌ সবার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'কোন গতরখাকী এমন দেইজিপনা করলে গা। হাতে কুষ্ঠ হবে না!"

পেসাদী নিজের খালি কলসিটা নিয়ে ব'সে ব'সে হাঁফায়।

জল নেবার আর যেন তার কোন তাড়া নেই। নিজে থেকেই

মতিকে বলে,—"তুমিই আগে ভ'রে নাও দিদি, আমার কপালে নিত্যি যা আছে তাই তো হবে! আমি সব শেষেই নেবখন।"

ক'নে বৌ তার দিকে হিংস্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁলা, নতুন কলসিটা তোর কাছেই যে বসানো ছিল, সেটা ফুটো হলো কি ক'রে এরই মধ্যে।"

"তা কি ক'রে জানব বল!"—পেসাদীর কাশির বেগ আসে আবার। কাশতে-কাশতেই বলে,—"আমি বলে মরছি নিজের জ্বালায়···"

কথাটা তার শেষ করা হয় না। কাশির দমকেই বোধ হয় তার কোটরে-ঢোকা চোখ দুটো অমন জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে।

———

নীলুর দুঃখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে-কাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিক্‌রমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল, তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলে বুঝি ঐ প্রসন্নতা ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হলো, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ্ করেছে। আজ সকালেই মশারীর মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুললো মা—কিরে বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায় নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রণোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথ্‌ড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোষ্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিক্‌রমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটি মুদির দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক—তার ওপর দোকান ভেঙে খেতো—ফলে দোকান উঠে গেল। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোষ্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষে টাকা শেষ হলেই টিক্‌রমবাজী

শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে, তার দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর উপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে-আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে সবার একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামী, ছেলে, ছেলে বৌ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছ'টা ভাই, ছ'টো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসী, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। ক'দিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন-পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোকে বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ ক'টা মার্ডার হল? পোগো হুস্‌হাস্ করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায় নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল কয়েকদিন যাবৎ যে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে, পোগো নিঃশব্দে আসছে পেছন-পেছন। বাস ষ্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধমুখে আকাশ দেখে আর বিড়-বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভালো ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিলো পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না দেখার ভান করে কিছুটা গিয়েই নীলু টের পেল পোগো তার পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে পোগো উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি।

সাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোন দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান!

—ফের! কষাবো একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকোনো হাতছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গীতে রেখে বলে—একদিন ফটে ডাবি ঠালা।

নীলু একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে-করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ঘুমোলে ওর মা হাতড়ে-হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারে বড় শখ পোগোর। সারাদিন লোককে কত মার্ডারের গল্প করে। কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দু'হাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে, তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিন সাতেক আগে এক দিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভাল করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

কি ধুয়েছিস? জিজ্ঞাসা করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কি ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কি ধুয়েছিস আরে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকে নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া অনেকের নাম আছে, যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল বৃটিশ জিতেছে। দু'শো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যাণ্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধ্যেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বৌ-বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশান যখন জমজমাট, তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বৃটিশ নামল। টলতে-টলতে ঢুকল গলিতে, দু' বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছোটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশানের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দু'হাত উপরে তুলে হাঁকায়ে দিয়েছিল —ঈ-ঈ-ঈ-দ্ কা চাঁ-আ-আ-দ! বগল থেকে দু'টো বোতল পড়ে গিয়ে ফটাস্ করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশানে, পাঁচ বছরের টুমিরানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেড়ালী, কাঠবেড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও…' বলে দুলতে-দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই নীলু, জগু, জাপান এসে দু'টোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বৃটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে বৃটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আবে, পঞ্চা-আ-শ হা-জা-আ-র। জাপান আরো দু'বার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজার। সেটাও বিশ্বাস হ'ল না কারো। পাড়ায় বুঝি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে ঈদ কা চাঁদ হট্ ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল বৃটিশ—তিনশো, মাইরি বলছি—বিশ্বাস কর। পকেটে সার্চ করে শ' দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিলো।

আজ সকালে তাই বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বৃটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বৃটিশের টেরিলিনের প্যাণ্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি, গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বৃটিশকে পাওয়া গেল না। ভি, আই, পি

রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশীক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বৃটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি, যার পকেটে ফালতু দু'শো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল, কে জানে রাতে আবার ওরা আবার ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বৃটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। বৃটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নীলুই নষ্ট করেছে। নইলে নীলু গিয়ে বৃটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত—না হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হকেরটা দিয়ে দে।

নাঃ! আবার ভেবে দেখল নীলু। দু'শো টাকা—মাত্র দু'শো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেণ্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায়, তবে বৃটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচাও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশচাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কিভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলিন শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন, যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দু'টো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ্ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি। উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরী হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ-বারোজন ছেলে-ছোকরা—পরনে শার্ট-পায়জামা কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক-ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলায় আগের তালাখ্যাকারীর—খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডীজ্ সীটে দু'-তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। দু'-চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সামনে করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যে চেঁচিয়ে কথা বলছে। উল্টো-পাল্টা কথা, গানের কলি। কণ্ডাক্টর দু'জন দু'দরজায় সিটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নাই। তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত করে?

—আমাদের হাফ্ টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কণ্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারো-খানা দিন।

—পিছনের কণ্ডাক্টর রোগা, লম্বা-ফরসা। না-কামানো কয়েক-দিনের দাড়ি থুতনিতে জমা আছে। এবড়ো-খেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছেলেদের কথায়। বড় অসহায় হাসিটি। নীলু বসার জায়গা পায়নি। কণ্ডাকটারের পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হেডিং দেখে পাশে-বসা একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কি বলত মাইরী।

—ট্রাফিক সিগন্যালের, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ। নিরোধটা কী যেন?

—রাজার টুপি···রাজার টুপি···

—খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা···

পরের স্টপে বাসটা আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে···লেডীজ্···

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল সবার।

সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা চোখে যুবা কণ্ডাকটারের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেণ্টকে!

কণ্ডাকটার ম্লান মুখে হাসে। ঝুলে নীলু দেখছিলো ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশ্যে টিটকিরী ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছা করে। লাঠি, ছোরা, বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটি খুন করে আসতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছুরি নিয়ে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে-মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে-মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে দেয়। শোভন চোখ কপালে তুলল—ওমা আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি ছিমছাম, সাজানো। সামনে বেতের সোফা, কাঁচের বুককেস, গ্রুণ্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যাণ্ট, দেয়ালে বিদেশী কারো ছবিওয়াল ক্যালেণ্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট, মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর সামনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাস্-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতো। মেঝেয় ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসেছিল শোভনের চার আর তিন বছরের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরেজী কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিণ্ডার গার্ডেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরেজী ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখে মিলি-জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল। মিলি বলে —তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়, এঁটো কী?

দু' জনকে দু' কোলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ। মিলি, জুলি তার চুল, জামার কলার

লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে।

—এইবার চড়বে, বাজার এলো এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকালেই বিশচাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেই পুষিয়ে নিতে হবে তো। তোমার এ দু'টো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার আড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁকে ওঠে—কি-সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছে থেকে। নেমন্তন্নের, ঐ ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস্ না নীলু, তোর সঙ্গে কথা আছে।

—যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

বাঃ, আমার যে ভাতের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এতবেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ।

নীলু সে সব কথায় কানে দেয় না। মিলি-জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল, মেদ-বহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙ্গা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকায় সময় এত নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত আর সুখী দেখাতো না তাকে। পাছে হিংসে হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নর ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাবো-যাবো করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম, ভালই হত।

এক কাপে চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে, বাঃ মোটে এককাপ করলে। ছুটির দিনে এ সময়ে আমারও তো এককাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীর হয়ে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এককাপ খেয়েছ।

মিষ্টি ঝগড়া করে দু'জন। মিলি-জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে। তারপরেই হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলিয়ে। তোরা ঠিক সময় চলে যাস।

—শুনুন—শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলাম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে রেখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা, এটা আপনার জানার কথা!

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময় দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাড়ীর বাইরের রঙ করলুম। দেখুন গিয়ে, কালো রঙ দিয়ে ছবি এঁকে-লিখে কী করে গেছে শ্রী! তাছাড়া রাতভোর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাত্রে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাস ভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরেজিতে আপন মনে গালাগাল দিতে থাকল—ভ্যাগাবণ্ডস, মিসফিটস্, প্যারাসাইট্স্···আর কত কী! সাহস নেই যে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখে।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেষ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোবো না? আপনার বন্ধু তো আমার

কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে —চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে হাতে কিছু সরু-সরু বই, প্যাম্‌ফ্‌লেট। আমার দিকে হাত জোড় করে বলল—বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় নয় এদেশে। বললুম—আমার দেওয়াল অনেক নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেওয়ালটা অনেক ইম্পট্যান্ট হলো আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞান লাভ করবে। আমি বুঝলাম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটি মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছ'জন আছি।

নীলু চমকে উঠে বলল—খাওয়ালেন নাকি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াবো না কেন?

—সেকি?

শোভন মাথা নেড়ে বলল, আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারারাত জেগে বাইরে থাকবে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম।

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে দিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কি জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেওয়ালে লেখে। আমি কি করে বুঝব!

—তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা আমি জানি না। সেদিন খবরের কাগজে বাবলু কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিম্প্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলে—না বিশ্বাস করুন। আমি দেখিও নি ওরা কি লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছো।

—হ্যাঁ। সেও পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ-পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ সময় লাগে। ওরা কী খুশী হল। বলল—বৌদি দরকার হলে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময় পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে গেল। ওরা ভাল না?

নীলু শান্তভাবে মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না, নালিশই। কারণ কাল সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড়-বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেওয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থমথমে মুখ করে চলে গেল।

আপনি যদি ঐ ছ'জনকে চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেওয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু'দলের মাঝখানে থাকতে ভয় লাগে আমাদের। বলবেন, যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলল—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেওয়ালে লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এরপর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানলা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো। আমাদের কোনো দলের উপর রাগ নেই। রাতজাগা ছ'টি ছেলেকে খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময় দেওয়ালের লেখাটি নীলু এক পলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছ নীলু? কি রকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হতো। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছো কি রকম উল্টো শিক্ষা।

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন, তার মানে বোঝ?

নীলু মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, না।

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দু'টো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মাছের কাঞ্চন ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কি মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল। হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেওয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কি? অ্যাঁ! পড়ে দেখ এসব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না?

তারপর থেকে যতবার কথাটি মনে পড়েছে নীলুর, ততবার সে হেসেছে। একা-একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্ট-কার্ট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন? নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো। পথ-চলতি অচেনা মানুষের মতো দু'জন-দু'জনের দিকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না, যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায়

শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে চলছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। শুধু মাঝে-মাঝে ভোরবেলায় উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন তুই কেমন আছিস? তোর জামা-প্যাণ্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িস নি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু ফিরবে কিনা ইতস্ততঃ করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়—দাদা ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্—তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হলো না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক তাই? তুই আলাদা বাস করতে রাজি হলি না তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহা রে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দে কথা বলল—তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামী কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুইটি মেয়ে কাণ্ড করল আরো বেশী। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল, ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্যান্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞি-বাড়ীর ভীড়ের মতো রইল রবিবার দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামী, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ্য করল।

যা ভেবেছিল তা হোল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, আবার চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটামট নেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না। একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটি সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এমনি করে মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দু'টো বড় কাণ্ড করেছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না, বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শো'তে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামী টিকিটে বাজে একটি বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে-ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে-দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে-দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে-মধ্যে গলির মুখে-মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরী করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ঐ দলে। কে জানে একদিন হয়তো একটি শহীদ স্তম্ভ তার নামে উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই

বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হতো তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরে-ফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরো দু'দিন তার চাকি ঝাঁক হয়ে যাবে। হাসি মুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে-আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—

—এই চিন্তায় সে কি মাঝে-মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝড়ে-ওঠা কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়। বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে-মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কি চাস্?

পোগো, দূর থেকে বলে—ঠালা, ঠোকে মার্ডার করব।

শান্ত গলায় নীলু বলে—আয় করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে, একটু সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে-ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারব না, আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে। নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু। পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দু'জনে। তারপর—যা নীলু যেমন কাউকে বলতে পারে না।

সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—আপনি বলে যায় পোগোর কাছে। পোগো নির্দিষ্ট মনে তা বুঝবার চেষ্টা করে।

তীর্থের কাক

সন্তোষকুমার ঘোষ

দেবকান্ত বলল, এ মেয়েটা আবার কে ?

ছ'মাস ধরে গ্যাস নেই, কয়লায় রান্না করতে হয়, শিবানীর মেজাজ তাই উচিত মতো কারণেই উচ্ছে-উচ্ছে। আঁচলে কয়লার কালি মুছে সে বলল, কে আবার ? খুকু এবার ডোমেসটিক সায়েন্স আর ইংরিজি দু'টোতেই ফেল, পড়াবার লোক খুঁজছিলুম, খবর পেয়ে উমেদারি করতে এসেছে।

যে-গ্যাস বেশ কিছুদিন থেকে নেই, তার প্রায় ভুলে-যাওয়া আওয়াজ শিবানীর গলায় ফোঁস-ফোঁস হয়ে ফুলে উঠল। উচিত মতো কারণে।

আবার টিচার রাখবে ? এবার বোনাস দিয়েছে কম, ইনক্রিমেণ্টের বেলাতেও কর্তারা একচোখো। পেয়ারের মানুষদের ঢেলে দিয়েছে, অন্যের বেলায় কিপটে। ওভারটাইম তো কবে থেকেই নেই, টুর থেকে যা দু' পয়সা উপরি, তা ওই টিচারের মাইনে দিতেই যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল দেবকান্তর, শিবানী সেটা কানে না তুলেই বলল, যাক না !

তুমি তো বলছ, যাক না ! কিন্তু খুকুর বিয়ের বাবদ মাস-মাস যে ক'টা টাকা জমাতাম, টিচারের মাইনে দিতেই তা ফাঁক হয়ে যাবে, বুঝছ না ?

বুঝব না কেন, সবই বুঝি। বে' দিতে গেলে পড়ানো হয় না, পড়াতে গেলে বিয়ের ফুল কুঁড়িতেই শিঁটিয়ে যেতে থাকে।

তুমি এত বোঝ ? একেবারে খোলতাই ব্রেইন ইকনমিক্সে।

হবে না ? সংসার চালায় কে, তুমি না আমি ?

তুমিই তো। সেই যে কথায় বলেছে না, মাথার ঘোমটা টানতে পাছার কাপড় উঠে যায়, সেই খেল্ দেখাচ্ছ তুমি।

—খালি অসভ্য কথা !

সাত সকালে হাত পুড়িয়ে চা বানিয়ে দিয়েছে শিবানী, সুতরাং ঝাঁঝালো গলায় মুখঝামটা দিতেই পারে।

—আহা, সামলাচ্ছ তো। তাই তোমাকে একটু বাহবা দিলাম।

বলতে-বলতে গাল টিপে দেবে বলে দেবকান্ত হাত বাড়ায়, শিবানী গাল সরিয়ে নেয় ঝটপট, রাগ-রাগ গলায় বলে, তোমার ইদানিং একটু ইয়ে বেড়েছে। এই বয়েসে, ছিঃ। তোমাকে রাত্তিরে ভাতের পরে সঞ্জীবনী সালসা আর দেব না।

এটা বলবর্ধক। বল দেয়, আর আয়ু দেয়।

আয়ু দিক, বল নিয়েই আমার ভয়।

বল গেলে যে খাটতে পারব না।

মুশকিল সেই তো। রোজগারের জন্যে খাটুনি চাই, কিন্তু বেশি বল-টল হলে ঝামেলা পোয়াতে হয় আমারই।

কী বললে, দূর ! পোয়াতি তোমাকে আর হতে হবে না।

দেবকান্ত সত্যিই কি আর শিবানীর গালে হাত দিত ? দিত না। একে তো বুকের বাতাবি দুটো কবে ফুলো-ফুলো হয়ে উঠে গিয়েছে গালে, যার ফলে চোখ দুটো আরও ছোট আর কুতকুতে, ব্লাউজের নিচে এখন সেই বাতাবির স্রেফ দুটো বোঁটা। হাত বাড়াবে কী, পিত্তি পড়ে যায় ইচ্ছেটার।

তা-ছাড়া লুঙ্গিটা ঠিক মত কষা হয়নি, কোমরের কাছে আলগা, হাত-টাত বাড়ানোর মতো বাড়াবাড়ি করলে জেন্টু হিসাবে একটু বেকায়দায় পড়ার ঝুঁকি।

চায়ে চুকচুক চুমুক দিতে-দিতে দেবকান্ত বলল, মেয়েটা কেমন ?

প্রথমবারে বলেছিল 'কে', এবার বলল 'কেমন'।

আমি নাড়ি-নক্ষত্র জানি নাকি। তবে রাস্তায় আজকাল যারা আবছায়ায় গলিঘুঁজিতে ছেলে ধরে বেড়ায়, তাদের মতো হবে বলে ঠেকল না। তেমন জেল্লাই নেই। বলল চার বোনের এক বোন। কষ্টে-স্বষ্টে বি-এ পাশ করেছে। এখন শিখছে টাইপিং। স্টেনো হলে নাকি কাজ জোটানো সোজা।

অ। দেবকান্ত বলল। —বে' থা ?

ভালবাসার একটা ছেলে পাকড়েছিল। একটা নয়, দু'টো। একটার নাকি আগেই বিয়ে হয়েছিল, ট্রাম-বাসে টো-টো আর ঢাকা খুপরিতে চা খাওয়াই সার। আর একটা মারা গেল গুলিতে। পুলিসের না, অন্য একটা গ্যাং-এর। যা দিনকাল হয়েছে না আজকাল! খুকিকে কি চোখে-চোখে রাখি সাধে ?

আর খুকির মাকে ? নিজের চোখে নিজেকে তো দেখা যায় না!

মরণ! (আয়না তো আছে। আর নিজেকে তো তোমার চাউনিতেই দেখতে পাই!)

দেবকান্ত এতক্ষণে বিরাট হাসল। এখন না-মাজা দাঁত যদিও।

হাসছ ?

নাড়ি-নক্ষত্র জানো না বলেছিলে কি না! অথচ দেখছি মেয়েটার নাড়ি-নক্ষত্র কী, নাড়ি-ভুঁড়ি সব এরই মধ্যে টেনে বের করে ফেলেছ।

বেশ করেছি। আমরা পারি। মেয়েরা, আমরা জন্ম-দাই।

মাতৃজাতি যে।

আর পিতৃজাতি হয়ে তুমি কী মহাকার্যটা করছ বল তো। নিজেই যদি মেয়েটাকে পড়াতে, তবে ট্যুইশনির টাকাটা সাশ্রয় হত।

আরে দূর! কম্পোজিশন ভুলেছি বটে! ইট হ্যাজ্ বীন গোয়িং; হী হ্যাজ্ কাম, হী ইজ্ কাম, আর হী কেম—কী তফাৎ? টেন্‌স নিয়েই যত টেনশন। বড্ড খটমটে এই ইংরিজি। গবরমেণ্ট তুলে দিতে চেয়েছিল, ঠিক করেছিল। খামাখা বাগড়া দিয়ে—আর ডোমেসটিক সায়েন্স-এর আমি কী-ই বা জানি? আমাদের কালে ওসব ছিল নাকি ?

বলতে-বলতে দেবকান্ত কলঘরের দিকে এগোতে থাকে। তলপেটে তৎক্ষণে সকালবেলাকার সেই জরুরী মোচড়—চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল যদিও। না-মাজা দাঁত মেজে ঝকঝকে করতে হবে। ফাঁকে-ফোকরে বাসী বোটকা কিছু লেগে থাকলে, সেসবও একই সঙ্গে নিকেশ করা চাই। আগে দরকার স্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য, সুগন্ধ—তবেই না ভাল মন।

এখন, এই দেবকান্ত সম্পর্কে গোড়াতেই একটা কথা সাফ-সাফ বলে দেওয়া দরকার। সে আমার, আপনার, দশজনের মতোই গড়-পড়তা একজন। চেহারা মাঝারি, দেবতুল্য নামটা জন্মসূত্রে গোটা কয়েক তোবড়ানো তোরঙ্গ, বাপের দেনা, আরও দুটি আইবুড়ো বোনের বোঝা চাপিয়ে যাওয়ার মতো অবিবেচনা (এই ভুলটা দেবকান্ত করেনি, বিয়ের পর থেকেই সে মেট্রোর পাশের গলির রেগুলার খদ্দের), একটা আলস্টার যা এই কলকাতার শীতে কক্ষনো লাগে না, ইত্যাদির সে বাহকমাত্র। যেমন সে কনুইয়ের উপরে মাদুলিরও ধারক। তবে মাদুলিটা বাইরে, অফিসে লুকানো থাকে, নামটাকে অন্তত মাসে বার পাঁচেক প্রকাশ্যে ভাউচারের দস্তখত করতে হয় এই যা তফাত।

অফিস সাড়ে দশটায়, তবে সে আমার আপনার মতেই বারোটায় যায়। বাসে উঠতে পারেনি, ট্রামের তার ছিঁড়েছিল, আহা এইসব অজুহাত যেন সধবার সিঁদুরের মতো বরাবর বজায় থাকে। সকালে খবরের কাগজ, আর বাথরুমের চাহিদা জোগাতে চা। ঠাণ্ডা লাগলে বা বুকে সর্দি বসলে তুলসীপাতা—সেটা শিবানীই জোগাড় করে। একফালি বারান্দা আছে, সেখানে হিম-সকালে মিঠে রোদের আদর পড়ে, আর কলকাতায় বসন্তকাল বলতে তো একরকম নেই-ই, তাই গ্রীষ্মের হাওয়া, সন্ধ্যেবেলা। শখের (শিবানীর) টবে রজনীগন্ধা, ইত্যাদি-ইত্যাদি, মানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেসব ফুলের নাম মেলে, তার বেশ কয়েকটা। ফুলের বদলে তুলসী, পেঁয়াজ, লঙ্কা, এইসব লাগালে মন্দ হত না। সুবাস ? সব কিছুরই আছে, নিতে জানলে। তরি-তরকারির কিছু টবেই ফলানো গেলে রোজানা বাজার খরচের খানিক

বাঁচত, অন্তত পাঁচশোর বদলে মাঝে-মাঝে মাছ আনা যেতো সাড়ে সাত শো, কিংবা সরপুঁটির বদলে টাটকা (কানকোর গোলা রং রক্তের মতো টাটকা) পোনা। বাজারে দেবকান্ত খুব বেশি সময় নষ্ট করে না। কারণ শেভিং একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার, তা চাও বা না চাও গাল তোমার কাটবেই, বিশেষ করে থুতনির জায়গাটা। দিশি ব্লেড তো, কত আর হবে। দেবকান্ত খতিয়ে দেখেছে, দেশি সব বৃদ্ধি, খালি বউ বাদে। মেমসায়েব মেয়েমানুষের বা ঝক্কি, বাপরে, মজুরি পোশায় না।

তারপর কাগজ পড়া। সাবালকদের রক্তারক্তি, নাবালিকাদের উপর পাশবিক—যাত্রাপালায় ডাগর-ডাগর সব অ্যাকট্রেস। চাউনির তীরে চোখ কানা হয়ে যায়। ঠিক মোড়েই একটা হোরডিং, হিন্দি সিনেমার। উথাল-পাথাল শরীরটা কতদিন ধরে যে! একটা যায় তো আর একটা আসে। সমুদ্রের ঢেউ যে রকম। তবে এ হলো সেই সমুদ্র আর সেই ঢেউ, যার ফেনা নেই—খালি দোল্‌-দোল্‌-দোল দোলানি।

আপনার নাম ?

সুলতা পাত্রী।

পাত্রী ? একরকম পদবিও বুঝি হয় ?

মেয়েটির মাথা নিচু, নখ খুঁটছিল ?

হয় নিশ্চয়। নইলে—

নইলে আপনার হলো কী করে, এই তো। শুধু পাত্রী ? পাত্র-টাত্র জোটেনি, তাই ?

সব কথা কি মুখে আনা যায় ? তাই দেবকান্ত বেশির ভাগ কথা মনে-মনেই বলছিল। কোনও কথা আটকে দেয় না, ঢালাও ছাড়পত্র বিলি করে, মনের মস্ত উদারতা এইখানে। মন ঠোঁট ছুটোর মতো খইনি-টেপা পাহারা-ওয়ালা নয়।

আসলে সময় কাটাচ্ছিল দেবকান্ত। যে মশা নেই মাঝে-মাঝে তার দু'একটা চটাস্‌ করে মেরে মেয়েটাকে চমকে দিচ্ছিল। 'কো

সাবজেক্ট পড়াতে পারবেন তো, আমার মেয়ের ইয়ে তেমন মাথা নেই, (মায়ের ধাত পেয়েছে বুঝলেন কি না, তাই !) এই সব কথার ফাঁকে-ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখছিল চড়ুই যেভাবে খুঁটে-খুঁটে খায়, পিঁপড়ে চিনির দানা যেমন করে তোলে, অনেকটা তাই। পক্ষী-পতঙ্গাদির কাছে মানুষের চক্ষের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় যে কত আছে, দেবকান্ত এই ধরনের ভাবনার গভীর গাঙে ডুব দিতেও পারত, (আরে বাবা ইন্টারভিউ একেই বলে, চোদ্দ পুরুষের বৃত্তান্ত আমার বেলাতেও ওরা নাড়ি-ভুঁড়ি-সমেত টেনে বের করেছিল, তবে না আজ ডি-এ-টি-এ মিলিয়ে নগদ ন'শো ছাপ্পান্ন টাকা বিশ পয়সা পাই, শিবানী মানে আমার ওয়াইফ্, অবশ্য জানে সাড়ে নয় শো, মানে ষোল টাকা বিশ পয়সা, ওটা আমার গোপন আয়—কালো টাকা, হ্যাঁ-হ্যাঁ। সব্বারই থাকে কালো টাকা, কারও ষোল হাজার কি ষোল লাখ ; আমার স্রেফ ষোল, এই যা, মানে ছু' নম্বরি খাতার ঝামেলা নেই), এমন আরও কত অতল দর্শন, কিন্তু বেলাটা উঠতি-বয়সি মেয়েদের মতো চনমনে হয়ে উঠছে, অফিস-টাইম, আর বেশি সময় নেই, তাই—

যা জানবার তা এক্ষুনি। যেমন—মেয়েটার বুকে বাতাবি আছে।

দেবকান্ত চোখ ছু'টো টুকে নিল। আর ছেলেবেলায় ফুটবল খেলার বিতিকিচ্ছিরি জের—ব্লাডার দেখলেই কেমন ফুঁ দিতে সাধ যায়। দেবকান্ত চিমটি কেটে ছুষ্ট ইচ্ছেটার বায়না থামাল।

হঠাৎ হাওয়া দিল। খুব দরকার ছিল না। তবু মেয়েটা বুকের আঁচল টানল। কিন্তু পায়ের কাছে পাড়টা একটু উঠে পেটিকোটের এক চিলতে ফ্রিল, একটি কি ছু'টি রোম আহা রে! দেবকান্তর ছোঁক-ছোঁক চোখ এখন হুমড়ি খেয়ে সেখানে। যেন ভিখিরি। লালা গড়াচ্ছে। অথচ—অথচ লালা তো গড়ায় জিভের। চোখের, শালা চোখের কেন। চশমা জোড়া যে দিয়েছে, ধরতে হবে সেই বানচোত দোকানদারকে।

আর উঠল না, আর উঠল না, ইস। হঠাৎ হাওয়া-তোলার কায়দা-কানুন দেবকান্ত শিখে রাখেনি। হাতপাখায় ও-কাজ হয় না। হলেও

চালাত কে? দেবকান্তর ইলেকট্রিক ফ্যান নেই। থাকলে হয়তো একটা হিল্লে।

এক লপ্তে টাকাটা দেওয়া মুশকিল, কত মাস ধরে ষোল টাকা করে জমালে, তবে আস্ত একটা ইলেকট্রিক পাখা?

দেবকান্তর জিভে জল, সে মাথা ঘষে-ঘষে শুকনো ভাবটা ফিরিয়ে আনতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হুস—! একটি কাক। আচ্ছা, বিজলি পাখাও না-হয় কেনা গেল। কিন্তু সাপ্লাইয়ের তো আজকাল মতি স্থির নেই। ওই পাত্রী যখন পড়াতে বসবে, তখন যদি লোডশেডিং? তবে তো, তবে তো আর শায়ার ফ্রিল, ফাউ হিসেবে কয়েক গাছি নরম রোম—ন্নাহ্! ইনভেস্ট্মেন্ট বেশি হয়ে যাবে। মুনাফার ব্যাপারে গ্যারান্টি যেখানে নেই, সেখানে অত রিস্ক নেওয়াটা ঠিক না। এমনিতেই তো এই টিচারের মাস-মাস মাইনে গুণতে—

এই নিয়েই একটু খিটিমিটি গোড়ার দিকে। একটুই। দেবকান্তদের এই একটা জোর বরাত, কোনও কিছুই বেশি দূর গড়ায় না, অনেকখানি ছেঁড়ে না, উপছেও পড়ে না কিছু। আয়-ব্যয়, টানাটানির ন্যায় মন-কষাকষিও পরিমিত। আদালত? দূর! মশারির ঘোরাটোপই সুপ্রিম কোর্ট।

ধরা যাক গোড়ার দিকে একদিন শিবানী বলেছিল, বাজার থেকে ফিরে নিত্যি বুকে উরুতে এত তেল থাবড়াও কেন?

দেবকান্ত চট করে বেকুবের মুখোশ এঁটে নেয়। সেলোফোনের মতো পাতলা, চট করে ধরাই যায় না। উত্থান নেই, পতনও নৈব চ, এমন গলায় সে বলে, কই, না তো! তুমি হুটহাট এমন করে এক একটা কথা বলো না! অ্যাতো তেল! পাব কোথায়? তেল আজ-কাল কত আক্রা জানো তো!

জানি বলেই তো বলছি। কিচ্ছু সস্তা নয়। সময়ও না। আগে তুমি বাজারের থলেটা ধপাস্ করে ফেলে দিয়ে আর ফুরসত পেতে না, 'অফিস-টাইম, ভাত বাড়ো' বলে কলঘরে ছুট্ লাগাতে। আজকাল তেল মাখা আর শেষই হয় না।

—বুকে সর্দি বসেছে। সারা রাত ঘড়ঘড় করে, টের পাও না?

—সে তো টের পাচ্ছি বিয়ের পর থেকেই। কিন্তু তুমিও যেন পাচ্ছ আশ্চয্যি সেইটেই। যে ঘুমোয়, তার কানে নিজের ঘড়ঘড়ানি যায় কী করে?

আর কথা বাড়ানো ঠিক না, সহজাত বিজ্ঞতা দিয়ে দেবকান্ত এটা নিজেই বুঝতে পারে। সুইচবোর্ডের কোন্‌খানে তারে-তারে শর্ট-সারকিট একটুতেই টের পাওয়া যায়। শক্ লাগলে ঠেলে উল্টে দেবে।

সুতরাং বুদ্ধিমানের মতো নাকে মুখে যা হোক গুঁজে ছম্পট লাগাও। এল বাস, এস বাস, মিনি বাস—না পেলে শেয়ারের ট্যাক্সি, তা ও।

গোড়ার দিকে ঘামটা একটু বেশি হত। যেদিন-যেদিন খুকুর দিদিমণি আসত, অফিসে বেয়ারাকে ডেকে বাড়তি জল খেতে হত এক গ্লাস। তারপর ফুলস্পিডে পাখা, বিজলি যদি থাকে তবে।

তারপর শান্ত, সুবোধ কর্মচারী দেবকান্ত একদিন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবে। শিবানীকে বোঝাতে হবে—আজ রাত্তিরেই—অবিশ্যি বিজলি যদি থাকে।

নইলে বেজায় রিস্ক। বুকের রোমে হাত বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ আর-একটা পায়ের গোছের রেশমি রোম চোখে ভাসে। দূর হয়ে যাক ওই ভাসাভাসি। হ্যাঁ, শিবানীকে কী বলতে হবে, সেটা গুছিয়ে নেওয়া দরকার এই বেলা। বড়বাবুর ঘর থেকে ডাক আসার আগেই।

নজর রাখতে হবে। (ফার্স্ট সেনটেন্স)।

না, না, ওর ওপরে নয়, কেমন পড়াচ্ছে, সেই দিকে। মানে চোখ নয়, কান! (সেকেণ্ড আর থার্ড সেনটেন্স একসঙ্গে)

তা-হলে আস্তে আস্তে কম্পোজিশন আমার ফের রপ্ত হয়ে যাবে। চাই কি, একটু-আধটু ডোমেষ্টীক সায়েন্সও। (ফোরথ আর ফিফথ সেনটেন্স, এই লাস্ট।)

মনে হয় ওতেই হবে। শিবানী সতী-সাধ্বী, লক্ষ্মী, বুঝদার। ফাউ একটা সুবাসিত কিচ্ছু হাতে দিয়ে—তুমি তো রান্নাঘরে ব্যস্ত, তাই আমি—

এর পরও যদি ট্যারা চোখে চায় কি ফোঁস করে, তখনও দাওয়াই আছে। ভদ্র, বাধ্য নাগরিক দেবকান্তরাও দেখিয়ে দেবে, তারাও ফণা তুলতে জানে। তেমন ঠেকলে। 'আমরা সব রুল মেনে করি। যেমন সারভিসে, তেমনই সংসারে। একচুল এদিক-ওদিক নেই। যা কিছু উইদিন বাউণ্ডস, শালীনতার বেড়ার ভেতরে। আইন-অমান্য? ওসব ধাতেই নেই, না ঘরে, না বাইরে।'

কথাগুলো মনে-মনে যেন মুখস্থ, দেবকান্তও ধাতস্থ। লোডশেডিং-এও ঘাম-টাম নেই।

এইভাবেই কাটে। সকালে রুটিন, দুপুরে রুটিন, বিকালেও। দিনের পর দিন। পানউলির কাছে পানটি কিনে, দু' আঙুলে আলতো ধরে একটু মাপা হাসি, রেশন-করা রসিকতা।

তবু একদিন সকালে হুড়মুড় করে বাজ পড়তেই পারে। বাজার সেরে সবে বুকের জঙ্গল তেলে মোলায়েম করছে, তখনই ওপাশের গলি থেকে সাধন। অফিসের সহকর্মী, মাইনে গ্রেড-ট্রেডও প্রায় সমান-সমান।

—আরে মশাই শুনেছেন? মিস্টার তালুকদার—বোধ হয় আর নেই।

—সে কী! কী বলছেন মশাই? কালও দেখলুম সেক্রেটারি ছুঁড়িটাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর নেমে, বিজলি নেই, লিফ্‌ট অচল, তাই সিঁড়ি দিয়ে—

—ওই ছুঁড়িগুলোই তো ওঁর দফা নিকেশ করল মশাই। এই বয়সে—

—কত বয়েস আর? দেবকান্তর গলা ফ্যাসফেঁসে শোনায়।

—তা পঞ্চান্ন তো হবেই।

—কী হয়েছিল?

—স্ট্রোক।

ততক্ষণে দেবকান্ত তেল চুপচুপে গায়েই শার্ট চড়িয়ে নিয়েছে কোনওক্রমে। তালুকদার অফিসের তিন নম্বর, মইয়ের ধাপের হিসাবে। তিন নম্বর বটে, তবে দু' নম্বর হতই। কিছুদিন বাদে।

—একটা ট্যাক্সি নিই, কী বলেন?

দেবকান্তর বুকটা হঠাৎ দরাজ। তা-ছাড়া মনে পড়ে কিনা যে, সি-আর মানে কনফিডেনশিয়াল রেকর্ডটা তালুকদারেরই হেপাজতে। ওঁর রিপোর্টের উপরেই ইনক্রিমেণ্ট। এখন অবিশ্যি বিশেষ আসে যায় না, তবে কী লিখে গেছে কে জানে। সেই সেক্রেটারি ছুঁড়িটা তো আছে!

—কোথায়, বাড়িতে না নার্সিং হোমে?

—বাড়িতেই হবে বোধ হয়। ষ্ট্রোক হয়েছে কাল সন্ধেয়। ম্যাসিভ। রিমুভ করতে সময় কিংবা ভরসা পায়নি।

ট্যাক্সিতে;

এমনিতে খুব দয়ালু ছিলেন। সফ্ট-হার্ট। একবার ঠেকে যাই। উনি আমাকে বিশ টাকা ফস করে বের করে দিয়েছিলেন।

সেই টাকাটা যে শোধ দেওয়া হয়নি, দেবকান্ত সেটা আর সাধনের কাছে ফাঁস করে না।

—আর নেই, শুনেছেন ঠিক?

—ওঁর খাস বেয়ারা নিচে থেকে চেঁচিয়ে ওমনি কী একটা বলেই তো দৌড়। আমার তখন কি আর মাথার ঠিক আছে? আপনাকে খবর দিতে ছুটে এলাম একটা টোস্টে দাঁত বসিয়ে কি না বসিয়ে—আমাকেও উনি খুব ইয়ে মানে স্নেহ করতেন কি না। যেদিন ওই ডবকা ছুঁড়িটা নেই, সেদিন ডেকে লিফ্ট দিতেন। বলতেন, চলুন না, পৌঁছে দিচ্ছি।

শুনে দেবকান্ত বেশ বিষণ্ণ বোধ করে। তাকে তালুকদার বিশ টাকা দিয়েছিলেন, সেটা আর শোধ দেওয়া হল না, ধারটা জন্মের মতো জমা হয়ে রইল, প্রথমত এই কারণে। বিবেক বলে জিনিস। না-কামানো দাড়ির মতো খড়খড় করে। দ্বিতীয়ত, তাকেও যে তালুকদার খাতির

করতেন, লিফট দিতেন ঘন-ঘন, সাধন যে সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা জানিয়ে দিতে পারল, এটাও সঙ্গত একটা দুঃখের জন্ম দিতেই পারে। শোধ না-দেওয়া বিশটা টাকা যেন চটপট পকেটমার হয়ে গেল। তার আর ওজন নেই, অন্তত বুকে অনুভব করছে না দেবকান্ত। তবে আজ যে শেভ্ করা হয়ে ওঠেনি, সেটা মন্দের ভালো। ক্ষৌরি-করা গাল বেমানান হত শোকার্ত্ত ওই বাড়িটাতে।

ট্যাকসিটা ছাড়তে হল বাড়ি থেকে একটু দূরে। একে তো ভিড়, তাতে শোকের বাড়িতে যাওয়া কি সমুচিত, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে?

আপনি একটু এগোন, বলে দেবকান্ত একটু পিছিয়ে পড়ে। কি ভেবে এক ছড়া কলা কেনে। পকেটে রাখে।

লোক অঢেল, তবে অ্যামবুলেন্স নেই, কালো গাড়ি বা ট্রাকও না। পা টিপে-টিপে এগোয় দেবকান্ত। পেছনে হুশ করে একটা গাড়ি। কাদা বাঁচাতে জামা বাঁচিয়ে একপাশে দাঁড়াতে হয়। গাড়িটা ডাক্তারের।

লোক-লোক, ছুটোছুটি। সবাই গম্ভীর। এই নিশ্বাসে মিশে-যাওয়া ভিড়ে কে আর কাকে দেখছে?

দেবকান্তর চোখ অবশ্য খুঁজছিল পরমেশ্বরনকে। অফিসের নাম্বার ফোর। এবার তিনিই তো তিন নম্বর হবেন, সি আর যাবে ওঁর হাতে। দেবকান্ত যে এসেছে, পরমেশ্বরনের সেটা চোখে পড়েছে কি না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে দেবকান্তও আকুল চোখে খুঁজছে পরমেশ্বরনকে। সার, হিয়ার অ্যাম আ.ই—যেন এক শোকের বাড়িতেও একটা অদৃশ্য হাজিরা খাতা আছে। এর পরে বস হবেন যিনি, তাঁর নোটিসে আসা খুব সাকসেস্‌ফুল।

তবে দেবকান্ত একবার একটু অন্যমনস্ক হয়। তালুকদার নিচের ঘরেই। তাঁর খাটের উপরে হুমড়ি খেয়ে একটি মেয়ে, বোধহয় তালুকদারের কন্যাই হবে, চোখ যে ফোলা সেটা বোঝা যাচ্ছিল থেকে থেকে মাথা তুললে, ওদিকে পায়ের দিকে কাপড়টা অনেকটা উঠে গেছে। সুগোল, সুডৌল, সাদা।

ফেরানো যায় না, তবু দেবকান্ত চোখ দুটোকে এক রকম থাপ্পড় মেরে ঘোরায় অন্য দিকে। মেয়েটির কষ্টে তারও যে কত কষ্ট সেটা দেখিয়ে দিতে চোখ ছলছল করতে হয় ঘষে-ঘষে। এই মহৎ প্রয়োজনে পকেটে সহৃদয় রুমাল খুঁজতে হয়।

মালাটা সেই পকেটেই। ইতিমধ্যে পরমেশ্বরনের সঙ্গে হঠাৎ চাউনিরও লেনদেন হয়ে গেছে। হবেই। সততা; শোক, মর্মাহত সহানুভূতি এসব দাম পাবে না? বিধাতার বিধান অতটা গরীব হয়নি এখনও।

পরমেশ্বরনের গলাতেই মালাটা এবার পরালে কেমন হয়? এর পর তিন নম্বর বস যিনি? —ন্‌নাহ্‌, ঠিক হবে না, অন্তত এখানে না। সব কিছুর স্থান আছে, কাল আছে। একটু কাছে ঘেঁষে যাবে নাকি দেবকান্ত? ফিসফিস করে বলবে, 'স্যার, দেরিতে খবর পেলাম! আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

বেলা তো চড়চড় করে এগারোটা এখন? তা নিয়ে বিশেষ ভাবনা নেই অবিশ্যি। সিনিয়র অফিসারের ডেথ-এ অফিস নির্ঘাত ছুটি দেবে। তা-ছাড়া ইমিডিয়েট বস নিজেই তো অকুস্থলে। দেবকান্তর ভাবনা কিসের, ভয় কাকে।

কিন্তু হঠাৎ ঘণ্টা দুই বাদে চাপা কান্নার গুনগুন থামল যে? থম-থমে মুখগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিকে ওদিকে।

সেই জাঁদরেল ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছেন এতক্ষণে, তাঁর বেরোবার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ওই মেয়েটিরও শাড়ি-টাড়ি এখন গোছানো। শান্ত-স্থির প্রতিমা যেন।

রাশভারি গলার ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, এখন রিমুভ করা যায়। আমি ফোন করে দিচ্ছি ইনটেনসিভ্ কেয়ারে। বাড়িতে সব ফেসিলিটি নেই তো!

ইনটেনসিভ্ কেয়ার? তার মানে যাননি, উনি যাননি! স্বজনদের মুখে মেঘ-চেরা রোদের মতো হাসি।

তাদেরই একজনের পিঠ চাপড়ে বড় ডাক্তার সেই ধন্বন্তরি বলেন,

এ-রকম মিরাকল র‍্যালি বড় একটা দেখা যায় না। হি হ্যাজ আ লট অভ ফাইট্ ইন হিম। নাউ সাম ট্রিটমেণ্ট অ্যাণ্ড অভ কোরস আ লং স্ট্রেচ অব বেড রেস্ট। আই অ্যাম শিওর হী উড কাম রাউণ্ড ইন আ মান্থ অর টু।

ভিড় ক্রমশ পাতলা। হাঁটছে দেবকান্ত। আস্তে-আস্তে, আস্তে। মাথা নিচু। কে যেন কথা রাখল না, কোথায় যেন ঠকা হয়ে গেল। ঠকলে একটু লাগে। কেউ মরলে শোক, আবার না মরলেও! অদ্ভুত তো সব! মনের তলের ব্যাপার-স্যাপার কে-ই বা কতটুকু জানে!

আসলে প্রমাণ দাখিলটা পুরো হল না কিনা, দুঃখ সেই জন্যে। সুযোগই মিলল না দেখিয়ে দিতে যে, হতে পারে গরীব, তবু তারাও বড়—মনুষ্যত্বে। সহকম্পিত মন-মর্ম ইত্যাদি মেলে দেওয়া গেল না, তাই দু'ফোঁটা স্বতঃস্ফুর্ত জল দেখা দিল তার চোখে।

কাকে বোঝাবে, বুঝতে চাইবেই বা কে যে, দেবকান্তদেরও সব আছে। সামাজিক স্নেহ। অন্তত একটা স্টেনলেস ষ্টীলের বাটি কোনও বাচ্চার অন্নপ্রাশনে। সামাজিক প্রীতি, কর্তব্য। শাড়ি কি স্টোল কি বই কি ইলেকট্রিক ইস্তিরি—বিয়ের উপহারে। অবশ্য সম্পর্কের ওজন আর নেমতন্নবাড়ির মান বুঝে। তবে শ্রাদ্ধে ওসব বালাই কম। দায়-টায় চুকে গেলে কীর্তনে একটা কি দুটো টাকা প্যালা দিলে!

এখন কোথায়? অফিস? মানে হয় না। লেট-মার্কের সময়ও পার—বেলা গেছে। ফের ট্যাক্সি? যাক্ আর তো তাড়া নেই, স্রেফ অপব্যয়। হেঁটে-হেঁটে দেবকান্ত যখন তার বাড়ির দরজায়, তখন কোথায় যেন ঢং-ঢং—পাঁচটা, না না সাড়ে চার? একে গলি, তাতে শীতকাল, এরই মধ্যে ছায়া ছায়া অন্ধকার।

শিবানী বলল, এরই মধ্যে হয়ে গেল?

দেবকান্ত জবাব দেওয়ার আগেই সে ঈষৎ-তপ্ত লোহার একটা টুকরো কোথা থেকে জোগাড় করে আনল।

ক্লান্ত, চোখ লাল, পা টলছে, দেবকান্ত হাত তুলে বলল, লাগবে না ওসব।

—কেন, তুমি শ্মশানে যাওনি?

দেবকান্ত বলল, ওসব কথা পরে। একটু জিরোতে দাও আগে।

বলে সে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, শিবানী বলল, উঁহু, ওখানে সুরমা, মানে খুকুর টিচার পড়াচ্ছে।

—সে কী? এই বেলাও?

—ও বেলা গোলমালে পড়ানো হয়নি, তাই পুষিয়ে দিতে এসেছে। নতুন টুইশনি তো, মেয়েটার ভয় আছে।

দেবকান্তর হাই ওঠে। বলে এক গ্লাস জল দাও। জল আসে, তখন সে বলে, তা হলে এই বারান্দাতেই মাদুর বিছোই। একটু গড়াই।

বলে পকেট থেকে মালাটা সে ছুঁড়ে দেয় শিবানীর দিকে। একটু হালকা, একটু হৃষ্ট হয়। যেখানকার জিনিস যথা স্থানে।

তার পর শিবানী কতটা অবাক হল সেটা দেখার অপেক্ষা না করেই পাশ ফেরে। সেই শোধ না-দেওয়া বিশ টাকার বোঝাটা আর বিবেক হয়ে বুকে চেপে বসে নেই। হালকা। আবার ভারাতুরও। ধারটা এবার একদিন না একদিন শোধ তো দিতেই হবে। তাই।

দরজার পরদাটা ঝুলে খাটো, তাই ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায় বারান্দার শানে কি মাদুরে আড় হয়ে শুলে। চোখ জড়িয়ে আসছিল, ঠিক তখনই ছিটের পরদাটা হঠাৎ হাওয়ায় নৌকোর পাল, ভাগ্যিস। পাল, না এলো চুল? সরছে, উড়ছে সরছে। সেই ফাঁকে-ফাঁকে পেটিকোটের ফ্রিল, এক-এক ঝলক। উপরি দু'এক গাছি রোমও। কোনও দোষ নেই, যদিও দেবকান্ত ক্লান্ত তীর্থের কাক এখনও কিংবা চাতক! শোকে না হোক, সারা দিনের ধকলে শুকনো চোখের তেষ্টা একটু মিটবে না? এ তো শুধু লজেনজুসের জন্যে বাচ্চা ছেলের লালার মতো! তার বেশি না!

একটু কুটুস কামড় শুধু। একদিনের ক্যাজুয়াল ছুটি কাটা গেল কি গেল না। যায় যদি যাক, এখন একটু ভরপুর দেবকান্ত ওটাকে

ছারপোকার মতো টিপে মারতে পারে, সি এল নিয়ে ফালতু ভাবনাটাকে। ওটা ছারপোকা। ঠাণ্ডা শান, ছায়ের কোল, পুরোনো দোল। ঢুলুনি এসেছিল, কিন্তু 'বাবা, ও বাবা' ডাকে চটকা ভাঙল। ঠেলছে কে যেন।

—খুকি, তুই? পড়া হয়ে গেল? তোর মাস্টারনি?

—সে চলে গেছে ক-খো-ন। তুমি যেই এলে, সেই সাড়া পেয়েই ওদিকের দরজা দিয়ে—

—তক্ষুনি?

জড়ানো চোখেও তড়াক করে উঠে বসে দেবকান্ত। তবে যে ক'গাছি রোম, শয্যার কোণ—

কার, কার, কার? মেয়ের শাড়ির পাড় নজরে পড়তেই চকচকে ছুটো চোখেই বোবা চিৎকার। তীর্থের কাক সজাগ এখন। সারা গায়ে কাঁটা। লালায় জলে ভেজা চোখের পাতায় এখন আঠার মতো পাপী পিচটি, দেবকান্ত তার চাউনি চট্ করে তো আর মেলতে পারবে না।

দূর, যত সব বাড়াবাড়ি। মেলতে পারে, একটু পরেই। কারণ একটু পরেই থপথপ করে আসে শিবানী, হাত ধরে তোলে। পতিতের উদ্ধারকারিণী।

—খাবে চলো।

নিয়ম-মানা সবাই যা করে, দেবকান্ত তাই করে তাই। খায়।

—এবার শুতে যাও।

কখনও যারা বাচাল হয় না, ঠিক তাদের মতোই দেবকান্ত বিছানায় যায়। অন্ধকারে সময়মতো হাত বাড়িয়ে শিবানীকে আলগা জড়ায়। শ্মশান থেকে ফিরলে যা ছুঁতে হয়, এই তো তাই। একটুখানি গরম লোহা, নিষ্পাপ উত্তাপ, বউয়ের গা। পবিত্রতা ফিরে পেতে ভীত, পুণ্যার্ত দেবকান্তদের দৈনন্দিনতায় বৃত্ত গোলাকার—আর কী চাই?

———

কাল আয়ো

রমাপদ চৌধুরী

আমার অনেককাল থেকে ইচ্ছে ইরানীদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবো। দু'দুখানা নোটবুকের পাতা ভর্তি হয়ে আছে সংগ্রহ করা নানা তথ্যে। একেবারে প্রথম জীবনে ইচ্ছে হয়েছিল ওদের নিয়ে গবেষণা করবো, সাহিত্যের পথে চলে আসবো ভাবিনি। প্রায় আট-দশ বছর ধরে টুকরো-টুকরো নানা তথ্য জোগাড় করেছি, নানা ঘটনার কথা লিখে রেখেছি, নানা দৃশ্য। তারপর কিভাবে কখন যে নেশা কেটে গিয়েছিল, তা নিজেও জানি না।

সেদিন হঠাৎ পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে দু'খানা নোটবুকই পেয়ে গেলাম। একটির মলাট ছেঁড়া, আরেকটির মলাটে ছাপার অক্ষরে ১৯৪১। খাতার মলাটে যে তারিখই থাক, চোখ বুলিয়ে বুঝলাম তার পরেও কয়েক বছর ধরে টুকিটাকি দু'দশ লাইন ঢুকেছে।

পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে অনেক কথা মনে পড়ে গেল।

ছেলেবেলায় আমরা সকলেই ওদের ইরানীই বলতাম। বেদে নয়, জীপসী নয়। ইরানী নামেই যেন ওদের মানাতো। ওরা নিজেরাও বলতো, ওরা ইরানী। কেন বলতো কে জানে।

ইরান কোথায়, তার স্পষ্ট ধারণাও ছিল না, ইরানী বললে ইরানের লোক বোঝায়, তাও জানতাম না। আমাদের কাছে ইরানী মানে বেদে। অথচ বেদে বললে চোখের সামনে ভেসে উঠতো বেদে-বেদেনীর দল, যারা সাপ খেলাতো, দাঁতের পোকা ঝেড়ে দিত, বাঁশি বাজাতো, পট দেখাতো। পট দেখিয়ে গান গাইতো।

প্রথম দেখেছিলাম ছেলেবেলায়। স্কুলে পড়ি তখন।

রবিবারে হাট বসতো গোলবাজারে। বিশাল মাঠ জুড়ে বাজার, তেমনি ভিড়। কারখানার শ্রমিক, ছত্রিশগড়ী মেয়েরা ঝাঁকা বয়ে নিয়ে যেত, লোকে বলতো বোঝাওয়ালী, সাইকেল-চড়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে, সাহেবসুবো, বাঙালী বাবু, মাদ্রাজী-মারাঠী-পাঞ্জাবী, আর চার-পাশের গ্রাম থেকে আসা চাষী মেয়ে-পুরুষ আসতো তরিতরকারী সব্জী বেচতে। কারখানার মদ্যপ শ্রমিক থেকে শরীর-বেচা মেয়ে অবধি ঐ গ্রামের মানুষদের বলতো, জংলী।

কেন বলতো কে জানে। শহুরে বলেই হয়তো। এখন আর কেউ মুখে বলে না।

রবিবার সকালে হাটবাজার করার ভার ছিল আমার উপর।

ইতোয়ারী হাট, লোকের ভিড় দশগুণ, কিন্তু হাটে গিয়েই দেখি সারা গোলবাজার ঝলমল করে উঠেছে।

সবারই মুখে এক কথা, ইরানীরা এসেছে, ইরানীরা এসেছে। সারা বাজার ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। এক-এক জায়গায় দু' তিনটে করে মেয়ে। ধুলোয় মলিন রঙিন ঘাগরা, নকশা কাটা অভ্র বসানো আঙিয়া, কানে পিতলের মাকড়ি, গলায় পুঁতির, পাথরের মালায় বিদেশী রূপোর টাকা, কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ছুরি বিক্রী করছে, কেউ রঙিন পাথর।

—জার্মানকা চাক্কু, জার্মানকা চাক্কু।

পুরুষের দল ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কেনার বাসনায় নয় নিশ্চয়ই।

—চুরি লিও। চুরি। চুরি মানে ছুরি।

চোদ্দ-পনেরো বছরের চোখেও ঘোর লেগেছিল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। কালো চুল, মুক্তোর মত সাদা দাঁত।

বিশুদ্ধ সাহেব-মেমও শহরে কম ছিল না। কিন্তু আমার শ্বেতাঙ্গিনী দেখায় অভ্যস্ত চোখও নেশার টানে পড়ে গেল, রহস্যময় রূপের টানে।

লালচে ফর্সা রঙ, কাটাকাটা নাক মুখ চোখ, লম্বা চেহারা, টানটান

হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে কেমন একটা তেজী ভাব, অথচ হাসিতে চোখের চাউনিতে অদ্ভুত এক রুক্ষ মাদকতা।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বাজার দায়সারা। ঘুরে-ঘুরে দেখলাম, এদল ওদল। সারা হাট জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ইরানী মেয়ের দল।

সেই টিকলো নাক, ধারালো চিবুক, চোখের তারা ঈষৎ বাদামী, বাঁকা ভুরু, আর অলজ্জ স্তন, স্মৃতির পঠে ছবি হয়ে আছে।

ছিপছিপে দীর্ঘগড়ন সেই সুন্দরীর দল, লম্বা বেণী, নাচিয়ে-নাচিয়ে পাথর বেচছে—আইয়ো গাজ্জো, পাত্থর লেও, বেলদারি পাত্থর।

হাতে মেলে ধরেছে নানা রঙের ছোট-ছোট পাথর। আমার চেয়ে বছর কয়েকের বড় একটি ছেলে হেসে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলো।

—পকেট সামলে, এক নম্বরের পিকপকেট ওরা।

আরেক দল ছুরি বিক্রি করছে কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে, হেসে-হেসে। সেই ফোল্ডিং ছুরি, বোতাম টিপলে সাত-আটটা মাপের ছুরি বেরিয়ে আসে। ওরা বলে—জার্মানকা চাক্কু। জার্মানকা চাক্কু।

সেই বয়সে বড়ো ছেলেটি বললে, সরে যাও, বিশ্বাস নেই ওদের, ঝপ্ করে ছুরি বসিয়ে দেবে বুকে।

ঘুরতে-ঘুরতে আরেক জায়গায়। দু'টি ইরানী মেয়ে ভবিষ্যৎ বলছে। ভাগ্যগণনা করছে। তৃতীয় মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার গায়ের ছোঁয়া পেয়ে সবাই মোহগ্রস্ত, কেউ বা হাসা-হাসি করছে। যে ভবিষ্যৎ বলছে তার হাতে একটা আয়না।

আরেক জায়গায় আরেক দল।—লিও, লিও, তারোত লিও।

তাস এগিয়ে দিচ্ছে, একটা টেনে নিতে হবে।

সারা হাটজুড়ে শুধু ইরানী মেয়ের দল, একটাও পুরুষ নেই।

ফিরে আসতে না আসতে পথে ঘাটে সারা শহর জুড়ে একটাই আলোচনা। একটাই খবর। ইরানীরা এসেছে, ইরানীরা এসেছে।

বয়স্কদের মুখে ভয়। সামাল-সামাল। দু'টো করে তালা লাগাও। ওরা ভয়ঙ্কর চোর।

কিন্তু আমাদের মনে তখন একটা নেশা ধরে গেছে।

আমি, ইদ্রিস, আর ব্রিজলাল। ইদ্রিস বললে, শ্মশানের ওপারে জানকি ময়দানে ওরা তাঁবু ফেলেছে।

ব্রিজলাল বললে, চল দেখে আসি।

ওরা দেখেনি, শুধু গল্প শুনেছে। খবর শুনে ছুটতে-ছুটতে গিয়েছিল, বড় দেরিতে। তখন হাটে আর একজনও নেই, সবাই চলে গেছে।

আমি তখন মোহগ্রস্ত। যেন একটা অদৃশ্য চুম্বক আমাকে টানছে।

বললাম—চল যাই।

স্কুল পার হয়ে বেশ খানিকটা গেলে সারি-সারি তিনপটিয়া খ্রীস্টানদের কোয়ার্টার্স। এক-একটা পাড়া এ শহরে, এক-এক জাতের জন্যে নির্দিষ্ট। এক এক-ধর্মের। যেমন খ্রীস্টান পাড়া, মুসলমান পাড়া, হিন্দু পাড়া। আবার পাঞ্জাবী পাড়া, মারাঠি পাড়া, অ্যাংলো পাড়া, মাদ্রাজী পাড়া, বাঙালী পাড়া। দু'-একটা ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। পাঞ্জাবীদের মধ্যে এক ঘর বাঙালী, কিংবা বাঙালীদের মধ্যে এক ঘর ইহুদী।

শুধু অফিসারদের বাংলোগুলোই আলাদা আলাদা। বেশির ভাগই খাস ইংরেজ সাহেবসুবো। দু' একটি ভারতীয়। বাঙালী আরো কম।

বে-বল্গা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সেজন্যেই খুব সুবিধে ছিল।

তিনপটিয়াদের বসতি ছাড়িয়ে তিন বন্ধু চলেছি ইরানীদের খোঁজে। যেন একটা অদৃশ্য চুম্বক টানছে, টানছে। খোলা মাঠ পার হয়ে শ্মশান পেরিয়ে বজরং তালাও। একটা বেশ বড়সড়ো পুকুর।

বজরং তালাওয়ের পাড়ের ওপর উঠতেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ।

যেতে আসতে এই মাঠখানা ফাঁকা পড়ে থাকতো। একেবারে ফাঁকা। দু' একটা গাছপালাও নেই। বজরং তালাওয়ের পাড়ে উঠতেই ওরা দু'জনই চিৎকার করে উঠলো, ঐ তো।

শূন্য মাঠের ওপর তাঁবু পড়েছে। ছোট ছোট বেশ কয়েকটা তাঁবু। দূর থেকে লোকজনও দেখা যাচ্ছে।

এতক্ষণ হনহনিয়ে এসেছি, এবার আপনা থেকেই পায়ের গতি আলগা হয়ে গেল। কেমন একটা গা ছমছম ভয়।

তবু থামতেও পারছি না। ইদ্রিস ভীতু ভাববে, ব্রিজলাল ভীতু ভাববে।

ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছি।

নোংরা-ছেঁড়া তাঁবু। কোন কোনটা চাঁদোয়ার মত, শুধু রোদ্দুর আড়াল করার জন্যে। তার নীচে বসে মোটা-সোটা একটা বুড়ি আলু ছাড়িয়ে ডেকচিতে রাখছে। নানা বয়সের মেয়ে এ তাঁবু থেকে ও তাঁবুতে যাচ্ছে। ঘটিবাটি, কাপড়-চোপড় আনছে। একজন বসে-বসে বাচ্চা মেয়ের চুলের উকুন বাছচে।

আমরা দূরে দূরে ঘুরলাম। যেন ওদের দেখতে আসি নি, দেখছি না। অন্য কোন কাজে এসেছি। ব্রিজলাল হেসে বললে, ইরানী-লোগদের কি সির্ফ লড়কি পয়দা হয়?

আমরা হেসে উঠলাম। সত্যি, ওদের পুরুষরা কোথায়? তাঁবুর আশেপাশে, চাঁদোয়া-ঢাকা উঠোনে কোথাও একজনও পুরুষ নেই।

শুধুই মেয়ে! বুড়ি, বাচ্চা, বেশির ভাগই যুবতী। সেই ঘাগরা, সেই ধুলো-বসা রঙিন আঙিয়া। তরতর করে হেঁটে যাচ্ছে। তরতর করে ফিরে আসছে। এক কোণে খুঁটিতে বাঁধা একটা গাধা আর দু'টো ছাগল। ছাগল দু'টোকে অশ্বত্থ পাতা এনে খাওয়াচ্ছিল একটা মেয়ে। ধুলোয় বসে পা ছড়িয়ে। ঘাগরা উঠে এসেছে এক পায়ের হাঁটুর ওপরে। কোন খেয়াল নেই। কিংবা নির্বিকার।

সে হঠাৎ আমাদের দেখতে পেল। তাকিয়ে রইলো।

তারপর পিছন ফিরে চিৎকার করে কি বললো, কাকে কে জানে।

আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি দূরে সরে এলাম।

অথচ বেশী দূরেও নয়! কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ। এগিয়ে যেতে, কথা বলতে ভয়। আবার চলে আসতেও মন চায় না!

এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে শেষ অবধি চলেই আসছিলাম। বজরং তালাওয়ের পাড় ধরে। পাড়ের ওপর উঠতেই চোখ আটকে গেল।

শান বাঁধানো ভাঙা পাথরের ঘাটে দু'টি ইরানী মেয়ে।

এইমাত্র স্নান করে উঠেছে। একজন পোশাক বদলে ফেলেছে,

আরেকজন ভিজে পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে নিলো এমন কায়দায়; কিছুই দেখা গেল না।

কিংবা সেই মুহূর্তে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে চুলের জল নিঙড়ে ফেলতে ফেলতে একজনের চোখ পড়েছিল আমাদের দিকে, তাই ভয়ে কিছুই চোখে পড়েনি।

সে কি যেন বললে সঙ্গের মেয়েটিকে। সে হেসে উঠলো আর হাতছানি দিয়ে ডাকলো আমাদের।

এগিয়ে গেলাম, ভয়ে-ভয়ে। না গিয়ে উপায়ও ছিল না।

কাছে যেতেই মেয়ে দুটো হাসাহাসি করলো, কি যেন বলাবলি করলো নিজেদের ভাষায়।

কিন্তু কোন সঙ্কোচ নেই, সেই ঋজু শরীর টানটান করে মাথাটা পিছনে ঝাঁকিয়ে চুলের জল ঝাড়লো।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, কাহে আয়ো ?

বুঝতে পারলাম না! মেয়েটা হাসলো দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে। বললে, 'গানা ?

আমরা বলে উঠলাম,—হাঁ-হাঁ গানা। গান শুনবো।

মেয়েটা দু'হাতের দশটা আঙুল দেখালো, বললে, দোবা দেশ রুপে।

বলেই হাত পাতলো। বুঝলাম, কুড়িটা টাকা দিলে তবেই গানা হবে।

পকেট উল্টে বললাম, নেই।

ইদ্রিস আর ব্রিজলাল বললে, চল-চল। আমরা চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে জামা ধরে পিছন থেকে টান। মেয়েটা হেসে উঠলো।

হাত নেড়ে বললে, নেহি-নেহি। অর্থাৎ টাকা চাই না।

অন্য মেয়েটা ততক্ষণে ভিজে কাপড়ের রাশ তুলে নিয়েছে।

লম্বা মেয়েটা নীচে রাখা জলভর্তি ঘড়াটা মাথায় তুলে নিতে যাবে, হঠাৎ ব্রিজলাল বলে বসলো, তুমারা ঘর কাঁহা ? দেশ ?

ইরানী মেয়ের সারা শরীর তখন কৌতুকে হাসছে। দু'জনেই শরীর দুলিয়ে হেসে উঠলো। বললো—ঘর?

দু'খানা হাত ঘুরিয়ে সারা আকাশ দেখিয়ে বললে, সারো দুনেয়া।

সারা দুনিয়া।

অন্যজন আমাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে বললে, বাচ্চো।

লম্বা মেয়েটা ঘাড় নাড়লো।

বেশ বুঝতে পারলাম ওরা আমাদের বাচ্চা ভাবছে। সেজন্যেই ডেকে কথা বলেছে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছে।

আসলে বাচ্চাই তো। ছিপছিপে ছ'ফুট লম্বা চেহারা, সোজা টানটান হয়ে দাঁড়ালো ঘড়াটা মাথায় নিয়ে। আমরা বেঁটেখাঁটো, বয়েস কম। বাচ্চাই তো।

ইদ্রিস জিগ্যেস করলো, তোমাদের পুরুষেরা কোথায়?

—গাভোমে।

আরেকজন বললে, শহর গায়েনো।

বোধহয় বোঝাতে চাইলো শহরে গেছে। ঘড়া মাথায় মেয়েটা চলে যেতে-যেতে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকালো, গানা?

তারপর হেসে বললে, কাল আয়ো, আকাই।

বুঝতে না পেরে বললাম, আকাই? আকাই কেয়া।

দু'টো মেয়েই হেসে উঠলো। বললে, ইধারো।

আঙুল দেখিয়ে ঘাড় দেখালো। তারপর বললে, নিনিয়া রুপে। ত্রিন বাচ্চো। নিনিয়া রুপে। বলে হাসলো।

অন্য মেয়েটা বললে, নাবো নাবো। দশ আঙুলের একটা আঙুল মটকে বুঝিয়ে দিলো, ন'টাকা।

বললে, আকাই, ইধারো। আঙুল দিয়ে ঘাট দেখালো।

বলে তরতর করে চলে গেল। আমরা তাকিয়ে রইলাম। তিনটি বাচ্চা। পনেরো-ষোল বছরের যৌবনে সদ্য পা দেওয়া তিনটি কিশোরের বুকের মধ্যে জীপসী নাচের বাজনা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আমরা চলে এলাম। বললাম, ন'টা টাকা যেমন করে হোক জোগাড় করতেই হবে। ওদের গান শুনবো, নাচ দেখবো।

শরীরে তখন একটা অদ্ভুত মাদকতা। প্রথম যৌবনের রক্তে নাচানাচি।

সেই দীর্ঘ ঋজু চেহারা, রঙিন ঘাগরা, অভ্র বসানো আঙিয়ায় আঁটা দু'টি সপ্রতিভ স্তনের লুব্ধতা, বাদামী চোখ, টিকলো নাক, বাঁকা ভুরু, সুতীক্ষ্ণ চিবুক, কোমর বেয়ে নেমেছে চুলের বেণী, গোলবাজার মাৎ করে কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে বিক্রি করছে, জার্মান চাক্কু, জার্মান চাক্কু।

সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখলাম। নিনিঁয়া রুপে। ন'টা টাকা।

আমি, ইদ্রিস, ব্রিজলাল।

ন'টা টাকা জোগাড় করলাম সত্যিমিথ্যে নানা গল্প বানিয়ে।

তারপর যথাসময়ের অনেক আগেই তিনজনে চললাম সেই বজরং তালাওয়ের দিকে। শান বাঁধানো ভাঙা পাথরের ঘাটের দিকে।

তিনপটিয়া বসতি পার হয়ে শ্মশান পার হয়ে সেই জানকি ময়দানের দিকে।

বুকের মধ্যে তখন ঘুঙুর বাজছে, ইরানী মেয়ের পায়ের ঘুঙুর। হাতের ঢোলক, খঞ্জনী বাঁধা ঢোলক। আশায় আনন্দে বুককাঁপছে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি।

বজরং তালাওয়ের উঁচু পাড়ে উঠে শান বাঁধানো ঘাটের দিকে তাকালাম।

না, এখনো আসেনি।

আরো এগিয়ে গেলাম। এখনি আসবে, আসবে।

পাড় ধরে-ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো সেই ফাঁকা মাঠের দিকে।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল।

ফাঁকা। ফাঁকা।

আমরা তিনবন্ধু ছুটতে-ছুটতে এগিয়ে গেলাম সেই মাঠের দিকে।

খাঁ-খাঁ করছে শূন্য মাঠ। বুকের ভেতর।

তাঁবু নেই, একটাও তাঁবু নেই। একটায় মানুষ নেই।

সেই তাঁবু, চাঁদোয়া, খুঁটিতে বাঁধা ছাগল—সব, সব উবে গেছে।

ইরানীরা চলে গেছে।

বুকের মধ্যে শূন্যতা। বুক পকেটে খচখচ করছে ন'টা টাকা। রুপোর টাকা। ঝনঝন করছে।

আমরা বোকার মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

কেউ কোন কথা বলতে পারছি না। বুকের মধ্যে একটা টনটন ব্যথা। আজও হয়, মনে পড়লেই বুকটা টনটন করে ওঠে।

সে জন্যেই বোধহয় নেশা লেগেছিল। চুম্বকের মত টানতে।

তখন আর ভয় ছিল না। শুধুই একটা মোহ।

যেখানে দেখেছি ছুটে গিয়েছি। যদি চিনতে পারি। যদি আবার দেখতে পাই।

আসলে বুঝতে পারি গবেষণার ব্যাপারটা একটা অজুহাত।

রামগড়ের মাঠে ইরানীদের তাঁবু পড়েছে। সাহসে ভর করে চলে গিয়েছি। স্টেটসম্যান অফিসের পাশে জটলা করছে ইরানীরা, আলাপ জুড়ে দিয়েছি। জামসেদপুরের মাঠে, রাঁচিতে, রায়গড়ে, বিলাসপুরে।

নোটবুকের পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলেছি। অনর্থক।

মাঝেমাঝেই মনে হয়েছে ওদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবো।

লেখা আর হয়ে ওঠেনি। একটা গল্প, তাও লেখা হ'ল না।

মনে পড়লেই বুকটা শুধু ব্যাথায় টন্‌টন্ করে ওঠে।

———

রক্ত

বুদ্ধদেব গুহ

ওয়ার্ড বয়টি বলল, খেয়ে ফেলুন।

আমার সামনে দু'হাতে দু'গ্লাস গ্লুকোজ-গোলানো জল ধরে দাঁড়িয়েছিল সে। ঢক্ঢক্ করে গ্লাস দু'টি নিঃশেষ করে আবার তার হাতে ফিরিয়ে দিলাম। যিনি ক্লিনিকের চার্জে ছিলেন, প্যাথলজিস্ট, বললেন, ঘড়ি দেখুন। ঠিক দু'ঘণ্টা পরে রক্ত নেওয়া হবে।

দু' ঘণ্টা? বিরক্তির গলায় শুধোলাম ওঁকে।

উনি নৈর্বক্তিক গলায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ!

দু'টি ঘণ্টা ঐখানে বসে থাকতে হবে ভেবেই অস্বস্তি লাগতে লাগল।

আজ অনেকদিন হয়ে গেছে সেই দু'ঘণ্টা। অনেক ঘণ্টা, দিন, মাস বছর পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, ভাগ্যিস সেদিন দু' ঘণ্টা সময় ওখানে বসে ছিলাম, নইলে ওর সঙ্গে পরিচিত হতাম না কখনও। ওদের সম্বন্ধে কিছু জানতেও পেতাম না।

ওখানে বসে থাকতে-থাকতেই একটু পরেই চারজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক একই সঙ্গে সেই এয়ার-কণ্ডিশনড ক্লিনিকের দরজা ঠেলে ঢুকল। কাউণ্টারে একজন ক্যাশিয়ার টাকা-পয়সা জমা নিচ্ছিলেন, অন্যজন রক্তের রিপোর্ট টাইপ করছিলেন। তাঁদের দু'জনেরই এই লোকগুলোকে দেখে চমকে ওঠার কথা ছিল—কারণ ঐ পরিবেশে, ঐ সময়ে; ঐ লোকগুলো একেবারেই বেমানান। কিন্তু ওঁরা একবার চোখ তুলেই সঙ্গে-সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলেন।

বুঝলাম, ওরা ওঁদের চেনা লোক।

পার্টিশানের ভিতর থেকে একটি ভারী গলা ঐ লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বললে, এক-একজন করে ভিতরে এসো তোমরা।

সেই গলার স্বর শুনে মনে হল, এই লোকগুলোর কোনো নাম নেই পরিচয় নেই। ওরা এক ভিন্ন জগতের প্রাণী যেন। এমনকি গায়ে কোন নম্বর বা দাগও নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা এক-এক করে ভিতরে গেল এবং এক-এক করে ফিরে এল কনুইয়ের উল্টোদিকে হাতের শিরায় এক টুকরো করে তুলো গুঁজে।

বুঝলাম, রক্ত দিয়ে এল ওরা।

চারজন একসঙ্গে হতেই আবার যেমন দলবদ্ধ হয়ে এসেছিল তেমনি দলবদ্ধ হয়ে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল একটিও কথা না বলে। ওদের মধ্যে একজন লুঙ্গি পরে ছিল। কাঁধের কাছে অনেকখানি ছেঁড়া একটা নীল টুইলের শার্ট ছিল তার ঊর্ধ্বাঙ্গে। কিন্তু তার চোখ-জোড়ায় চোখ পড়লে চোখ ফেরানো সম্ভব ছিল না। লাল টক্‌টকে, বাঘের চোখের মতো চোখ।

তারা অদৃশ্য হতে ফিস্‌ফিস্ করে ওয়ার্ড বয়কে শুধোলাম, এরা কারা?

ওয়ার্ড বয় বলল, ডোনার।

মানে?

মানে রক্ত দেয়, দিয়ে পয়সা রোজগার করে।

পয়সার জন্যে রক্ত দেয়?

হ্যাঁ। আজ তো শনিবার, রেসের মাঠে যাবে হয়ত ওরা আজ।

আমি আবার শুধোলাম, ঐ লুঙ্গি পরা লোকটার নাম কি? নিয়মিত রক্ত দিয়েও ঐরকম গুণ্ডার মতো চেহারা রাখে কি করে ও? চোখের দিকে তাকালে মনে হয় গিলে খাবে।

ওয়ার্ড বয় হাসল। বলল, ও ওরকমই। ওরা গুরুদেব। ওর নাম সাকচু সিং। ও গুণ্ডা সর্দার।

কত পায় রক্ত দিয়ে?

যতবার দেয় ততবার ছাব্বিশ টাকা। ওরা। আর সাক্‌চু অনেক বেশী। কারণ ওর নেগেটিভ্।

নেগেটিভ্ মানে ? আমি বললাম।

ওয়ার্ড বয়টি বলল, মানে নেগেটিভ্ গ্রুপের রক্ত।

ও। আমি বললাম। তারপর শুধোলাম অবাক হয়ে, এতেই চলে যায় ? রোজ তো আর রক্ত দিতে পারে না।

রোজ দেয় না। মাঝে-মাঝে দেয়। বাদ বাকী সময় পকেট মারে, ছিন্‌তাই করে, মদ খায়, লোকের পেটে চাকু চালায়—কি করে না ?

তারপর বলল, পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিন্ একবার। সব ঠিক-ঠাক আছে তো ?

তাড়াতাড়ি বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখি। প্রেসক্রিপসন, টাকা সব বুক পকেটেই রেখেছিলাম।

নাঃ, ঠিক-ঠিকই আছে।

বসে থাকতে-থাকতে দু' ঘণ্টা হয়ে গেল। রক্ত দিলাম আমিও। পরীক্ষার জন্যে ; পয়সা নিয়ে নয় ; দিয়ে। তারপর বেরিয়ে এলাম।

ঐ লোকগুলোর কথা, সাক্‌চুর কথা তারপর ভুলেই গেছিলাম। কাজে-কর্মে, নিজের নানা ধান্ধায়।

আমার ছোটবেলার বন্ধু পরিতোষের স্ত্রী রমার হার্টের সাংঘাতিক অসুখ। রমার মত এমন সুন্দরী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। যেমন চেহারা, তেমনি নম্র-শান্ত-মিষ্টি স্বভাব। অথচ এমন মেয়েকে ভগবান এমন কঠিন অসুখ দিয়ে পাঠালেন কেন ভেবে পেতাম না। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছিল। ছেলেমেয়ে হয়নি। হবার সম্ভাবনাও ছিল না হার্টের ঐ অবস্থায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ওরা আড্ডা মারতে খুব ভাল-বাসত। প্রতি রবিবার সকালে আমার আড্ডাখানা ছিল ওদের বসার ঘর। প্রথম সকালে বসবার ঘরে কাপের পর কাপ চায়ের সঙ্গে আড্ডা জমত, তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরে। আমরা তিনজন পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে শেষ বিকেলে ঘুমিয়ে পড়তাম। ছাড়াছাড়ি হত সেই সন্ধ্যের চা খাওয়ার পর।

রমা বলত, আপনার একটা বিয়ে না দিলে আমাদের দাম্পত্য-জীবনে

প্রাইভেসী বলতে কিছুই থাকবে না দেখতে পাচ্ছি। স্বামীকে যে রবিবারেও একটু একলা পাবো, তারও কি উপায় আছে ?

বলতাম, আমার বন্ধুর মত কৃতী ছেলেকে বিয়ে করেই আপনার হার্ট অকেজো—আমাকে যে বিয়ে করবে সে তো হার্ট ফেল করে মারা যাবে তিনদিনের মধ্যে।

রমা হাসত উত্তরে। রমার হাসিটা ভারী বুদ্ধিদীপ্ত ও মিষ্টি।

পরিতোষ বর্তমানে আই-বি ডিপার্টমেন্টের অফিসার। ওর কাজের কোনো সময় অসময় ছিলো না; ছিলো না ছিরি-ছাঁদও। যখন তখন যার তার বাড়ি হানা দিতে হত। হানা দিয়ে অনেক সময় নিজেদের এবং কিছু সময় যাদের বাড়ি হানা দিত, তাদের অহেতুক বিব্রত করত।

রমা এই নিয়ে হাসাহাসি করত। পরিতোষ বলত, আই-পি-এসদের সকলকেই এই আনপ্লেজেন্ট কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় জীবনের কোনো-না কোনো সময়। উপরতলায় ওঠার সিঁড়ি কি সবসময়েই মোজাইক টাইলসের হয় ?

এক বৃহস্পতিবারে ফোন পেলাম পরিতোষের কাছ থেকে যে, রমার অবস্থা হঠাৎ বিপজ্জনকভাবে খারাপ হয়ে গেছে। নার্সিং হোম-এ রিমুভ করেছে কাল। ক্রিটিকাল কণ্ডিশান। শনিবার সকালে ওর হার্ট অপারেশন। এছাড়া নাকি কোনো উপায় ছিল না। কলকাতার খুব নামজাদা নার্সিংহোমেই ভর্তি করেছে রমাকে। বাঁচা-মরা একেবারে ভগবানের হাতে।

কলকাতাতেও এরকম অপারেশন বড় একটা হয় না। যখন হচ্ছে, তখন হৈ-হৈ পড়ে গেছে ডাক্তার মহলে এবং পুরো নার্সিং হোমে।

রমাকে দেখতে গেলাম সেদিনই অফিস ফেরতা। ওকে নার্সিং হোমের দুধ-শাদা বিছানার উঁচু বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও চাঁপাফুল খুব ভালবাসে। ওর জন্যে চাঁপাফুলের তোড়া নিয়ে গেছিলাম।

রমা ফুলগুলো নিয়ে বলল, রবি দা, এবার আপনাকে বিয়ে করতেই হবে। আপনার জন্যে নয়; বলেই পরিতোষের দিকে চেয়ে বলল, ওর

জন্যে। আপনার বৌ যেন আপনাদের দু'জনেরই হয়। আমার অনুরোধে পাণ্ডব হবেন আপনারা।

পরিতোষ চাপা ধমক দিল। ঘর ভর্তি রমা ও পরিতোষের আত্মীয়-স্বজনরা ছিলেন। তাঁরাও বিব্রত হলেন।

আমি বললাম, আমি বাইরে আছি কেমন? যাওয়ার আগে দেখা করে যাবো।

নার্সিং হোমের করিডরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয় থাকে—কিন্তু রমার মত নরম, সহানুভূতিশীল, সংবেদনশীল মেয়ের হৃদয় নিয়েই কাটা-ছেঁড়া কেন? 'ভগবান' লোকটার সেন্স বলে কিছু নেই।

শনিবার অফিস ছুটি নিলাম। সকাল সাতটার মধ্যে নার্সিং-হোমে এসে হাজির হলাম। পরিতোষ স্বাভাবিক কারণে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। আমিও হয়েছিলাম। কিন্তু ওকে বল দেওয়ার জন্যে হইনি যে, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম।

অপারেশন আরম্ভ হবে সকাল আটটায়। শেষ কখন হবে, ঠিক নেই। এ অপারেশনে নাকি দশ-বারো ঘণ্টা লাগে।

নার্সিং হোমে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গেই পরিতোষ বলল, একটা খুব গোলমাল হয়েছে, বুঝলি? ওর গলার স্বরে চিন্তা ঝরে পড়ল।

আমি বললাম, কি?

রমার ব্লাড নেগেটিভ্ গ্রুপের। যদিও এখানে ওদের যথেষ্ট স্টক আছে, তবুও—যদি কম পড়ে। আমার রক্ত পরীক্ষা করলাম, পজেটিভ্। রমার সঙ্গে মিলবে না।

আমি বললাম, আমারটা পরীক্ষা করে নিতে বল।

পরিতোষ মনে মনে খুশী হলেও একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, তুই রমার জন্যে রক্ত দিবি? যদি অনেক রক্ত লাগে?

পরিতোষ জানেনা, রমা পরিতোষের স্ত্রী বলে আমার যেমন আনন্দের শেষ নেই; দুঃখেরও না। আজ রমার জীবন সংশয় না হলে আমি কখনও বুঝতে পারতাম না হাসি-ঠাট্টা-আড্ডার মধ্যে দিয়ে কোন্ মুহূর্তে, কেমন করে রমাকে আমি ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। আজ সকালে

রমার জন্যে কিছুমাত্র করতে পারার সম্ভাবনাও আমাকে মনে মনে দারুণ খুশী করে তুলেছে।

আমি দেখতে ভালো না। সাধারণ চাকরি করি, চাল-চুলো নেই, কিন্তু আমি তো বদলে কিছু চাইনি রমার কাছ থেকে, শুধু ভালো-বাসতেই চেয়েছি। ভালোবাসার বোধটা যে এত গভীর, এত গাঢ়, এই মুহূর্তের আগে কখনও যেন বুঝতে পারিনি।

আমার রক্ত পরীক্ষা করলো যখন ওরা, তখন আমার কেবলি মনে হচ্ছিল। আমার গ্রুপ যেন নেগেটিভ হয়, যেন রমার জন্যে রমার কারণে আমি রক্তশূন্য হয়ে নীল হয়ে যেতে পারি।

একথা ভেবে নিজেই আশ্চর্য হলাম।

আজকের পৃথিবীতে উঁচু ঘোড়ায় চড়ে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে শিভাল্‌রী দেখাবার পথ নেই। পুরুষের পুরাকালীন সমস্ত সহজে দৃশ্যমান শিভাল্‌রী আজ এমনই ছোট-ছোট টুকরো-টুকরো সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণজন্মা অনুভূতিতে ছড়িয়ে গেছে। যখন সেই অনুভূতির শরিক হই নিজেরা তখনও যেন বুঝতে পারি না যে, এই অনুভূতিকেই ব্লো-আপ্‌ করলে আমি এই কেরানী রবি সেন, টগ্‌বগানো ঘোড়াছুটোনো প্রবল প্রতাপান্বিত বর্মাবৃত মহাবল যোদ্ধাতে রূপান্তরিত হবো।

পুরাকালটাই ভাল ছিল।

আমার রক্ত পজিটিভ। রমার কোনো উপকারেই আমি আসব না।

অপারেশন আরম্ভ হলো। রমার হৃদয়, আমাদের সকলের হৃদয়, সার্জেনের হৃদয়, সকলের হৃদয় ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। চলতেই লাগল। রক্ত চাই রক্ত।

বেলা বারোটা বাজল দেখতে-দেখতে। অপারেশন শেষ হবে কি না এবং হলেও কখন শেষ হবে তা এখনও জানার উপায় নেই। সার্জেন টাকা নেন নি—নেবেন না। এ অপারেশনটা তার পৌরুষের পরীক্ষা। এও এক রকমের শিভাল্‌রী।

ভিতরে কি হচ্ছে আমরা জানি না। শুধু জানি যে, রমা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী আঙিনায়—(ওর শোবার ঘরের আর বসার ঘরের মধ্যের

চওড়া বারান্দার মতই—) শান্তিনিকেতনী মোড়া পেতে বসে আছে। ওর নিয়তির নির্দেশের অপেক্ষায়।

ঘড়ি দেখলাম। আড়াইটে। অন্য শনিবারে হলে রমা বলত, এবার চলুন তো মশায়, খেয়ে নেবেন। আপনার জন্যে কি আমার বরের গ্যাসট্রিক্ আলসার হবে?

পরিতোষ মিনিটে-মিনিটে সিগারেট খাচ্ছে। এটাও কি একরকমের শিভাল্‌রী? না শিভাল্‌রী দেখাবার কিছুমাত্র না করতে পারার গ্লানির মুক্তির পথ?

ওর আঙুলগুলো হলুদ হয়ে গেছে পুড়ে। বললাম, কি করছিস কি?

ও বিড়বিড় করে বলল, কিছু তো করতে হয় একটা।

অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলছে। সাদা এ্যাপ্রন পরা এ্যাসিস্ট্যাণ্ট একটা শব্দ ছুঁড়ে মারছেন আমাদের দিকে রক্ত।

বারেবার। আমরা দৌড়ে যাচ্ছি।

এক এক বোতল করে কিনে আনছি।

নার্সিং হোমে আট বোতল নেগেটিভ রক্ত ছিল সবশুদ্ধু।

ওরা বললেন, আরও রক্তর দরকার হলে কিন্তু এখন থেকেই বন্দোবস্ত করুন। পুরো কোলকাতা ঢুঁড়েও চট্ করে নেগেটিভ্ পাওয়া মুশকিল।

পরিতোষ ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তুলেছে। বুক পকেট ভারী টাকায়, বেদনায়; চিন্তায়। আমার দু' হাতের পেশী ও ঘাড়ের পেশী ফুলে উঠেছে—উত্তেজনায়—রক্ত চাই—নেগেটিভ।

এখন আমি মানুষ খুন করতেও পারি। রমাকে বাঁচানোর জন্যে রক্ত চাই। পরিতোষ বলল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কে যাবি? গাড়িটা রেখে যা। কখন কি হঠাৎ দরকার হয়।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, সাকচু সিং।

পরিতোষ অবাক ও বিরক্ত গলায় বলল, সে-কে?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, দাঁড়া।

বলেই, দৌড়লাম।

পরিতোষ বলল, টাকা নিয়ে যা।

আমি বললাম, টাকা আছে।

আমিও কাল টাকা তুলেছিলাম।

দৌড়তে-দৌড়তে মনে-মনে বললাম, তুই না-হয় বড়লোক—আমি না-হয় গরীবই —কিন্তু রমা কি আমার কেউই নয়। তোর বৌ বলেই কি ও তোরই একার—সমস্তটা রমাই কি তোর ? আমার কি ও একটুও নয় ? আমাকেও কিছু করতে দে পরিতোষ—প্লিজ পরিতোষ। এটা আমার আনন্দ। তোর বা রমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, পাই তাতেই আমি সুখী। এটা পাওয়ার ব্যাপার নয় ; দেওয়ার ব্যাপার—আমাকে ভুল বুঝিস না পরিতোষ। রমার জন্যে কিছুমাত্র করতে পারলে বড় ভাল লাগবে আমার।

নিজেই বললাম, নিজেই শুনলাম। পরিতোষ জানতেও পেল না। ভাগ্যিস পেলো না। পেলে লজ্জিত হতাম।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, কাঁহা ?

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, সাক্‌চু সিং ?

কেয়া ?

ট্যাক্সিওয়ালা ধমকাল আমাকে।

আমি বললাম, পার্ক স্ট্রীট।

সেদিনও ক্লিনিকে ক্যাশিয়ার বাবু, টাইপিস্ট বাবু কাজ করছিলেন। আমি ঝড়ের মত দরজা ঠেলে ঢুকে বললাম, ওদের ঠিকানা জানেন ?

ক্যাশিয়ারবাবু পেন্সিল হাতে শামুকের মত ধীরে-ধীরে একটা বিলের টোটাল দেখছিলেন।

আমি ধমকে বললাম, কম্প্যুটার কেনেন না কেন আপনারা ?

ক্যাশিয়ারবাবু চমকে চোখ তুলে তাকাতেই বললাম, ওদের ঠিকানা ?

কাদের ? উনি বিরক্ত ও রাগী গলায় বললেন।

বললাম, সাক্‌চু সিংয়ের। ভীষণ দরকার।

আমার বে-এক্তিয়ারের ধমকে উনি চটে গেছিলেন। বোধহয় দিতেন না।

টাইপিস্টবাবু আমার চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলেন।

ঠিকানাটা পেলাম। বেগ্‌বাগান।

ট্যাক্সি, বেগবাগান।

সাক্‌চু সিং বস্তীর উঠোনের মধ্যে খাটিয়াতে হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে বসে একটা নেড়ি কুকুরকে কোলে নিয়ে আঠালি বাছছিল।

দড়াম্‌ করে দরজা পড়তেই বলল, কওন বে ?

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, ভাই, কিসীকা জান বাঁচানা হ্যায়।

সাক্‌চু সিং অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকল।

তারপর হাসল। বললো, তুম গলদ গল্লীমে আয়া ইয়ার। হিয়াঁ জান্‌ লেনেকা মাম্‌লা লেকে আয়া ক'রো, জান্‌ বাঁচানেকা নহী।

আমি বললাম, আপকা খুন নেগেটিভ্‌। এক জওয়ান খাবসুরৎ আওরৎ কা জান্‌ বাঁচানা হ্যায়। বড়ী ভারী অপারেশান চল্‌ রহ হ্যায়।

সাক্‌চু সিং একটা বড় আঠালি কুকুরটার ঘাড় থেকে ক্যাজুয়ালি তুলে খাটিয়ার পায়ায় টিপে মারল।

ঘন কালো রক্ত বেরোলো আঠালিটার শরীর থেকে। ওর আঙুলেও রক্ত লাগল।

সাক্‌চু সিং আঙুলটা আমার দিকে তুলে বলল, খুন্‌ সিরীফ্‌ খুনই হোতি হ্যায়। উস্‌মে খাবসুরতীকা সওয়াল কয়। সব হি খুন লাল হোতি হ্যায়—মরদ কি, আওরৎ কি ; কুত্তে কি,···।

আমি বললাম, মেহেরবানী করকে চালিয়ে। ট্যাক্সি খাড়া হ্যায়।

সাক্‌চু সিং আমার অহেতুক আত্মবিশ্বাস ও হয়ত ধৃষ্টতাও দেখে আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থাকল।

তারপর বলল, সাচ্‌মুচ জানকা সওয়াল ?

আমি বললাম—সাচ্‌মুচ।

সাক্‌চু মুখ নীচু করে কি ভাবল একটু, তারপর বলল, তব্‌ চলিয়ে।

আমি বললাম, কিত্‌না রূপেয়া ?

সাকৃচু সিং একরাশ কালো আবীরের মত আমার মুখময় ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ম্যায় আদমী হুঁ। জানোয়ার নেহি।

নার্সিং হোমে সাকৃচু সিংকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসতে-আসতে ভাবছিলাম, দিনের মধ্যে কত রক্ত চোখের সামনে নষ্ট হয়, মাছের রক্ত, খাসীর রক্ত, ডাষ্টবীনে ফেলে দেওয়া ন্যাপকিনে লেগে থাকা রক্ত—পৃথিবীতে এত রক্তারক্তি, কিন্তু রমাকে বাঁচাবার জন্যে রক্ত পাওয়ার এত অসুবিধে?

ভাবলাম রমার মত যারা অসামান্য তাদের বোধহয় অনেকমোন্ নেগেটিভ রক্ত দিয়ে পাঠান ভগবান।

নার্সিং হোমে পৌঁছেই প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে বললাম, ডোনার এনেছি।

ওঁরা মুখ চুন করে বসেছিলেন। সব রক্ত শেষ হয়ে গেছে। পরিতোষ পাগলের মতো ছুটে গেছে রক্তের খোঁজে।

প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাকৃচু সিংকে দেখে ওর সামনেই বললেন, জেনারাল ডিজীস-টিজীস্ নেই তো?

সাকৃচু সিং বলল, নেহী-নেহী, মেরী খুন সাচ্চা হ্যায়। ম্যায় সাচ্চা হুঁ।

রক্ত পরীক্ষা হল। নেগেটিভ। দোষ নেই। কিন্তু তারপরই উনি বললেন, এখনও কত বোতল রক্ত লাগবে কে বলতে পারে? এ একা দেবে কি করে? মরে যাবে তো?

সাকৃচু সিং হাসল। বলল, মেরি মওত্?

তারপর একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মত বলল, ইত্না আসান্সে নেহি।

তারপরই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, লিজিয়ে খুন কিত্না চাহিয়ে।

সাকৃচু সিংয়ের রক্তে দেখতে দেখতে বোতলটা ভরে উঠতে লাগল। ঘন কাল্চে লাল রক্ত। গুণ্ডা বদমাসদের রক্তের রং কি আলাদা? ভাবছিলাম।

এমন সময় পরিতোষ দৌড়ে এসে ঢুকল। দু বগলে দু বোতল রক্ত নিয়ে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, আর পাওয়া গেল না ; যাবে না।

পরক্ষণেই, সাকৃচু সিংকে দেখে আমার দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে বলল, একি, এর রক্ত রমার শরীরে যাবে ?

এমনভাবে বলল কথাটা, যেন সাকৃচু সিং রমার শ্লীলতাহানি করেছে।

সাকৃচু সিং শুয়ে-শুয়েই রক্ত দিতে দিতেই বলল, খুন সব বরাবর হোতা হ্যায় সাহাব। গরীবোঁ, আমীরোঁ, বদ্‌সুরৎ, খাবসুরৎ, সবকা বরাব্বর।

পরিতোষ শক্‌ড্‌ হলো কথাটা শুনে। বোতল দু'টো পৌঁছাতে গেল অপারেশন থিয়েটারে। সেখান থেকে খবর নিয়ে ফিরল আরও রক্ত হলে ভাল হয়।

এক বোতল রক্ত দিয়ে উঠে বসল সাকৃচু সিং। বলল, জরুরৎ হোগী তো ফির লিজিয়ে গা। ম্যায় তৈয়ার হুঁ। জান কবুল।

তারপর আমার দিকে ফিরেই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আপসে ঔর ঈ খাবসুরৎ মায়ীজ্‌সে মহব্বৎ হ্যায় ? কিঁউ জী ?

আমি তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক চেয়ে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লাম।

ও বলল, বে-ফিক্কর রহিয়ে,. ম্যায় ভাগেগা নেহি। আজতক্‌ খুন তো কিত্‌না বরবাদী কিয়া ; মগর আজ মেরি খুন্‌কা বড়ী ইজ্জত মিলা।

এমন সময় পরিতোষের এক বন্ধু ক্লিনিকে ঢুকে সাকৃচু সিংয়ের দিকে তাকিয়েই পরিতোষকে ইসারায় ডাকল বাইরে। আমার সন্দেহ হতে আমিও বাইরে এলাম।

পরিতোষের বন্ধুও পুলিশ অফিসার। স্থানীয় থানার লোক। আমাকে বললেন, একে পেলেন কোথায় ? গত তিন মাস গরু খোঁজা খুঁজে বেড়াচ্ছি। একে আমি অ্যারেস্ট করবো।

পরিতোষ বলল, ডোণ্ট বি সিলী। রমার জন্যে আরও কত রক্ত লাগবে কে জানে ? রমার কারণে যতক্ষণ ওকে দরকার, ততক্ষণ ওর

রক্ত চুষে নেওয়া যাক্। রমা বেঁচে উঠলে প্রমোশনের খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে ভুলিস না।

আমি ভিতরে গিয়ে সাক্‌চু সিংয়ের পাশে বসলাম। বসলাম, কিন্তু কি করব, আমার কি করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না।

সাক্‌চুকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

বললাম, কেয়া? থক্ গ্যয়া?

নহি—ঠিক্কে হ্যায়। বলল ও।

পরিতোষের বন্ধুর মুখটা দরজার কাঁচে একবার ফুটে সরেই গেল।

আমি জানি, ও বাইরে থাকবে। ওর প্রমোশন আটকে আছে এই কাঁচে।

আমার সেই মুহূর্তে মনে হলো, হঠাৎই মনে হলো; যেন এই রুক্ষ পুরুষ অশিক্ষিত সাক্‌চু সিংকে আমি নরম মিষ্টি সুশ্রী শিক্ষিতা রমার চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসি। চিরদিনই যেন বেশী ভালবেসে এসেছি।

ক্লিনিকের দরজা, দেওয়াল, সব যেন মিলিয়ে গেল। আমার মনে হলো আমি যেন সেই পুরাকালেই ফিরে গেছি, যে-যুগে মঙ্গলগ্রহের মাটি খুঁড়তো না মানুষ, হার্ট-ট্রান্সপ্ল্যানশান্ করতে জানতো না; সেই যুগে আমি আর সাক্‌চু সিং দু'টো পাশাপাশি সাদা ঘোড়ায় খোলা তলোয়ার হাতে ধুলো উড়িয়ে জোরে ছুটে গিয়ে পরিতোষকে তরোয়ালের এক কোপে কেটে ফেলে, রমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে টগবগিয়ে বুক ফুলিয়ে ফিরে আসছি। ফিরে আসছি তো আসছিই!

পরিতোষের বড় শালা দরজা খুলে এসে আমাকে উত্তেজিত হয়ে বললেন, অপারেশান সাকসেসফুল। খুব সম্ভব রমা বেঁচে যাবে এ-যাত্রা।

বলেই সাক্‌চু সিংয়ের রক্তর বোতলটা উনি নিয়ে গেলেন রমার জন্যে।

আমি জানতাম যে, রমা বেঁচে যাবে। আগে থেকেই জানতাম। ভাবলাম আমি।

ভেবে, একটা শুঁয়োপোকার মত নিজের উপরই নিজে ঘৃণায় বেঁকে গিয়ে সাক্‌চু সিংয়ের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। বড় ভালোবাসার সঙ্গে, গভীর কৃতজ্ঞতার আঙুলে।

সাক্‌চু সিং যখন সিগারেটটা ধরালো—যখন আগুনটা এক-এক লাফে নীচে নামতে লাগল, তখন আমার মনে হলো যে, সিগারেটটার সঙ্গে আমি এবং আমার হৃদয়ের সব কিছু কোনো কটুগন্ধ তামাকের মতো অতি দ্রুত পুড়ে যাচ্ছি।

ভাবছিলাম, সাক্‌চু সিং ভুল। একেবারেই ভুল। রক্তে-রক্তে তফাৎ অনেক।

খেড়াতড়ি

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

বৈশাখের প্রথম ভোর। শকরী নদী বয়ে চলেছে তরতর করে। হাঁটুর নীচে কাঁচের মত জল। তলায় কত বালি চিকচিক করছে। দু ধারে বেলেমাটির পাড় এবড়ো-খেবড়ো। ছলাৎ-ছলাৎ জল ভেঙে চলার আওয়াজ। হাত ধরাধরি করে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে এগিয়ে আসছে দু'জনে। একটি আঠারো বছরের ছেলে আর ষোলো বছরের মেয়ে। ওরা গিয়েছিল ওপারে, আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে। দু জনেরই চোখে মুখে হাসির ঝিলিক উপচে পড়ছে।

ডাঙায় এসে উঠল ওরা। লাজুক হাসি ওড়নায় ঢেকে দিলে মেয়েটি। খানিক দূরে ওর শ্বশুরবাড়ি।

দশবছরের ছেলে আর আট বছরের মেয়ে। এই বয়সেই বিয়ে হয়েছিল ওদের। বিয়ের রাতে, মেয়ের মা, ছেলের দাড়ি ধরে বলেছিল তখন, মেরে লাল কানহাইয়া। মেরি বেটী রংগিলাকো দেখ-ভাল করনা! ও তুমহারী···।

দশবছরের কানহাইয়া শাশুড়ী কথার অর্থ বুঝেছিল কি না জানা যায় নি। শাশুড়ীর মুখের দিকে চোখ তুলে চায় নি পর্যন্ত।

বিয়ের আটবছর পর, প্রথম রংগিলাকে নিতে এল কানহাইয়া। গওনা হল—বিয়ের মতই ধুমধাম। রংগিলার মা-বাপ চোখের জলে মেয়ে-জামাইকে বিদেয় দিলে। দু'হাত জোড় করে, সূর্যের দিকে চেয়ে আকুতি-মিনতি জানালে—এদের মিলনে যেন কখনো ভাঙন না ধরে।

রংগিলা তার মায়ের প্রথমপক্ষের স্বামীর মেয়ে। এ বাপ তার সৎবাপ। বিধবা হবার পর ওর মায়ের এই সৎবাপের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে —'সগাই'! রংগিলাই এক মাত্র মেয়ে। আর ছেলে-মেয়ে হয় নি। সৎবাপেরও আগেকার কোন ছেলেপুলের বালাই নেই, তাই তার টানটা রংগিলার ওপর অকৃত্রিম।

কানহাইয়ার বাপ-দাদার কাজে আর মন বসে না, রংগিলা ঘরে আসবার পর থেকে রংগিলার নিটোল দেহের গড়ন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখে বারবার। চোখের পিপাসা মেটে না। কোন কথা নেই, তবু কী যে কথা কয় দেখা হলেই, সেও জানে না। বড়দের দেখতে পেলে, কানহাইয়ার দিকে আড় চোখে চায় রংগিলা। মুচকি হাসে। মুখে ওড়না ঢাকে। পায়ে রূপোর মল নাচিয়ে ঠমকে ঠমকে চলে যায়।

কে আসছে না আসছে পেছনে, সেদিকে খেয়াল থাকে না কানহাইয়ার। তার নিমেষ-নিহত চোখ চেয়ে দেখে শুধু রংগিলার চলন-ভঙ্গি। বাপ কানহাইয়াকে বকে, যন্ত্রগুলোতে মরচে ধরছে, সেদিকে খেয়াল নেই একেবারে, কেবল জরুর পেছনে-পেছনে। চামড়া জমা হচ্ছে দিন দিন, সে সব 'খুবপি' দিয়ে কেটে, সাইজ করে 'কাটারনী' দিয়ে সেলাই করতে কতবার বলেছে। ওকে এত করে হাতে ধরে জুতো তৈরী শেখানো বিফল হল শেষে। ছিঃ! ছিঃ! শরমে মাথা কাটা যায়।

কে কার কথা শোনে। কানের দরজায় তালাবন্ধ কানহাইয়ার। কানহাইয়ার মা রাগে গরগর করতে থাকে। রংগিলাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সকলের সামনেই বলে চলে, কানহাইয়াকে একটু বোঝালেই তো কাজ হয়। তা হবে কেন? নির্লজ্জ বেহায়া বৌ তাতো বলবে না!

লজ্জায় ঘেন্নায় রংগিলা ওড়নাটায় আরো মুখ ঢেকে দেয়। ঘরে চলে যায় দৌড়ে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি। শকরীঘাটে হাওয়া বইছে এলোমেলো। এধারের জল ওধারে, ওধারের জল এধারে। মরানদী জলে টইটুম্বর, উপচে পড়-পড়। হঠাৎ পাড়ের বড় এক চাপ মাটি ধসে গেল, ভাগ্যিস

হাত দশেক দূরে কলসী কাঁধে দাঁড়িয়েছিল রংগিলা, নাহ'লে ঝপাং করেই জলেই পড়ে যেতে হয়তো। একটু হাবুডুবু খেয়ে অন্য পাড়ে উঠত ঠিক। ও যে—গাঁয়ের পুকুরে সাঁতার কাটা মেয়ে। তাই অত লক্ষ্য নেই পাড়ের ভাঙনে। জলের উথাল-পাতাল ঢেউয়ের ভয় নেই কোন।

পেছন থেকে কানহাইয়ার ধরে ফেলায়, বিরক্ত হয়ে ওঠে রংগিলা। আঃ! ছাড় হাত দু'টো! আমি পড়ে যাব না। ভীতু বেহায়া কোথাকার! খবরদার, আমার কাছে আসবে নে বলে দিচ্ছি! রংগিলার জমা ক্ষোপ ফেটে পড়ে—তোর বাপ-মাহতারীর গঞ্জনা আমি শুনতে পারব না!

কানহাইয়া হাসতে-হাসতে বলে, 'খেড়াতড়ি' কর দে।

রংগিলা চমকে ওঠে। একি! খেড়াতড়ি! ছেড়ে দিতে হবে? না-না। এ যে তার অভিমান। সত্যি কিছু নয়। সে পারবে না কানহাইয়াকে ছেড়ে দিতে। শকরীর জলে, ভাঙা এবড়ো-খেবড়ো গর্তগুলো ভরে ওঠে। রংগিলার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে থাকে। কানহাইয়া রগড় করে একথা বলেছিল। এমন হবে জানলে কি আর 'খেড়াতড়ি' কথা মুখ দিয়ে বার করত! কানহাইয়া অপ্রস্তুত।

রংগিলা! তামাশা করে বলেছি রে! সত্যি বলছি রে! সত্যি বলছি। কাঁদিস নে! শোন! একবার চেয়ে দেখ! ছ'মাসের জন্যে যাচ্ছি কলকাতায়। বাবা মামার দোকানে কাজ করতে পাঠাচ্ছে। রংগিলার চোখে অন্ধকার। আকাশে কালো মেঘ। দুরন্ত হাওয়ায় ওড়না উড়ে চলে যায় এপার থেকে ওপারে। ধরতে পারে না রংগিলা-কানহাইয়া দু'জনে ছুটেও। মেলা দেখতে গিয়ে কানহাইয়ার কাছে কত আব্দার করে কিনিয়েছিল রংগিলা-রাজপুতানীর ওড়না ঢাকা মুখে দেখে। কত সাধের ওড়না তার!

ডেরায় ফিরে আসে অবসাধ-ভরা মন নিয়ে রংগিলা। কানহাইয়া চলে যাবে? সে তো চায় নি এ ছাড়াছাড়ি! তবে? এ কি হল! গয়াজেলার গোমিনপুর গ্রামের, মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের খুবরি ছেড়ে, কলকাতায় ইঁটগাঁথা ঘরে মামার জুতো তৈরী-পালিশের দোকানে

এসে উঠল কানহাইয়া। মন বসল না কাজে কিছুদিন। রংগিলার ছলছল জলভরা চোখ কেবল ভাসত চারধারে। এখন সব ঠিক। ও সব দুঃখ-কষ্ট নেই আর। পাঁচটা বন্ধু হয়েছে। তাদের নিয়েই মাঝে-সাঝে হৈ-হল্লা করে একরকম চলছে বেশ। কতবার ভেবেছে, এবারে নিশ্চয় দেশে যাবে। রংগিলার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু হয় নি। কাজের ফুরসত নেই মোটে।

দশমাস কেটে গেল। দেশ থেকে চিঠি এল। ছেলে হয়েছে কানহাইয়ার। কানহাইয়া তো বন্ধুদের সবাই খাইয়ে, সেদিন খুব ফুর্তি করলে। কিন্তু তার লড়কাকে দেখা আর দেশে যাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াল শেষে। কী করে বেচারা! এক তো কাজের হিড়িক লেগেই আছে, তার ওপর আবার মামার অসুখ। আর কেউ দেখবার নেই। তাকে একলাই সামলাতে হয়। এই ভাবে মাসের পর মাস, একে-একে ষোলটি মাস চলে গেল। আবার চিঠি এল। চিঠি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক কানহাইয়া। উত্তেজনায় মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

সামনের একটা ছুটন্ত গাড়ির চাকাদু'টো যেন ওর চোখের মধ্যে ঘুরতে লাগল। দোকানের সামনে দিয়ে, বিকট ঘর্ঘর শব্দ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা! খানিকটা ধূলো নাকে মুখে ঢুকে গেল কানহাইয়ার। হাঁপিয়ে ওঠে দম দিতে গিয়ে। কাশতে কাশতে চোখে জল এসে পড়ে। একে ক'দিন সর্দি-সর্দি ভাব। কানহাইয়া অস্থির হয়ে ওঠে। না এখুনি যেতে হবে। এখনো তো বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না। রংগিলা সেরকম মোটেই নয়। সে-অন্ত প্রাণ। মগনলাল কখনো একাজ করবে না। সে যে প্রাণের বন্ধু। এ সব বাজে। সব বাজে।

পর-পর দু'টো শ্রাবণ চলে গেছে, বর্ষার এত বাড়াবাড়ি হয় নি। এবারের শ্রাবণের শেষের দিকে আকাশ ছেঁদা হয়ে গেছে একদম। দিন-রাত ঝরছে। সঙ্গে সাঁ সাঁ হাওয়া, অসময়ে শীত নামিয়ে দিয়েছে। শকরীর উঁচু-নীচু ঢেউ। এমনভাবে চেয়ে দেখছে রংগিলা। তার মন তোলপাড় করছে। কী করবে সে? কানহাইয়া, ছেলে মুমান আর মগনলাল—তিনটি মুখ চোখের সামনে এক-এক করে আসছে-যাচ্ছে।

মগনলাল বোঝায় রংগিলাকে। তাদের সমাজে তো খেড়াতড়িতে ভয় নেই, লজ্জা নেই। ছেলে রুমানকে অবিশ্যি দেবে না কানহাইয়া। তাতে কী ? ...ওদেরও ছেলে হবে তো। রংগিলা নিরুত্তর। বাঁধানো ঘাটটায় ফাটল ধরেছে। জলের স্রোত আটকে রাখতে পারছে না আর। ভাঙ-ভাঙ অবস্থা।

কানহাইয়াকে বলতে হল পঞ্চায়েতের সামনে—রংগিলার বে-আইনী প্রণয়ের কথা। রংগিলাকে সে খেড়াতড়ি করলে। রংগিলা কানহাইয়ার সব কথা স্বীকার করে নিয়ে, চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়িকে মেনে নিলে। দেড় বছরের রুমানকে কানহাইয়ার হাতে তুলে দিলে। দুহাতে জলভরা চোখ ঢাকলে। কানহাইয়ার প্রতিশোধ-স্পৃহার তৃপ্তিতে বুকের রক্ত টগবগ করে ফুটছে তখনো। রুমানকে বুকে চেপে ধরে, ঝোড়ো হাওয়ার মত, রংগিলার সামনে দিয়েই চলে গেল সে। রংগিলার বুকের পাঁজরাগুলো মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল যেন।

রংগিলাও চলার পথে পা বাড়াল। পা আর চলতে চায় না তার—পাথর ভারী। রুমানের আকুলি বিকুলি ডাক,—আধো-আধো কণ্ঠস্বরের 'মা-মা' কানের পর্দা ছিঁড়ে দিতে লাগল। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে যেন কে। অসহ্য গুমরেমরা যন্ত্রণা। রংগিলার চোখের সামনে সব ঝাপসা। মাথা ঘুরে উঠল। জমা বেদনার ধাক্কায় সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মগনলাল ধরে না ফেললে পড়েই যেত হয়তো। একটু সামলে নিলে নিজেকে রংগিলা। কিন্তু একি দেখছে সে! একি শুনছে! কানহাইয়া তো! রুমানের ডাক যে তাকে পাগল করে তুলছে তবু! বাতাসে ভর করে, দূর থেকে এখনো ভেসে আসছে সেই মা-ছাড়া শিশুর অসহায় কণ্ঠস্বর। রংগিলা আর ভাবতে পারে না। কান দু'টো চেপে ধরে বসে পড়ে।

একি করলে কানহাইয়া! সত্যিই রুমানকে নিয়ে চলে গেল! কানহাইয়া না বলেছিল একসময়, শকরী ঘাটে দাঁড়িয়ে—'খেড়াতড়ি' তামাসা করে বলছি রে। সামনে চেয়ে দেখে রংগিলা, মগনলালের জায়গায়, কানহাইয়া রুমানকে কোলে করে দাঁড়িয়ে। এও কী সম্ভব!

একি অবিশ্বাসভরা ব্যাপার। ভাল করে চোখদু'টো রগড়ে নিলে রংগিলা। না, এ তার দৃষ্টিভ্রম! কোথায় যাবে সে, কার কাছে? যত মগনলাল সামনে এগিয়ে আসে, তত রংগিলা দেখতে থাকে, রুমান আর কানহাইয়াকে আড়াল করে দিচ্ছে মগনলালের বিরাট ছায়া।

পাগলের মত ক্ষেপে ওঠে রংগিলা। মগনলালকে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে দেয়—হট্ যাও মেরি নজরকে সামনেসে!

মগনলাল মাথায় বাজ পড়ল—রংগিলা পাগল হল নাকি! রংগিলা কি বলছে? তাকে সরে যেতে! চোখের বাইরে যেতে! রংগিলার জ্বালা জুড়োবার জায়গা কোথায়, ওষুধ কী? দৌড়ে চলে যায় রংগিলা তার মায়ের কাছে। মাকে জড়িয়ে ধরে, বুকে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অবিশ্রান্তবর্ষা আরো জোরে নামল। শকরীঘাট ভেঙে গেল দারুণ স্রোতের আঘাতে।

ডেরায় ফিরে এল কানহাইয়া। রংগিলার ওপর আক্রোশের আগুন তার বুকে জ্বলছে, মাথায় জ্বলছে। এ আগুন সহজে নেভবার নয়। কোনদিনও নিভবে না বোধ হয়। ভাবীকে জানিয়ে দিলে, সে সগাই করবে, সগাই করে রুমানকে তার নতুন বৌয়ের হাতে তুলে দেবে, তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করতে। সগাইয়ের আগের রাত। ঘুমোতে পারছে না কানহাইয়া। চারপায়ায় ছটফট করছে কেবল।

রংগিলা কাঁদছে না! কানখাড়া করে শুনতে থাকে। না, রুমান। উঃ, কী করবে এখন? কানহাইয়ার মাথার চিন্তার সুতোর খেই হারিয়ে যায়। ওলট-পালট হতে থাকে সব। রংগিলা সগাই করলে না কেন? কানহাইয়া তো শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষার সমস্ত আক্রোশ বুকে নিয়ে দেশে পড়ে আছে এতদিন। রংগিলা সগাই করে নি এখনও। কেন করে নি? সমস্ত রাত ধরে এই 'কেন'র উত্তর খুঁজছে কানহাইয়া। কুঠরির ভেতর আর থাকতে পারলে না, পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এল। এধার ওধার দেখে নিলে—কেউ দেখছে কি না। নিশুতি রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে চলতে লাগল।···স্টেশন, ট্রেন, পথ···কলকাতা।

ভাদ্রের শেষ গুমোট। কলকাতায় এসে অবধি কানহাইয়ার মন

আর বসছে না কিছুতেই। কেমন একটা অস্বস্তি-অস্বস্তি ভাব। সময়ে সময়ে বুকটা আনচান করে ওঠে। একটা বোবা বেদনা গুমরোতে থাকে। দম আটকে আসে। সামনের গেটওলা বাড়ির দারোয়ান এসে, মেমসাহেব, বাবুসাহেব আর বাচ্চাদের জুতোগুলো বুরুশ করতে দিয়ে গেল। বুরুশ করতে-করতে কানহাইয়ার মন ঘুরে বেড়ায় জুতোর মালিকদের আশে-পাশে।

কেমন আছে এরা,—বাবু-বৌ-ছেলে-মেয়ে। আহা! কানহাইয়া যদি এই সমাজের, এই বাড়ির হতো, তা হলে কি রংগিলার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে পারত? কত সুখ এদের! রোজ বাবুসাহেব-মেমসাহেব আর বাচ্চারা একসঙ্গে কেমন করে বেড়াতে বেরোয়। কি সুন্দর মেমসাহেব আর বাবুসাহেবের হাসি-খুশী ভাব। এদের মিলন তাদের সমাজের মত অত হুট্ করে ভাঙে না। কল্পনার চোখে দেখতে থাকে কানহাইয়া। রংগিলা যেন তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। দারোয়ানের আচমকা ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায়। সে এসেছে জুতো নিতে।

পরের দিন। আশ্বিনের সকাল। বাতাসে শিউলিফুলের গন্ধভরা। আকাশে সোনাগলা মিষ্টি রোদ। গেটওলা বাড়ির সাহেব-মেমসাহেব-বাচ্চারা হৈ-হৈ করতে করতে, সকলেই একগাল হাসিমুখ নিয়ে, গাড়িতে উঠল। নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে কানহাইয়া। ওদের খুশিকে তৃষ্ণা-কাতর চোখ দিয়ে পান করতে থাকে! গাড়ির চলাপথে তার মন দৌড়ে যায় খানিক। বাবুসাহেবের দারোয়ান এসে ধাক্কা দিয়ে বলে, কি দেখছিস অত? এই, এই নে পয়সা!

দূরে চলে যাওয়া মনকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনে কানহাইয়া। হ্যাঁ ওদের পয়সা ছোঁয়াও ভাগ্যের কথা!

পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বুকপকেটে রাখতে গিয়ে, আবেগ চাপতে পারে না আর। মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়—দারোয়ানজী! তোমার বাবুসাহেব বেশ আনন্দেই আছেন। মেমসাহেব, লড়কা-বাচ্চা নিয়ে। আমাদের সমাজের মত ওদের খেড়াতড়ি নেই, তাই রক্ষে। দারোয়ান থমকে দাঁড়িয়ে শুনল কথাগুলো। স্মৃতি উপচে উঠতে লাগল দারোয়ানের

চোখের কোণায় কোণায়।···আগেকার মেমসাহেবের সঙ্গে বাবু সাহেবের যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কোর্ট-কাছারি করে, সে একটা দিন গেছে। ছেলেমেয়েদের বাবুসাহেবের কাছে থাকা সাব্যস্ত হল যখন, চোখ দু'টো লাল হয়ে জলে ভরে উঠেছিল মেমসাহেবের। আর আজ? আজ কে কার খবর রাখে! সে মেমসাহেবও বিয়ে করেছে আর বাবুসাহেবও।

দারোয়ান ফিসফিস করে বাবুসাহেবের কাহিনী শোনাতে বসল কানহাইয়াকে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে কানহাইয়া। একি শুনলে সে বিশ্বাস করবে, না করবে না? বাবুসাহেব মেমসাহেবদের সম্বন্ধে তার ভুল ভেঙে গেল। ওদের ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল মন। ভালবাসার বেসাতি বার-বার হয় নাকি? তাদের সমাজের হয় বলে, ভদ্রলোকের সমাজেও হয়? কিন্তু ভেতরটা ডুকরে উঠছে কানহাইয়ার—এ হওয়া ভাল নয়, একটুও ভাল নয়। ওটা সত্যিকারের ভালবাসা নয়; নকল ভালবাসা—মেকী। তা না হলে রংগিলাকে সে ভুলতে পারছে না কেন, রংগিলা তার সমস্ত মন জুড়ে আছে কেন। আর রংগিলাই বা সগাই করছে না কেন? হঠাৎ যেন ওই কেনর জবাব পেয়ে গেল কানহাইয়া।

মনে হল রংগিলার তো কোন দোষ নেই। দোষ তো তারই। বরং সে তো ক্ষমাই করেছে কানহাইয়াকে, নইলে কবেই সে মগনলালকে সগাই করতে পারত! হাতের কাছে বিস্তর কাজ—চারধারে ছড়ানো। তবু সব ফেলে রেখেই দেশে রওনা হল।· পূর্ণিমা-চাঁদের কপালী আলো ঝলমল করে উঠল আকাশ ভরে। ওই চাঁদ আকাশে থাকতে-থাকতেই পৌঁছতে হবে তাকে।

———

কৃত-কর্ম

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রথমে অতটা কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে নি। দামাল ছেলে দরজা খোলা পেয়ে কখন্ হয়ত সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে, হয়ত এতক্ষণে কারুর বাগানে কিংবা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ব'সে আছে—এই ভেবেই সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু একে-একে পাড়ার সব বাড়ীই খোঁজা হ'ল ; পাড়ার বাইরেও —ওধারে বাস্ স্ট্যাণ্ড, বড় রাস্তা, এধারে রেল লাইনের ধার, মায় বাজার পর্যন্ত খুঁজে আসা হ'ল—ছেলে কোথাও পাওয়া গেল না।

এইবার সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাড়ার ছেলেরাও এগিয়ে এল অনেকে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে? আবার একবার ক'রে সব জায়গা-গুলো ঘুরে আসা হ'ল। শোনা গেল—পাড়ার নার্সারী ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দলের সঙ্গে নাকি একদিন অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, শেষে ইস্কুলের ঝি দেখতে পেয়ে নাকি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সুদূর আশা, তবু একজন সে-ইস্কুলও ঘুরে এল। না, সেখানেও নেই হাব্লি।

একজন চলে গেলেন থানায় খবর দিতে। আর একজন গিয়ে কোথা থেকে দু'টো জেলে ধরে নিয়ে এলেন। পুকুরটা ঠিক বাড়ীর সামনে নয়—কাছেও নয়, তবু পাড়ার মধ্যে তো—একবার খোঁজ করা দরকার। কিন্তু ঘন্টা-দুই ধরে জল তোলপাড় করার ফলে জলটাই শুধু ঘোলা থকথকে হয়ে উঠল—ছেলে উঠল না।

সকাল গড়িয়ে মধ্যাহ্ন এল, মধ্যাহ্ন পৌঁছল অপরাহ্নে।

ছেলের খবর পাওয়া গেল না কোথাও।

নীরব অশ্রুপাত শুরু হয়েছিল অনেকক্ষণ থেকেই—এইবার কান্নার রোল উঠল। ছেলের মা মিনতি আছাড়-পিছাড় খেতে লাগল, মিনতির মা মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেললেন। মিনতির দাদা যোগেশবাবু চেঁচিয়ে কাঁদলেন না বটে, কিন্তু কাঁদলে ঢের ভাল হ'ত, তিনি কেমন যেন থম্‌থমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। ছোট ভাই রমেশই এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত ছিল, সে বেশী হৈ-চৈ করে নি, হা-হুতাশও করে নি—বরং সকলের সঙ্গে সমানে ঘুরে বেড়িয়েছে সকাল থেকে, তবে তারও চোখ দু'টো বিকেলের দিকে জবাফুলের মতই রক্তাভ হয়ে উঠল।

সকালের রান্না শুকিয়ে পচে উঠল। বিকেলে সে চেষ্টাও কেউ করলে না। এই শোকার্ত আব্‌হাওয়ায় ঠাকুর-চাকররাও কিছু মুখে তুলতে পারল না। এককথায় বাড়ীসুদ্ধই সেদিন উপবাসী রইল।

শুধু ওদের বাড়ীতেই যে শোকের ছায়া নামল তাই নয়, সমস্ত পাড়াটাই থম্‌থম্ করতে লাগল। শুধু দুঃখ নয়, সহানুভূতি নয়—কেমন একটা আতঙ্কের ছায়াও নেমে এল সকলের মুখে-চোখে। দিন-দুপুরে পাড়ার সকলকার সামনে থেকে অমন জলজ্যান্ত সুস্থ ছেলেটা উবে গেল একেবারে।

এমন ঘটনা অপরের বাড়ীতেই বা ঘটতে কতক্ষণ!

যে ক'জনের কথা বললাম, সে ক'জন ছাড়া এ বাড়ীতে আরও একজন ছিলেন। তাঁরই সবচেয়ে বেশী বিচলিত হবার কথা, কিন্তু তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অবিচলিত। তিনি হলেন রামকমলবাবু—হাব্‌লির বাবা।

তবে তাঁর আচরণে কেউ বিস্মিত হন নি। কারণ বিচলিত তিনি কখনও কোন কারণেই হন না—আর সেইটেই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ!

এ বাড়ীর জামাই, একমাত্র জামাই। অনেক খুঁজে-খুঁজে রূপবান বিদ্বান জামাই এনেছিলেন এঁরা—পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার ছেলে। বিয়ের সময় কী একটা সরকারী চাকরীও করতেন্। সবদিক দিয়েই ঈপ্সিত পাত্র।

বিয়ের পর বছরখানেক পর্যন্ত সে-চাকরি করেছিলেন রামকমলবাবু —তার পরই 'ভাল লাগে না' ব'লে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বসলেন। তখন অতটা অসহ্য হয় নি—কারণ তখনও বাড়ী একটা ছিল, কাকা-জ্যাঠার সঙ্গে মিলিত সংসার—জমিজমা ও তাঁদের কাজ-কারবারের আয়ে এক রকম ক'রে চলেই যেত। তাছাড়া তখনও সবাই ভাবছেন যে, আর একটা কাজ জুটিয়ে নেবে শিগ্‌গিরই।

কিন্তু তার কিছু পরেই এল স্বাধীনতা, পার্টিশ্যন। সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সবাই একসঙ্গে আসে নি—ফলে এক-একজন এক-একধারে ছড়িয়ে পড়ল। রামকমলের কাকা গেলেন দিল্লী, জ্যাঠা ভাগলপুর। অপর পোষ্যরা যে যেখানে পারল আশ্রয় খুঁজে নিল। সংসারটা আর নতুন ক'রে একজায়গায় দানা-বাঁধা সম্ভব ছিল না—তেমন গরজও ছিল না কারুর।

যোগেশবাবুরা যখন দেশ ছেড়ে আসেন তখন মিনতি ওঁদের কাছে ছিল—ওঁদের সঙ্গেই চলে এল কলকাতায়। সেই সূত্রে রামকমল কলকাতায় পৌছে শ্বশুরবাড়ীতেই উঠবেন—সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ ওঁর বাবা-মা ছিলেন না, কাকা-জ্যাঠাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এত নিবিড় নয় যে, দেশভূঁই ছেড়ে এসে নিজেদের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও বেকার ভাইপোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবেন। তাছাড়া তাঁদের নিজেদের সংসার তো ছোট নয়।

সেই যে শ্বশুরবাড়ীতে এসে উঠলেন রামকমল, আর কোথাও নড়লেন না।

অবশ্য তাতে খুব একটা অসুবিধা ছিল না। যোগেশবাবু দেশে থাকতে ব্যবসাই করতেন—পার্টিশ্যনের অল্পদিন পরেই চলে এসেছিলেন ব'লে সে ব্যবসার অনেকখানিই এখানে সরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

টাকাকড়ি গহনাপত্রও কিছু ছেড়ে আসতে হয় নি। শুধু বাড়ীটা আর জমিজমা আনতে পারেন নি, কিন্তু সে এমন কিছু নয়। এখানে এসে এই বাড়ীটি কিনেছেন, ব্যবসাও মন্দ চলছে না—সুতরাং আর্থিক অভাবে বিব্রত হবার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া ভায়েরা এখনও কেউ বিয়ে করে নি, একটা বোন আর তার স্বামীকে পুষতে তাঁদের নারাজ হবার কথা নয়। সর্বোপরি মিনতির মা এখনও বেঁচে এবং তিনিই এখনও পর্যন্ত সংসারের গৃহিণী।

তবুও—ইদানীং রামকমলকে নিয়েই অশান্তির শেষ ছিল না বাড়ীতে। সেটা তার অবস্থিতির জন্য নয়—নিষ্ক্রিয়তার জন্য। কিছুই করেন না তিনি, কিছু করতে চানও না। কিছু যে করেন না—সেজন্য কোন উদ্বেগ নেই তাঁর, নেই কোন সঙ্কোচ। চক্ষুলজ্জা বস্তুটি বিশেষ না থাকায় কোন অসুবিধাও হয় না। স্বচ্ছন্দে সম্বন্ধী বা শাশুড়ীর কাছ থেকে হাতখরচের টাকা চেয়ে নেন। সিগারেট লাগে তাঁর দৈনিক তিন প্যাকেট। চা ইত্যাদির খরচও কম নয়। জামা-জুতো সম্বন্ধে শৌখীনতা আছে যথেষ্ট। মানে, অবস্থাপন্ন ঘরের জামাই যে ভাবে থাকে, সেই ভাবেই তিনি থাকতে চান।

কাজের যে জোগাড় হয় না বা কাজ পাওয়া যায় না, তা নয়। যোগেশবাবু বিস্তর কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলোর কোনটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। যোগেশবাবুর নিজের কারবারে বেরোতে বলেছিলেন, তার উত্তরে এতখানি জিভ কেটে বলেছেন, 'ছিঃ! শালার কর্মচারী হয়ে থাকব! তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও যে ঢের ভাল।'

ছোটখাটো ব্যবসা করবার পরামর্শ দিয়েছেন যোগেশবাবু বা ওঁদের অপর আত্মীয়-স্বজন। উদাসীনভাবে রামকমল উত্তর দিয়েছেন—'টাকা কোথায়? ব্যবসা যে করব, মূলধন চাই না?'

সে টাকাও যখন যোগেশবাবু দিতে চেয়েছিল, তখন জবাব মিলেছে, 'একে ত ব'সে খাচ্ছি, তারপর আবার আপনার টাকা কিছু

ডোবাই আর কি !···ব্যবসা কি করলেই হ'ল, তার শিক্ষা চাই না, অভিজ্ঞতা চাই না ?'

অর্থাৎ বিবেচনা সব ব্যাপারে আছে—নেই শুধু শ্বশুরবাড়ী ব'সে থাকার ব্যাপারটাতেই। এইখানে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার।

ক্রমশ-ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে বৈকি !

সবচেয়ে অসহ্য হয় মিনতিরই। তার যেন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়—সীতার মত মাটির নিচে সেঁধোতে ইচ্ছা করে। রোজগার না করুক, যদি সংসারেরও কোন কাজে আসত। তাহ'লেও তবু একটু মুখ থাকত মিনতির। কুটি ভেঙ্গে দু'খানা করতেও চায় না। কোনদিন বাজার যেতে বললে বলে, 'হ্যাঁ—বাজার দিয়েই শুরু হয় বটে ; তারপর ? শেষ হবে বোধহয় সম্বন্ধীর জুতো-বুরুশে ? ঘর-জামাইএর আর কি পরিণাম বলো !···তা তবে এ লোক সে বান্দা নয়। সে'রকম যেদিন বুঝবে, একটু আগে থাকতে ব'লো—সোজা পথে গিয়ে দাঁড়াব। বলি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তো কেউ ঘোচায় নি।···আর এত লেখাপড়া শিখেছি, একটা পঁচিশ টাকার টিউশ্যনীও কি জুটবে না ? তাহ'লেই আমার একটা পেট চলে যাবে।'

'বেশ ত' দয়া ক'রে সেই টিউশ্যনীটাই করো না এখন।' হয়ত বলে মিনতি, 'তাহ'লেই ত অন্তত মুখ থাকে একটু। আর কিছু না হোক্— সিগারেটের জন্যে হাত পাতাটাও বন্ধ হয়।'

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে রামকমল জবাব দেন, 'তা হয় না মিনু, এখানে থেকে তা হয় না।···বড়লোক সম্বন্ধীর বাড়ীতে বাস ক'রে যদি কুড়ি-পঁচিশ টাকার টিউশ্যনী করতে যাই, লোকে বলবে কি ?'

'বড়লোকের বাড়ী থাকার দরকার কি ? চলো না, একটা কোথাও ঘরভাড়া ক'রে আমরা চলে যাই। মাটির ঘরেও থাকতে রাজী আছি আমি। একা সব কাজ করব, ঝি-চাকরও দরকার নেই। সকাল সন্ধ্যে দুটো টিউশ্যনী ক'রে তুমি পঞ্চাশটা টাকাও যদি নিয়ে আসতে পারো— তাতেই আমি চালিয়ে নেব।'

'হুঁ। দুনিয়াটা যদি অত সহজ হ'ত মিনতি দেবী, তাহ'লে আর

ভাবনা ছিল না। বড়লোকের মেয়ে, দশটা দাসীচাকরের মধ্যে মানুষ হয়েছ, কাজ কাকে বলে তাই জান না।···না, ওসব সাদা হাতী নিয়ে গিয়ে আমি সামান্য ঘরে তুলতে পারব না।···হোক্ হোক্···আর তুটো দিন যাক্ না। কোনমতে ক'টা দিন চোখ বুজে কাটাও না! ভগবান কি আমার এ্যায়সা দিনই রাখবেন চিরকাল? আমি কি আর সুদিন পাব না?'

'কিন্তু সে সুদিনটা কোন্ পথে আসবে আমাকে বোঝাতে পার? সে কি আপনিই পায়ে হেঁটে আসবে? কিছু না করলে কোনদিনই কিছু হবে না!'

'আরে বাবা, খোদা যব দেতা, ছপ্পর ফুঁড়কে দেতা! ওসব বড় বিচিত্র রহস্য।' ব'লে নিশ্চিন্তে সিগারেটে টান দিতেন।

এই একটা বিষয়ে অবশ্য খুব বিবেচনা ছিল, দামী সিগারেটটা অভ্যেস করেন নি, কম দামের সিগারেটই প্রিয় ওঁর।···

ক্রমশ অসহ্য হয় মিনতির মারও।

তাঁর এখানে অভাব নেই সত্যকথা—কিন্তু মেয়েকে চিরদিন ঘরে পোষবার জন্যেই কি তিনি এত টাকা খরচ ক'রে ইঞ্জীনিয়ার পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন? ওর কাকা আর জ্যাঠা দশটি হাজার টাকার ঘা দেয় নি তাঁর? সেই চড়া দামে এই অচল টাকা কিনেছেন তিনি?

যোগেশবাবু বিরক্ত হলেও তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে চলেন, রমেশ ছেলেমানুষ সে সোজাসুজি জামাইবাবুকে এড়িয়ে যায়। একটা লোকের অক্ষমতা ও অপদার্থতাও ক্ষমা করা যায়, সে যদি নিরীহ ভাবে থাকে। সবচেয়ে অপদার্থ লোক যদি জীবন, সংসার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দেবার চেষ্টা করে অহরহ—সবচেয়ে সেইটেই অসহ্য লাগে. রামকমলের সেই অভ্যেসও আছে। তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, এ বিষয়ে তিনি নিজে স্থির-নিশ্চয় ছিলেন।

ইতিমধ্যে পর পর তিনটি মেয়ে হয়ে মারা গেছে মিনতির। অনেক কাণ্ড ক'রে অনেক ডাক্তার দেখিয়ে এই চতুর্থ সন্তানটিকে বাঁচানো হয়েছে। সে সম্বন্ধেও এতটুকু সচেতনতা নেই রামকমলের। টাকা

তারা দেবেন—শুধু সঙ্গে ক'রে মিনতিকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতেও রামকমল নারাজ। কথা উঠলেই 'সময় নেই' 'শরীর খারাপ', 'ভাল লাগছে না' ব'লে কাটিয়ে দেন। সেটার জন্যেও রমেশকে না ধরলে চলে না।

সবচেয়ে অসহ্য লাগে 'সময় নেই' কথাটা শুনলে। এত নির্লজ্জও মানুষ হতে পারে।

আর এই কথাটা উপলক্ষ্য ক'রেই পরশু কুৎসিত রকমের একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

হাব্‌লিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। ক'দিন ধরেই শরীরটা খ্যাঁৎখ্যাৎ করছে ওর; হয়ত অন্যবাড়ী হ'লে এটুকু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, কিন্তু একে মিনতির সেই 'ঘরপোড়া গোরু'র অবস্থা, তায়—এ বাড়ীতে হাব্‌লিই একমাত্র শিশু ব'লে বোধহয়—সে মামা-দিদিমা সকলেরই নয়নের মণি। সুতরাং তার একটু অসুখ হলেই ওঁরা বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এবারও যোগেশবাবু ডাঃ চৌধুরীকে দেখাবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মিনতিই বারণ করেছে, 'রোজ রোজ সামান্য কারণে একগাদা টাকা খরচা করবার দরকার কি? গোবরাতে ছেলেদের অমন বড় হাসপাতাল হয়েছে, সেইখানে দেখিয়ে আনলেই ত হয়। এই ত পাড়ার কত লোক ছেলেমেয়ে দেখিয়ে আনছে সেখান থেকে। ডাঃ চৌধুরী নিজেও ত দেখেন সেখানে শুনেছি।'

কথাটা যোগেশবাবুরও মনে লেগেছিল? কিন্তু সেদিন তাঁর বিষম কাজের চাপ, তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, রমেশের কলেজ—অগত্যা বিপন্ন বোধ ক'রেই তিনি কখনও যা করেন নি তাই ক'রে বসেছিলেন—রামকমলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। নিজেই মুখ ফুটে বলেছিন, 'এইটুকু করো ভাই, হ্যাঙ্গামা কিছুই নেই—ট্যাক্সী ক'রে যাবে আসবে, শুধু সেখানে একটু অপেক্ষা করা।'

অম্লানবদনে উত্তর দিয়েছিলেন রামকমল, 'যেতে পারলে খুবই

আনন্দিত হতাম, আর আমারই ত যাওয়া উচিত্, কিন্তু আজ সে আমার মোটে সময় হবে না দাদা!'

হয়ত অন্য কোন কথা বলতে গিয়েই সময়ের কথাটা বেরিয়ে গেছে। কিম্বা হয়ত যোগেশবাবু নিজে এসে অনুরোধ করাতেই ঘাবড়ে গিয়ে বেফাঁস ব'লে ফেলেছেন রামকমলবাবু।

কিন্তু কারণ যা-ই হোক্, মুখের কথা আর হাতের পাশা প'ড়ে গেলে আর তার দায়িত্ব এড়ানো যায় না।

চিরসতর্ক যোগেশবাবুও ধৈর্য রাখতে পারেন নি সেদিন! ব'লে ফেলেছিলেন, এবং বলেছিলেন একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই, 'তোমার আবার সময়ের কি অভাব হ'ল রামকমল, তোমার কাজটা কি যে সময় নেই বলছ? কাজকর্ম কোথাও ধরেছ নাকি!'

কথাটা বলা ঠিক হয়নি তা রামকমল সম্ভবত বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝেছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি? তাই আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'এসব কথার অর্থ কি? আপনার বাড়ীতে আছি ব'লেই আপনাকে আমার সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?...আমার সময়ের হিসাব চান আপনি কোন্ সাহসে?'

যোগেশবাবু উত্তর দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু সামলাতে পারেন নি মিনতির মা। তিনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে বেরিয়ে এসেছিলেন, 'বলি, কৈফিয়ৎ যদি চায়ই, কী হয়েছে তাতে! ও বড় ভাইয়ের মত তোমার, ওর পয়সাতেই সপরিবার ব'সে খাচ্ছে—ওকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি?... আর সত্যি কথাই ত, জোয়ান পুরুষ, কাজ করো না কর্ম করো না, ব'সে খাও—নিজের ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবার কথা বললে বলো সময় নেই। একথা যে শুনবে সে-ই হাসবে যে!'

একটা কথা থেকে অজস্র কথার সৃষ্টি হতে দেরি হয় না। মিনতিও সেদিন খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিল—মনের সব ঝাল মিটিয়ে। যোগেশবাবুই যেন ফ্যাসাদে প'ড়ে গিয়েছিলেন। দু-পক্ষকেই থামাতে চেষ্টা করেন, কেউই কথা শোনে না।

মিনতির মা তাঁর ব্যাকুল মিনতির জবাবে বরং বলেছিলেন, 'তুই থাম্ যোগাই, ওকে আমার আর চিনতে বাকী নেই! তুই ভাবছিস রাগ ক'রে চলে যাবে ও?···তাহ'লে ত বাঁচি। বুঝি যে ঐটুকু আত্মসম্মান জ্ঞানও আছে অন্তত।···আর তাতে আমার মিনুর দুঃখ হতে পারে, কিন্তু নিত্য অপমানের হাত থেকে ত রেহাই পাবে!'

রামকমল তাঁর অভ্যস্ত উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'হবে হবে —রেহাই দেব এবার শিগ্‌গিরই।···বেশীদিন দুঃখ পেতে হবে না আপনাদের!'

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রামকমলবাবুর আত্মসম্মান জ্ঞানের আর কোন বর্হিপ্রকাশ দেখা যায় নি?

সেদিন অবশ্য বাড়ীতে খান নি। বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রায় তখনই। মিনতিকে অগত্যা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সামনের বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গেই হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। রামকমল সেই যে বেরিয়েছিলেন, ফিরেছিলেন একেবারে গভীর রাত্রে। খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল কিন্তু খান নি।

তার পরের দিন থেকে আবার সেই আগেকার নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন সহজ জীবনযাত্রা! বারকতক চা খাওয়া, সিগারেট খাওয়া, চাকরকে দিয়ে তেল মাখানো, দিনের বেলা ঘণ্টাতিনেক টানা ঘুম—কোনটাই বাদ যায় নি। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু বাড়ীর লোক কারুর সঙ্গেই বেশী কথা কইছিলেন না। যেটুকু কথা—ছেলের ও চাকরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মিনতির মা তিক্ত হাসি হেসে বললেন, 'দেখ্‌লি ত! তুই ত ভেবে মরছিলি!'

তারপর আজকের এই কাণ্ড।

সকলেই ছুটোছুটি করছে, হৈ-চৈ—খোঁজাখুঁজি; পাড়ার অনাত্মীয় লোকেদের পর্যন্ত উদ্বেগ-বিলাপের অবধি নেই; তার মধ্যে রামকমল শুধু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। তাঁর মনের সহজ প্রশান্তি যেন এতটুকুও নষ্ট হয়নি। সকালে বার-দুই চা খাওয়া হয়েই গিয়েছিল, তাই খুব একটা অসুবিধা হয় নি। আর যে পাওয়ার আশা নেই তা তিনি বুঝেছিলেন, সে চেষ্টাও

আর করেন নি। বাইরের বারান্দায় তাঁর অভ্যস্ত চেয়ারটিতে ব'সে অত্যন্ত আলস্যের ভঙ্গীতেই সিগারেট খাচ্ছিলেন। সিগারেট ফুরিয়ে যেতে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে না পেয়ে একবার শুধু উঠে গিয়ে একটা টিন এনেছিলেন, আর কাউকে ফরমাশ করবার চেষ্টা করেন নি।

তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য কেউ আশাও করে নি অবশ্য। এটুকু তাঁকে সবাই চিনে নিয়েছিল, এমন কি, পাড়ার লোকরাও। শুধু অবুঝ মায়ের প্রাণই স্থির থাকতে পারে নি—মিনতি ছুটে এসে বলেছিল, 'তুমি কী গো! এখনও চুপ ক'রে ব'সে আছ! তুমি মানুষ না পাথর! ছেলেটাকে একটু খোঁজও করতে পারছ না!'

মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরেই জবাব দিয়েছিলেন, 'এতগুলো লোক খুঁজছে, পাড়াসুদ্ধ সবাই—করণীয় যা এসব ক্ষেত্রে তার ত কোনটারই ত্রুটি হচ্ছে না। এর মধ্যে আমি আর বেশী কি করতে পারব বলো? অকারণ অস্থিরতা প্রকাশ ক'রে লাভ আছে কিছু?'

বৃথা জেনে মিনতি আর কিছু বলে নি, ললাটে করাঘাত ক'রে চলে গিয়েছিল।

সেদিন স্থির হয়ে থাকলেও পরেরদিন থাকতে পারলেন না রামকমল। ভোরবেলা চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন, ফিরলেন একেবারে বিকেলবেলায়।

তিনি কোথায় গিয়েছিলেন এবং কেন গিয়েছিলেন সে বিষয়ে কারুর কোন ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়—কেউ তা প্রকাশও করলেন না। কে-ই বা করবে, যোগেশবাবু কাল সন্ধ্যা থেকে সেই যে স্তম্ভিত অবস্থায় ব'সে আছেন—এখনও পর্যন্ত একটা কথাও কন্ নি। হাবলি ছিল তাঁর বুকের জিনিস—যতক্ষণ তিনি বাড়ী থাকতেন ততক্ষণই সে হয় তাঁর কোলে নয় কাঁধে থাকত! রাত্রে তিনি বাড়ী না আসা পর্যন্ত ঘুমোত না, ঐটুকু ছেলে এতই ন্যাওটো হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলে কোথায় আছে, কার কাছে আছে—আছে কিনা কোথাও, অবিরাম এই প্রশ্নই

তিনি করে যাচ্ছেন মনে মনে—নিজের মনকেই। মাঝে মাঝে নিজেরই মনে হচ্ছে, এমন ক'রে থাকলে পাগল হয়ে যাবেন তিনি—অথচ তাঁকে জোর ক'রে কোন কাজে লাগাবে তেমন লোক কই ?

মিনতি ত মূর্ছাতুরের মত প'ড়ে আছে। মিনতির মাও অথৈবচ। অবিরাম কান্নার ফলে তাঁর চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। এক রমেশ, সে বেচারা সারাদিন ধ'রে থানা, রেডিও, খবরের কাগজ ক'রে বেড়িয়েছে, এখন সেও ক্লান্ত, মৃতবৎ !

অবশ্য রামকমল কারুর সোৎসুক প্রশ্নের ধারও ধারলেন না। তিনি এসে একটুখানি ব'সে নিজেই কথাটা পাড়লেন, 'ওসর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কাজ নয় দাদা! আমি ভেবে দেখলাম, খুব পাকা ছেলেধরা ছাড়া এমন ভাবে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে নিয়ে যেতে পারে না!'

সকলেই চমকে উঠল যেন। রামকমলও ছেলের কথা ভাবছেন তাহ'লে !

ছেলেধরার কথাটা কাল থেকে আলোচিত হয়েছে বহুবারই—কিন্তু সে বিষয়ে রামকমল কি চিন্তা করেছেন জানবার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে উঠল এবার।

রামকমল ঈষৎ একটু হেসে বললেন, 'আপৎ-কালে শুধু ছুটোছুটি করলে বা শুধু হা-হুতাশ করলে কোন কাজ হয় না দাদা, সেটার প্রমাণ হাতে হাতে ত পেলেন। আপনারা মনে করেছিলেন আমি পাষাণ, আমার কোন দুশ্চিন্তাই হয় নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কাজ করে মাথায় —হাতে নয়। কাল সারাদিন ধ'রে ব'সে ব'সে কর্মপন্থা ঠিক করছিলাম, আজ কাজ ক'রে এলাম। কলকাতা আর আশেপাশে যত গুণ্ডার কলোনী আছে সব জায়গা ঘুরে এসেছি। ব'লে এসেছি, অক্ষত অবস্থায় ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারলে বা ছেলের খোঁজ পেলে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছি আমরা।'

'হাজার। হাজার। তুমি হাজার টাকা বললে না কেন রামকমল!'

'একেবারে অত টাকার কথা কি বলা ঠিক? তাহ'লে পয়সাওলা লোক ভেবে আরও বেশী টাকার জন্যে চাপ দিত।...এমনিতেই ত অত টাকা বলতেই সঙ্কোচ হচ্ছিল আমার—নিজের হাতে যখন নেই—এক-পয়সা দেব বলতেও কুণ্ঠা হয় বৈকী। নেহাৎ জানি যে আপনি ওকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করেন তাই—'

এ কি সেই রামকমল? অবিশ্বাসের চোখে তাকায় সবাই।

তবে বুঝি—মানুষকে বিপদে না পড়লে পুরোপুরি চেনা যায় না—এ-কথাটা ঠিকই।...

যোগেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে চাকরকে হাঁক দেন, 'ওরে জামাই-বাবুকে চা দে কেউ!' তারপর বলেন, 'তা খবরটা কখন পাওয়া যাবে?'

'যেতে হবে আবার এখনই।—আর ত কিছু নয়—এর মধ্যেই হাত-পা কেটে কিংবা চোখটোখ কানা ক'রে না দেয় এই চিন্তা। সেই-জন্যেই ত মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছি ব্যাটাদের। আসলে ওরা ভিখিরী করবার জন্যেই ধ'রে নিয়ে যায় ত—এমন ভাবে চেহারাটা বদলে দেয় যাতে একসঙ্গে দু'কাজ হয়, লোকের দেখলে দয়া হবে বেশী, বেশী পয়সা পাবে আর এদিকে যাদের ছেলে তারাও দেখলে চিনতে পারবে না।'

কথাটা শেষ ক'রে বেশ স্মিত প্রসন্নমুখে তাকান উনি এদের দিকে।

যোগেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেন, 'তুমি ভাই তাহলে এখনই এক-বার যাও, লক্ষ্মী ভাইটি! টাকাটা নিয়েই যাও বরং। চা খেয়েই বেরিয়ে যাও, একদিন একটু কষ্ট হবে, কী আর করবে বলো।...এই নাও, ছশো টাকাই রাখো বরং, ট্রামে-বাসে আর ঘুরো না, একখানা ট্যাক্সী নাও এইখান থেকে। কত আর উঠবে!'

একতাড়া নোট ভগ্নিপতির অনিচ্ছুক হাতে গুঁজে দেন যোগেশবাবু।

রামকমল বলতে যান, 'এখন কেন দাদা, বরং সন্ধান পেলে না হয়—। তাদেরও ত নিয়ে আসতে পারি।'

'পাগল নাকি! তারা কখনো বিশ্বাস ক'রে আসে! আর নগদ টাকা না দেখলে ওরা কোন কথাই বলবে না। তুমি নিয়েই যাও, খবর নিয়ে এখানে আসবে টাকা নিয়ে যাবে—ততক্ষণে ব্যাটাদের আবার মতলব যাবে হয়ত পালটে। তুমি অত সঙ্কোচ করছ কিসের জন্যে। টাকা কার জন্যে—সবই ত তার ভাই।'

রামকমল কোনমতে চা আর দুটো সন্দেশ খেয়ে তখনই আবার বেরিয়ে গেলেন। সারাদিন খাওয়া হয় নি ব'লে চাকরটাই বুদ্ধি ক'রে সন্দেশ দুটো এনেছিল চায়ের সঙ্গে। যোগেশবাবু তার বিবেচনায় খুশী হয়ে উঠলেন।...

তারপর শুরু হ'ল সোৎসুক, সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

সন্ধ্যা হ'ল ক্রমশ। এখনই ফেরবার কথা নয় অবশ্য, তবু যোগেশবাবু দূরের বড় রাস্তায় ট্যাক্সীর শব্দ পেলেই ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াতে লাগলেন। কিন্তু সে তো শুধু হতাশ হবার জন্যেই।

সন্ধ্যা থেকে রাত। রাত দশটা, বারোটা, তিনটে।

শেষরাত্রে শুধু শারীরিক ক্লান্তিতেই ঘুমিয়ে পড়লেন ওঁরা।

কিন্তু রাত্রিশেষেও ফিরলেন না রামকমল। সারাদিনেও না। পরের দিন, তার পরের দিন, আর কোনদিনই না।

ছেলের সঙ্গে সঙ্গে রামকমলও যেন উবে গেলেন একেবারে।

এমন হবে রামকমলও জানতেন না। এ আশঙ্কা একবারও করেন নি।

এ পরিণতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

সেদিনের অপমানে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তাঁর। দিগ্‌দাহকারী ক্রোধ এবং বিদ্বেষ।

স্বভাব-অলস অকর্মন্য লোক যখন আলস্য ত্যাগ ক'রে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করে, তখন স্বভাবতই তার মন ধরে পাপের পথ, অপরাধের পথ!

রামকমলও সেই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের কথা ভাবতে পারেন নি।

সারাদিন পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে শিয়ালদা স্টেশনের ধারে একটা বিকলাঙ্গ শিশু ভিখারীকে দেখেই কথাটা মনে জাগে ওঁর। তাকে পয়সা দিয়ে জেরা ক'রে ক'রে সালেকের খবর পান তিনি। সালেক আর বটা বা বটকৃষ্ট দু'জনে মিলে এই কারবার করে। বেলে-ঘাটার এক প্রান্তে কোন্ বস্তীতে থাকে তারা। ওদের আড্ডা হচ্ছে খালের ধারে এক চায়ের দোকানে।

খুঁজে খুঁজে সেইখানেই গিয়েছিলেন রামকমল।

প্রথমটা এ অবিশ্বাস্য কথা তারা বিশ্বাস করতে চায় নি, বিশ্বাস করে নি রামকমলকেও। গোয়েন্দা ভেবে সোজাসুজি সব কথাই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু রামকমল পৈতা ছুঁয়ে শপথ করতে শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস হয়েছিল।

আর কাজটাও এমন কোন গর্হিত কিছু নয়। বাপই ছেলেটাকে গোপনে এনে গচ্ছিত ক'রে দেবে ওদের কাছে। ওরা শুধু দুটোদিন লুকিয়ে রাখবে। তারপর তিনি এসে নিয়ে যাবেন—এই সামান্য কাজের জন্য ওদের বকশিশ দেবেন তিনি কুড়িটি টাকা!

এই সামান্য টাকায় ওরা রাজী হয় নি অবশ্য। এ কাজের ঝুঁকি আছে বৈকি! হৈ চৈ ত একটা হবেই, পুলিশেও খবর দেওয়া হবে নিশ্চয়—এর মধ্যেই যদি ওরা ধরা পড়ে যায়? তখন কি কেউ বিশ্বাস করবে যে বাপ দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেকে চুরি করিয়েছে?

অনেক দর-কষাকষির পর পঞ্চাশ টাকাতে রফা হয়েছিল!

কথা ছিল যে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ঐ চায়ের দোকানের কাছেই সালেক বা বটা কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে ছেলে নিয়ে—টাকা দিয়ে নিয়ে আসবেন রামকমল।

তারপরের সব ব্যাপারটাই নির্বিবাদে ঘটেছিল।

নির্দিষ্ট ট্রেনের একটা কামরায় উঠে বসে ছিল সালেক, রামকমল নিয়ে গিয়ে ছেলেকে উঠিয়ে দিয়েছেন এক ফাঁকে। হিসেব-করা সামান্য

সময়ে কাজটা হয়ে গেছে, কেউই টের পায় নি তাই। বাপ ছেলেকে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, এত সাধারণ যে কেউ লক্ষ্যই করে নি, পরেও সে কথাটা কারুর তাই মনে পড়ে নি। চতুর রামকমল মনস্তত্ত্বের এই কথাটার ওপরই নির্ভর করেছিলেন এবং ঠকেন নি।

সবচেয়ে প্রিয় জিনিসে ঘা দিলেই মানুষকে সবচেয়ে জব্দ করা হয়—এটা তিনি জানতেন। তাই এ আয়োজন। বেশ হবে, জব্দ হবে সবাই! ওদের সেই কান্না এবং ব্যাকুলতা দেখলেই এ অপমানের শোধ উঠবে। তাছাড়াও কিছু জরিমানা আদায় হবে। পাঁচশ টাকা ত তুচ্ছ, যোগেশবাবু রামকমলের সন্তানের জন্য আরও বহু টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হবেন না, তা রামকমল জানতেন। তিনি ত দয়াই করলেন বলতে গেলে!

এ পর্যন্ত ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল পরিকল্পনার সঙ্গে।

ঘড়ির কাঁটার মতই নির্ভুল হিসেবে চলেছিল সবটা।

কিন্তু প্রথম ব্যতিক্রম হ'ল টাকাটা নিয়ে যখন খালের ধারে এসে দাঁড়ালেন রামকমল—তখনই।

সালেকও নেই, বটাও নেই। তাঁর ছেলে ত নেই-ই!

হয়ত সময়ের হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। ওদের কাছে এত সময়-জ্ঞান আশা করাই উচিত নয়। কিম্বা কোন কাজে আটকে গেছে, কোন লাভজনক কাজ! এ টাকাটা সম্বন্ধে ত কোন উদ্বেগ নেই—তাই এটা ফেলে কোন নগদ বিদায়ের কাজে যাওয়া বিচিত্র নয়।

প্রথমটা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হন নি রামকমল। বোকার মত বহু লোকের স-প্রশ্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হওয়ার একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, এই মাত্র। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের যখন একঘণ্টা পার হয়ে গেল তখন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করলেন—চায়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করলেন। তারা আকাশ থেকে পড়ল। সালেক বা বটকৃষ্ট

নামে কাউকে তারা চেনে না। না, ওরকম বর্ণনার কোন লোককে তারা দেখেও নি। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রামকমল। রাগ করলেন, চেঁচামেচি করলেন, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। যাদের জানে না, দেখে নি—কেমন ক'রে তারা বলবে তাদের খবর! এ ওঁর অন্যায় জুলুম নয়? এইবার রামকমলের মুখ শুকিয়ে উঠল।

ছুটে শিয়ালদায় এলেন। সে ছেলেটা যদি থাকে। না, সে-ও নেই।

আরও দু-পাঁচ জনকে ধরলেন, কিন্তু কেউই অমন কোন লোককে চেনে না। সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ওঁর দিকে। রামকমল বুঝলেন যে গোয়েন্দা ভেবেই ওরা আরও সাফ জবাব দিচ্ছে। তখন আবার ফিরে গেলেন সেই চায়ের দোকানে। মালিকের হাতে-পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে একশ' টাকার একখানি নোট তার হাতে গুঁজে দিতে তার দয়া হ'ল। সে ব'লে দিলে বেলেঘাটার প্রত্যন্ত ভাগের সেই বস্তীর খোঁজ। তখনই ট্যাক্সী ক'রে ছুটলেন সেখানে। অনেক খোঁজ-খবরের পর ঘরটা যদি বা পাওয়া গেল—দেখা গেল ঘরে তালা-বন্ধ। ঘরের মালিক বললে, আজ সকালেই তারা ভাড়া মিটিয়ে চলে গেছে। দরকার থাকলে ঘর ভাড়া নিতে পারেন রামকমল। ভাড়া সামান্যই। কোথায় গেছে? তা সে কেমন ক'রে জানবে!

ট্যাক্সী ছেড়ে দিয়ে শ্লথ মন্থর গতিতে হেঁটেই ফিরে এলেন আবার শিয়ালদায়। কোথায় যাবেন, কোথায় খোঁজ করবেন এবার, তা জানেন না। পুলিশে যাবার অন্তত মুখ নেই। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে চুরি করিয়েছেন একথা কেমন করে বলবেন সেখানে গিয়ে? তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। কোনমতে ষ্টেশনেই ব'সে কাটালেন বাকী রাতটা। তারপর উঠে ঘুরতে শুরু করলেন আবার। কলকাতার উপকণ্ঠে যেখানে যত বস্তী আছে সব ঘুরে দেখলেন ক'দিন ধ'রে। প্রায় সব বিকলাঙ্গ ভিখারীকেই পয়সার লোভ দেখিয়ে জেরা করলেন। কেউ কেউ তাদের আড্ডার বা সর্দারের খবর দিল না যে তা নয়—কিন্তু সে

সব জায়গাতেও সালেক বা বটা অথবা তাঁর আড়াই বছরের সুন্দর ছেলের খবর কেউই বলতে পারলে না তারা। দু-একজন চেনে বটে, কিন্তু কখন্ কোথায় তারা থাকে তা কেমন ক'রে বলবে? সারা ভারতেই তাদের গতিবিধি, গোটা দেশটাই কর্মক্ষেত্র।

কেন গেল তারা? কেন নিয়ে গেল তাঁর ছেলেটাকে?

কত পয়সা পাবে তারা আরও!

তিনিই না হয় কিছু বেশী দিতেন। তাঁর কাছে চাইল না কেন! ···এমনি সহস্র নিষ্ফল প্রশ্নে জর্জরিত ক'রে তোলেন নিজেকেই। আর কোন লাভ হয় না।

হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে এল—শুধু চা খেয়ে এবং ভিখারীদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে। খোঁচা খোঁচা দাড়ী-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পরিধেয় জামাকাপড় হয়ে উঠল মলিন ও শতছিন্ন। পরিচিত কোন আত্মীয়স্বজনের আর চেনবার উপায় রইল না। চেহারাও অনাহারে অনাহারে শীর্ণ হয়ে উঠল। তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

এবার তিনিও ভিক্ষাবৃত্তি ধরলেন। ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়ান, নজর রাখেন অন্য ভিখারীদের ওপর, কান পেতে শোনেন তাদের কথাবার্তা। কোন বিকলাঙ্গ বালক বা শিশুভিখারী দেখতে পেলে তাদের ধ'রে সঞ্চিত সব পয়সা উজাড় করে দেন—শুধু তাদের আড্ডা এবং আড্ডার মালিকের সন্ধান চান তিনি। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। তেমন কোন খবর পেলেই ছুটে যান সেখানে, যেমন ক'রে হোক্।

কিন্তু আজও তিনি ছেলের কোন খবর পাননি। তাঁর সোনার ছেলে হাব্লির। হয়ত আর কোনদিনই পাবেন না। হয়ত পা-বাঁকা কিম্বা হাত-নুলো কোন ভিখারীতে পরিণত হয়ে তামিল ভাষায় ভিক্ষা চাইছে মাদ্রাজের কোন রাস্তার ধারে। কিম্বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন শহরে চোস্ত উর্দু ভাষায় কোন অনাথাশ্রমের জন্য গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে—কে জানে।

কিম্বা হয়ত এর মধ্যে সে তাঁর পাশ দিয়েই চলে গেছে এক-আধবার। চেনার আর কোন উপায় নেই বলেই চিনতে পারেন নি—কে জানে!

আজও তিনি ভিক্ষা ক'রেই বেড়াচ্ছেন এমনি ট্রেনে ট্রেনে। কোথাও কোথাও গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়, মারধোরও খান, তবু আবারও আর একটা ট্রেনে চাপেন গিয়ে।

এমনি করেই তার দিনও একদিন শেষ হয়ে যাবে। এমনি ভিক্ষা করতে করতে। তা যাক্। তার জন্য ভাবেন না তিনি। কিন্তু যদি ছেলেটার কোন খবর পেতেন মরবার আগে। কিম্বা সেই লোক দুটোর।

কেন তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দিল না তারা? কেন? কেন?

অগ্নি-আখরে

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার দূর আকাশে হঠাৎ একটা হাউই ফেটে পড়লো…তারপর আর একটা তার কিছুক্ষণ পরে আর একটা

ইলিন উঁচু টিবির ওপর থেকে নেমে এলো, গাঁয়ের দিকে ছুটলো ..

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশে সেই তিনটি জ্বলন্ত হাউই স্পষ্ট-অক্ষরে জানিয়ে দিলো, নাৎসী-সৈন্যরা এগিয়ে আসছে….গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে যে যার স'রে পড়ো !

বাপ-পিতামোর ভিটে, চিরকালের আশ্রয় . জীবনের একমাত্র আশ্রয়—নিজের হাতে তাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে ··

তারপর—

*　　*　　*　　*

সারা গ্রাম দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে—

বাতাসে আগুনের শিখা আকাশের দিকে উঠেছে—অগ্নি-অক্ষরে যেন লেখা হচ্ছে আহ্বান-লিপি—

নাটাশা আর তার বালক-পুত্র পাভেল পাথরের মতন দাঁড়িয়ে দেখছে—দূরে—একে-একে শেষ মানুষটি পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল।

কতক্ষণ সেইভাবে তারা দাঁড়িয়েছিল তার ধারণাই ছিল না—হঠাৎ নাটাশার মনে হলো সেই শ্মশানে সে একা—তার সহায় একমাত্র সেই বালক। এখুনি হয়তো জার্ম্মাণ-সৈন্যরা এসে পড়ছে—যেসব অত্যাচারের কাহিনী সে শুনেছিল, ছবির পর্দ্দার মতন একে-একে তার মনের চোখের সামনে ভেসে যায়—ভয়ে তার সর্ব-অঙ্গ শিউরে ওঠে—সে কি সইতে পারবে সে-অত্যাচার ?

বালক-পুত্রকে সে জড়িয়ে ধরে—

অস্ফুটস্বরে সে ব’লে ওঠে, রাশিয়া—রাশিয়া—

পুত্র বলে, মা, বাড়ী চলো!

নাটাশা অন্যমনস্কভাবে ব’লে ওঠে, বাড়ী কোথায়?

বালক-পুত্র তার হাত ধ’রে টেনে নিয়ে চলে—বলে, তবু চলো—একটা জিনিস আছে—সেটা পুড়তে দেবো না!

অন্ধকার নেমে আসে—আগুনের আঁচে লাল অন্ধকার—সে অন্ধকারে ফোটে আগুনের ফুল—লাল—রক্তের মতন লাল—

বাড়ীর কাছাকাছি পাভেল মার হাত ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে ছোটে—তাদের ঘরে এখনও আগুন লাগেনি।

ঘরের ভেতর থেকে কি একটা জিনিস তুলে নিয়ে বালক ছুটতে-ছুটতে নাটাশার কাছে আসে—বলে, এই ছাখো মা—এইটের জন্যে বড়ো ভাবনা হচ্ছিলো—এটা যদি পুড়ে যেতো?

মা ছাখে, পুত্রের হাতে ছোট একটি ছবি—লেনিনের ছবি—

এমন সময় অন্ধকারে গাছের আড়ালে কে যেন ন’ড়ে উঠলো—

গাছের আড়ালে আবার লুকিয়ে গেল—আগুনের আঁচে স্পষ্ট মনে হলো, মানুষের মূর্তি—তাদের দিকে এগিয়ে আসছে—সেই মূর্তি যেন ব’লে উঠলো—নাটাশা!

এ-কণ্ঠস্বর তো নাটাশার অপরিচিত নয়!

—এ কি! তুমি, ইলিন? তুমি ওদের সঙ্গে যাওনি?

মূর্তি বলে, তোমাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না তাই গোপনে পালিয়ে এসেছি—আমাকে ক্ষমা করো নাটাশা—আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও!

নাটাশা কোনো-কিছু উত্তর দেবার আগেই তাদের দু’জনের মাঝ-খানের শূন্য জায়গা ভেদ ক’রে একটা জ্বলন্ত বুলেট ছুটে চ’লে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে ভারী-পায়ের শব্দ—বেয়নেটের আওয়াজ!

নাটাশা ছাখে, তাদের ঘিরে অন্ধকারে জার্ম্মাণ-সৈন্যের দল—

এ্যাডভ্যান্‌স্‌ পার্টি—

তাদের মধ্যে একজন ভাঙা-ভাঙা রুষভাষা জানতো, এগিয়ে নাটাশার দিকে চেয়ে বললো, এতদিন যুদ্ধ করছি, এমন ফলন্ত সন্ধ্যা আর দেখিনি!

তারপর রূঢ় গম্ভীরকণ্ঠে কি আদেশ করলো, সঙ্গের সৈন্যরা ইলিনকে ধ'রে নিয়ে চ'লে গেল।

নাটাশা চেয়ে ছাখে, পাভেল অন্ধকারে কখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—

কা-গ্রামে রাত্রি নেমে আসে।

* * *

ইলিন ছাখে, তার চারিদিকে জার্ম্মাণ-সৈন্য। সামনে একটা চেয়ারে জার্ম্মাণ-করপোরাল। একজন দোভাষী করপোরালের হয়ে ইলিনকে জিজ্ঞাসা করে, গাঁয়ের লোকেরা কোথায় পালিয়েছে?

ইলিন বলে, জানি না।

—এখানে কি গেরিলারা আছে?

—জানি না।

হঠাৎ করপোরাল চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে, পোষাক খুলে ফ্যাল্‌।

ইলিন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি, ন্যাংটো হতে লজ্জা হচ্ছে?

ইলিন কোনো কথা বলে না—ত্ব'জন জার্ম্মাণ-সৈনিক জোর করে তার গা থেকে জামা ছিঁড়ে খুলে ফেলে ছায়।

—এবার লক্ষ্মীছেলের মতন পাতলুনটা খুলে ফ্যাল্‌।

ত্ব'হাত দিয়ে পাতলুনটা মুঠো ক'রে ধ'রে ইলিন দাঁড়িয়ে থাকে—

ত্ব'জন সৈনিক বেয়নেট দিয়ে বগলে খোঁচা মারে।

—সুড়-সুড়ি। আপনা থেকে হাত উঠে যায়।

আর-ত্ব'জন এসে জোর ক'রে পাতলুন টেনে খুলে ফ্যালে।

পুরনো-জীর্ণ পাতলুন ছিঁড়ে মাটিতে প'ড়ে যায়।

নগ্ন শুভ্র দেহ—তাতে ফুটে ওঠে রক্তের আলপনা—

জার্ম্মাণরা হেসে ওঠে। করপোরাল বলে, তোমাকে গার্ড করবার মতন আমাদের লোক নেই, তাই ন্যাংটো ক'রে ছেড়ে দিলাম। জানি,

ন্যাংটো অবস্থায় বেশী দূরে পালাতে পারবে না, আর তার চেষ্টাও কোরো না—হ্যাঁ, যখন সুবুদ্ধি হবে এসে খবর দিও গেরিলারা কোথায় আছে—তখন তোমার পোযাকের ব্যবস্থা করবো—এখন যাও, চ'রে বেড়াওগে।

দাঁতে দাঁত চেপ ইলিন বনের দিকে চ'লে যায়—

গেরিলাদের নিয়ে কমরেড সাইমন যখন নীপার-নদীর ধারে এসে পৌঁছোলেন, তখন রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে।

রাত্রির মধ্যেই তাদের পৌঁছোতে হবে গেরিলাদের হেডকোয়ার্টারে। সেখানে আছেন এ-অঞ্চলের নেতা রিজ্‌হিকভ্‌। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যারা গেরিলা-বাহিনীতে যোগদান করতে চায়, তাদের প্রথম আসতে হয় এই হেড-কোয়ার্টারে। প্রথম মহাযুদ্ধে গেরিলারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করেছে, কিন্তু এ-যুদ্ধে তারা শিখেছে সঙ্ঘবদ্ধ হতে। প্রত্যেক অঞ্চলে গেরিলাদের একটা গোপন-হেড-কোয়ার্টার আছে এবং সেখানে থেকে সেই অঞ্চলের দলপতি রীতিমত সৈন্যদের মতনই গেরিলাদের পরিচালনা ক'রে থাকেন, কিন্তু কোথায় যে সেই হেড-কোয়ার্টার, তা কেউ জানে না। তবে রিজ্‌হিকভের লোকদের মারফৎ সাইমন পূর্ব্বাহ্নেই খবর নিয়েছিলেন, নীপার-নদীর ফেরিঘাটে তাঁদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে।

যখন তারা ফেরিঘাটে এসে পৌঁছোলো তখন গভীর রাত্রি—কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই—একখানা ছোট নৌকো প'ড়ে আছে—তার মধ্যে একজন মাঝি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—

সাঙ্কেতিক-ভাষায় সাইমন ব'লে উঠলেন, বন্ধ দরজা—তালা লাগানো—

তারপর বোটের ভিতরে যে মাঝিটিকে মনে হচ্ছিলো, গভীর ঘুমে অচেতন, হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো—ব'লে উঠলো,—

—বন্ধ দরজা—ভাঙবে কাস্তে আর হাতুড়ি—

তারপর বোট থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কা-গ্রাম থেকে ?

—হ্যাঁ।

—দেরী হয়ে গিয়েছে, শীগগির উঠে পড়ুন নৌকোয়—রাত আর বেশী নেই।

অন্ধকার নীপার-নদীর জলে নৌকো চললো জোয়ারের টানে তীরের মতন। নীপার-নদীর ওপারে ঘন বন—কিছুদূর গিয়েই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত গভীর জলাভূমি।

মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে এত দীর্ঘ ঘন-ঘন ঘাস—এক হাত অন্তরে সেই ঘাসের মধ্যে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, তা হ'লেও তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। আশেপাশের গাঁয়ের লোকদের বিশ্বাস, সেই জলার ভেতর ঢুকলে কেউ আর বেরিয়ে আসতে পারে না।

নীপার-নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে, তখনও এই জলার মাটি দেখা যায় না। হাঁটু পর্য্যন্ত জল থাকে অধিকাংশ জায়গায়, যখন বন্যা আসে তখন এই জল বুক পর্য্যন্ত ওঠে—বড়ো-বড়ো গাছের গুঁড়িগুলো আধখানা ঢাকা প'ড়ে যায়।

নতুন গেরিলাদের নিয়ে বোটখানি সেই ঘন ঘাসের বনের ভেতর ঢুকে পড়লো—ঘাসবন ঠেলে নৌকো ধীরে-ধীরে চলেছে জলার ভেতরে—কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

কোথা দিয়ে কি ক'রে পথ চিনে যে নৌকো চলছে, তা তারা কেউই ঠিক করতে পারে না—সেই অন্ধকারে সেই ঘন ঘাসবন ঠেলে নৌকো যেন নিজেই নিজের পথ চিনে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে তারা খানিকটা খোলা জায়গায় এসে পড়লো—সামনেই মনে হলো যেন আরো সব বোট রয়েছে—অস্পষ্ট মানুষের আওয়াজ আসছে—ক্রমশঃ সে আওয়াজ আরও স্পষ্টতর হলো।

নৌকো গেরিলাদের হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছে গিয়েছে—রিজ্‌-হিকভ্‌ তখন তাঁর লোকজনদের নিয়ে মস্কো থেকে গোপন-বেতার-সংবাদ শুনছিলেন।

কারুর মুখে কোনো কথা নেই—শুধু সেই রাত্রি-শেষের অন্ধকারে জলে-ভেজা বাতাসে ভাসছে সুদূর মানুষের কণ্ঠস্বর—যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা—গেরিলাদের নতুন দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্বন্ধে মস্কোর নির্দেশ।

ব্রডকাষ্ট শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই রিজ্‌ হিকভ্‌ ব'লে উঠলেন, কমরেড, তোমরা শুনলে, আমাদের ধরবার জন্যে নাৎসী-সৈন্যরা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছে—যদি গাছের ওপর ব'সে দিন-রাত কাটাতে হয়, তবু গাছের ডালেই আমরা অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখবো—এখান থেকে আমরা এক-পা নড়বো না—নীপারের এই জলাভূমি, এই হলো আমাদের সব-চেয়ে বড়ো দুর্গ।

তারপর নবাগতদের আহ্বান ক'রে তিনি বললেন, এই জলময় মৃত্যুর রাজ্যে আজ তোমরা নতুন এলে—আমি জানি, আমাদের এই মৃত্যু-সাধনার মর্যাদা তোমরা বজায় রাখতে পারবে।

তখন ক্রমশঃ ভোর হয়ে আসছিল। ঘাসবন ঠেলে একখানা দু'খানা ক'রে আরো বোট আসতে লাগলো। আগের দিন সংবাদ-সংগ্রহে যে-সব গেরিলাদের পাঠানো হয়েছিল, তারা সংবাদ নিয়ে একে-একে ফিরছে—

একটা বৃহৎ গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে রিজ্‌ হিকভ্‌ একে-একে তাদের বিবরণ শুনছেন, আর প্রত্যেককে আলাদা ক'রে নতুন কাজের ভার দিয়ে দিচ্ছেন।

চলা-ফেরার কাজ অধিকাংশই রাত্রির অন্ধকারে হয়—রাত্রির অন্ধকার থাকতে-থাকতেই জলাভূমি পার হয়ে নীপারের ধারাস্রোতে পৌঁছোতে হয়। চারিদিকে ঘন ঘাসবন, তার মধ্যে একটি দুটি ক'রে বোট অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

* * *

তখনও কা-গ্রাম জ্বলছে। রাত্রির অন্ধকারে সেই আগুনের আঁচে পথ-ঘাট মাঝে-মাঝে লাল লাল হয়ে উঠছে—যেন কোন্‌ বর্ণ-বিলাসী চিত্রকর ঘন কালোর সঙ্গে ঘন লালের মোটা পোঁচড়া টেনে চলেছে।

ইলিন দেখলো, সেদিক দিয়ে চললেই সে ধরা পড়বে—গাঁয়ের যে-দিকটায় তখনও আগুনের আঁচ এসে পড়েনি, ইলিন টলতে-টলতে সেইদিকে চললো—পথ থেকে নেমে নালা নর্দমা আলোর নীচ দিয়ে-দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো—নগ্ন-দেহ পশুর মতন।

গ্রাম ছাড়িয়ে এক বনের ভিতর সে ঢুকে পড়লো, কিন্তু রক্ত ঝ'রে তার চলবার আর শক্তি ছিল না—একটা গাছতলায় লুটিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কিসের স্পর্শে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল—ছাখে, মুখের ওপর টর্চের আলো।

ধরা প'ড়ে গিয়েছে মনে ক'রে সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো—

টর্চ্চের আলো নিভে গেল ইলিন বুঝলো, তার গায়ে বেয়নট নয়, ছ'টি কোমল ছোট হাত এসে লেগেছে—

অন্ধকারের হাতের স্পর্শ অনুভব করতে সে জিজ্ঞাসা করলো কে ?

—আমি পাভেল।

—পাভেল! তুই? তুই এখানে কী ক'রে এলি?

—তুমি যে-পথ দিয়ে চ'লে এসেছো, সে-পথে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত তোমার গা থেকে পড়ছে—সেই রক্তের চিহ্ন দেখে আমি চ'লে এলাম —এখন কথা বোলো না—এই নাও, তোমার জন্যে খাবার এনেছি।

ইলিন হাত বাড়িয়ে দেয়—পাভেল খাবার তুলে দেয়—

ইলিন জিজ্ঞাসা করে, তোকে ধরেনি ?

পাভেল বলে, ধরলেই হলো কিনা ? আমি স্কাউটস্‌ ট্রেনিং-এ রেড্‌ ফ্ল্যাগ্‌ পেয়েছিলাম, তা জানোনা বুঝি ? আমি এরি মধ্যে ছ'জন সেন্‌ট্রি সাবাড় ক'রে এসেছি!

—কি ক'রে ?

—অন্ধকারে মদ খেয়ে পড়েছিল—ভেবেছিল, কেউ কোথাও নেই। তাদেরই রিভলভার নিয়ে তাদের খুন ক'রে এসেছি। এই ছাখো ছ'টো রিভলবার—আর তাদের একজনের পকেট ঘেঁটে এই ম্যাপখানা পেয়েছি।

এই ব'লে ম্যাপখানার ওপর পাভেল টর্চ্চের আলো ফ্যালে—

—এই ম্যাপ নিয়ে আমি চল্লুম রিজ্‌হিকভের কাছে—একি,—তোমার পোষাক ?

—ওরা কেড়ে নিয়েছে।

—দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি, তুমি এইখানে শুয়ে থাকো—

বলতে-না-বলতে ঝড়ের মতন সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে একটা জামা আর পাতলুন নিয়ে এসে হাজির হলো। বললে—আমার আর সময় নেই—রাত্রির মধ্যেই নীপারের খেয়া-ঘাটে পৌঁছোতে হবে—কমরেড্ সাইমন বলেছে, সেইখানে দেখা হবে।

ইলিন ডাকে, পাভেল!

পাভেল ফিরে আসে।

ইলিন বলে—তোর মা কোথায়?

—আগে ম্যাপটা দিয়ে আসি, তারপর মার খোঁজ করবো।

পাভেল্ আর দাঁড়ায় না—নীপার-নদীর খেয়া-ঘাট তাকে ডাকছে—

* * * *

Achtung

Partisanen Gefahr!

"সাবধান!...

আশপাশেই গেরিলারা আছে! কখনো পথে একলা যাবে না—না জেনে কোনো পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ করবে না—প্রত্যেক ঝোপ-ঝাড়কে সন্দেহের চোখে দেখবে"—ইত্যাদি ইত্যাদি—

জার্ম্মাণ সামরিক-বিভাগ থেকে পোষ্টার পড়ছে।

কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুফল ফলে না—রোজই তাঁবুতে খবর আসে, অমুক-গাঁয়ের সেন্ট্রি কাল রাত্রিতে মারা পড়েছে—অমুক পথ দিয়ে যাবার সময় মোটর-বাইক উল্টে ছ'জন পেসেন্জার গেরিলাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে—রাত্রিতে অমুক গাঁয়ের তাঁবু আগুনে পুড়ে গিয়েছে—

গাঁয়ে-গাঁয়ে মেয়েদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়—

দরজায়-দরজায় পোষ্টার পড়ে—"এতদ্বারা জনসাধারণকে সাবধান ক'রে দেওয়া হচ্ছে যে, একজন জার্ম্মাণ-সৈনিকের খুনের বদলে—যে-দশজন রাশিয়ানকে প্রথমেই চোখে পড়বে, গুলি ক'রে মেরে ফেলা হবে—মেয়ে কি পুরুষ কোনই বিচার করা হবেনা।"

কিন্তু তাতে গেরিলাদের কাজ বন্ধ হয় না—

রাতারাতি গাঁ সুদ্ধ লোক কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়—

জার্ম্মাণরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ে ঢুকে ছোট ছেলের কাছে পেন্‌সিল-কাটা ছুরি পর্য্যন্ত দেখলে, তাকে গেরিলাদের চর বলে সন্দেহ করা হয়। বেয়নেটে তার দেহ দু-টুক্‌রো ক'রে গাঁয়ের তে-মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ে কেউ-কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে···ক্রমশঃ জার্ম্মাণরা জানতে পারে, নীপার-নদীর জলাভূমিতে তাদের প্রধান আড্ডা।

রিজ্‌হিকভের কাছে খবব গিয়ে পৌঁছোয়—আইভান এই বিশ্বাস-ঘাতকার কাজ করেছে।

রিজ্‌হিকভ্‌ একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে পাঠান, বলেন, আইজাক, আজ রাত্রিতেই তুমি আইভানের ব্যবস্থা করবে।

বুকের জামার তলায় রিভালভার লুকিয়ে আইজাক যাত্রা করে—

* * *

জার্ম্মাণরা পোষ্টার দেয়—"চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রিজ্‌হিকভ্‌ তার লোকজন নিয়ে যদি আত্ম-সমর্পণ না করে, তাহ'লে আমরা সমস্ত জলাভূমি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবো।"

পরের দিন ঠিক পাশে হাতে-লেখা আর-একটা পোষ্টার পড়ে···

"কামানের গোলার অপেক্ষায় সারাক্ষণই ঘড়ি ধ'রে ঘণ্টা গুণছে··· জার্ম্মাণ-কুকুরের মুগুর··· ···রিজ্‌হিকভ্‌"

* * *

আইজাক সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঁয়ে এসে ঢোকে···সন্ধ্যা হতে-না-হতেই গাঁ নিঃঝুম।

আইভানের বাড়ীর দরজায় গিয়ে আস্তে-আস্তে টোকা মারে আইজাক···একটা জানলা খুলে যায়···আইভান মুখ বার ক'রে জিজ্ঞাসা করে, কে?

—আমি আইজাক। জরুরী খবর আছে···দরজা খোলো।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে পুরনো বন্ধুকে দরজায় দেখে আইভান তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসে।

আইজাক বলে,—বড় তেষ্টা পেয়েছে···কিছু ভোড্‌কা আছে?

আইজাক জানতো ভোড্‌কা সম্বন্ধে আইভানের দুর্ব্বলতা।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে এক মগ নিয়ে এসে হাজির হয় আইভান। আইজাক খেলো এক-চুমুক···বাকিটা গেল গৃহস্বামীর উদরে।

—কিন্তু, কি ব্যাপার? এত রাত্তিরে?

আইজাক দু'হাত ধ'রে বলে, তোমাকে বিশ্বাস ক'রে বলতে পারি?

—নিশ্চয়ই!

আইজাক আইভানের খুব কাছে ঘেঁষে এসে বলে···আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

—কোথায়?

—জার্ম্মাণ-করপোরালের তাঁবুতে···আমি ব'লে দেবো, কোথায় গেরিলারা আছে লুকিয়ে? আইভানের দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়··· বলে, সত্যি বলছো?

—সত্যি-মিথ্যে তুমি তো সব জানতে পারবে, তোমাকে বাদ দিয়ে তো আমি যাচ্ছি না!

—কিন্তু তোমার খবর যদি মিথ্যে হয়?

—আমি জামিন থাকবো।

আলো নিবিয়ে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তারা দু'জনে বেরিয়ে পড়ে···

পথে যেতে-যেতে আইভান বলে, এক জার গিয়েছে, তার জায়গায় রাশিয়ায় হাজার জার জন্মেছে।

আইজাক খুব ছোট ক'রে সায় দিয়ে যায়। আইভান বলশেভিক-দের সম্বন্ধে তার মনের সব আক্রোশ সমব্যথী পেয়ে উজাড় করে!

হঠাৎ তার মনে জাগে, আইজাক কেন···

জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, তুমিও তো নয়া-কমরেড হয়েছিলে? কি হলো?

আইজাক বলে, দেখলুম সব ভুয়ো!

আইভান হেসে উঠে। সেই তার শেষ হাসি। বুকের ভেতর থেকে রিভলবার বার ক'রে আইজাক সোজা তার বুকে বসিয়ে চাপ দেয়—

নির্জ্জন গ্রামের পথে অন্ধকার শুধু সে-শব্দে একবার শিউরে উঠে—

কাজ সেরে আইজাক তাড়াতাড়ি ফিরে চলে নীপার-নদীর খেয়া-ঘাটে। কিন্তু ঘাটে পৌঁছোবার আগেই জার্ম্মাণ-সেনট্রীদের বেয়নেটের মধ্যে আটক পড়ে।

—গেরিলা!

—কুকুর!

বেয়নেটের আঘাতে প'ড়ে যায়—উঠে দাঁড়ায়—আবার বেয়নেটের আঘাত প'ড়ে যায়—আর উঠতে পারে না! দু'জন সেনট্রি তাকে টেনে তুলে দাঁড় করায়।

—বল্ কোথায় তোদের আড্ডা—এক মিনিট সময়!

ষাট সেকেণ্ড নিমেষে চলে যায়—সঙ্গে-সঙ্গে ধড় থেকে একটা হাত খ'সে পড়ে।

—বল্···বোলশী কুকুর—

আইজাকের মুখে কোনো কথা নেই···কোনো আর্ত্তনাদ নেই।

একজন সেনট্রি বেয়নেটের বাঁট দিয়ে সজোরে মুখে আঘাত করে··

কাঁধের ওপর মানুষের মুখের বদলে শুধু এক ঝলক রক্ত···

—দেখি, তোর মুখ দিয়ে রা বেরোয় কি না···

সজোরে তার বুকের ভেতর দিয়ে বেয়নেট চালিয়ে দেয়!

বেয়নেটের আঘাতে, ভিতরের পুঞ্জীভূত কথা, রক্তমাখা একটি অস্ফুট শব্দে ফুটে ওঠে···রা শি য়া···

* * * *

জার্ম্মাণ-সেনট্রিদের মোটেই ভালো লাগে না-এ কি-রকম ভদ্রতা? কোনো-কিছু খাবার পাবার উপায় নেই সব আগুনে পুড়ছে, নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোবার জো নেই! অমনি কোথা থেকে কে বোমা ছুঁড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এ-সবও সহ্য করা যায় কিন্তু, স্ত্রীলোকের অভাব? অসহ্য। একটি মাত্র স্ত্রীলোক নাটাশা, তাও করপোরালের তাঁবুতে আটক। বলি, রুশগুলো কি জানোয়ার? ঘর-বাড়ীরও মায়া নেই? সব ছেড়ে-ছুড়ে শেষে বনে ঢুকলো?

এর চেয়ে যুদ্ধ ঢের ভালো। খালি গায়ে বেয়নট-ঘাড়ে ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো, কোন্ ভদ্রলোকের ভালো লাগে ?

এমন সময় তাদের চোখে পড়ে একটা ন'দশ বছরের ছেলে। কোনো রুশ-চাষীর ছেলে হবে। রাস্তার মাঝখানে মাথা দিয়ে হেঁটে চলেছে··· স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠেছে আবার ডিগবাজী খাচ্ছে।

একজন সেনট্রী বলে, এই ছোক্‌রা নাচতে পারিস ?

দিব্যি ক্লাউনের মতন অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে ছোকরা নাচে। জার্ম্মাণ-সেন্‌ট্রীরা আনন্দে করতালি দেয়···বলে, চল্ আমাদের তাঁবুতে। ছোক্‌রা এক-পা তুলে নাচতে-নাচতে চলে।

—তোর নাম কি ?

ছোকরা কি একটু ভাবে, তারপর বলে—পাভেল।

একজন সেনট্রী তার গাল টিপে দিয়ে আদর ক'রে বলে, ওরে আমার পাভ্‌লুস্কা !

করপোরালের তাঁবুর পাশেই তাদের তাঁবু। তাঁবুতে গিয়ে অতি-পুরাতন ভৃত্যের মতন পাভেল সেনট্রীদের পায়ের জুতো খুলে দেয়, জামা খুলে পেরেকে রাখে, বালতি নিয়ে জল আনতে যায়—

তাকে পেছনে ডেকে একজন সেনট্রী বলে, এই, ঐ তাঁবুতে একটা মেয়ে আছে—তোদের দেশের মেয়ে, তাকে এখানে লুকিয়ে আসতে বলতে পারিস্ ? রাত্রিবেলা—বুঝলি ?

সেনট্রীরা হেসে ওঠে···

পাভেল ঘাড় দুলিয়ে, বালতি বাজাতে-বাজাতে জল আনতে যায়—রুশ-ভাষায় আপনার মনে গান গায় :

“শীতের রাত্রি···অন্ধকারে ডাকছে নেকড়ে···
কোথায় মাগো, মা-জননী আমার !
শীতের রাত্রি—অন্ধকারে কাঁদছে ছেলে—
কোথায় মাগো, মা-জননী আমার !”

তাঁবুর ভেতর থেকে নাটাশা তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আসে··· লুকিয়ে পাভেলের হাতে কি একটা কাগজ গুঁজে দেয়···

পাশের তাঁবু থেকে সেন্ট্রীরা শিস দিয়ে ওঠে···পাভেল শিস্ দিয়ে তাদের জবাব দেয়। কাগজটা ভালো ক'রে জামার ভেতরে রেখে সে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। ফিরে আসতেই সৈন্যগুলো একসঙ্গে পাভেলকে ছেঁকে ধরলো—কি বললে রে? আসবে?

—বললে, আজ নয়।

একজন চেঁচিয়ে উঠলো, তাহ'লে মাগীর ইচ্ছে আছে।

সেদিন রাত্রিতে বোট আসে, পাভেল উঠে পড়ে।

গেরিলাদের হেড-কোয়ার্টারে এসে সে সোজা রিজ্হিকভের সঙ্গে দেখা করে, বুক থেকে কাগজখানা বার ক'রে দেয়···যে-কাগজ তার মা তাকে দিয়েছিল···

হ্যারিকেনের আলোয় রিজ্হিকভ্ প'ড়ে ছাখেন, অসহায় নারীর আর্তনাদ নয়, সে কি অত্যাচার সইছে তার কাহিনী নয়, তাতে লেখা আছে, এ-ক'দিন সে করপোরালের তাঁবু থেকে যে সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে তারই বিবরণ, কাল দুপুরেই জার্মাণরা জলা ঘিরে ফেলে আক্রমণ করবে।

—সাবাস পাভেল! আইভানের কি হলো বলতে পারো?

—তাকে কেটে টুকরো ক'রে নীপারের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

—মরবার আগে তার মুখ থেকে তারা কিছু আদায় করতে পেরেছিল?

—একটি কথাও না।

—ভালো। তুমি আর দেরী করো না—বোট যাচ্ছে, ফিরে যাও, সংবাদের জন্যে নাটাশাকে ধন্যবাদ জানিও।

পাভেল চলে যায়। রিজ্হিকভ্ কমরেডদের ডেকে বলেন, এখুনি আমাদের এ-আড্ডা ছেড়ে চলে যেতে হবে—তবে একদল থাকবে পশ্চিমের ঝাউবনের ভেতর লুকিয়ে—চারজন থাকলেই হবে। জার্মাণরা যখন আক্রমণ করবে, তখন সেখান থেকে ফাঁকা আওয়াজ ক'রে পথ ভুলিয়ে তাদের সেই ঝাউবনের দিকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের দিক থেকে এমন সুবিধের জায়গা আর কিছু নেই। চার

কোণ থেকে আমরা দশজন তাদের একশো জনকে ঘায়েল করতে পারবো।

নাটাশার খবর ভুল ছিল না। পরের দিন সকাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বোটে ক'রে দলে-দলে জার্মান-সৈন্য নীপার নদীর স্রোত ধ'রে সেই জলাভূমির দিকে এগিয়ে চললো। খানিক দূর যেতে-না-যেতে পাশ থেকে বন্দুকের আওয়াজ আসতে লাগলো।

জার্মাণ-দলের নেতা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, কুকুরদের পেয়েছি··· বন্দুকের আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ঢুকে পড়ো···

শব্দ আন্দাজ ক'রে কিছুদূরে এসে ছাখে, এমন গভীর জঙ্গলের ভেতরে তারা ঢুকে পড়েছে যে, পাশের নৌকো দেখা যায় না। শব্দ ক্রমশঃ পিছিয়ে যায়। এমন সময় পেছন থেকে আর্তনাদ জেগে উঠে··· জার্মাণ-ভাষায়—ট্রাপ্‌ড্‌!

চারিদিক থেকে বন্দুকের গুলি ছুটে আসে। গাছ থেকে পাকা-ফলের মতন এক-একজন ক'রে ঝুপ-ঝাপ ক'রে জলে প'ড়ে যায়···জলের তলা থেকে যেন বাসুকি ফণা তুলে বোট উল্টে দেয়, দেখতে-দেখতে সেই ঝাউবনে এলোমেলো চীৎকার আর বন্দুকের আওয়াজে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে···যেদিক দিয়ে বোট যায়, সেইদিক থেকেই অলক্ষ্য-হাতের বন্দুকের গুলি অব্যর্থ সামনে ছুটে আসে। কোন্ দিক দিয়ে আবার নীপার-নদীর স্রোতে পৌছানো যায়, তা তারা ঠিক করতে পারে না! সকলের চেয়ে বিপদ হলো, তারা একসঙ্গে এগুতে পারে না—যেখানে তারা গিয়ে পড়েছে, সেখানে একটার বেশী বোট সামনে দেখা যায় না।

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে ঝাউবন আবার নিঃসাড় হয়ে যায়।

একশো জনের মধ্যে একজনও ফিরে গেল না!

* * *

করপোরালের কাছে যখন খবর এলো, তখন রাগে তিনি দিগ-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। তাঁবু তুলতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। সারাদিন দলে-দলে সৈন্য চলাফেরা করে। নাটাশা একধারে ব'সে সকাল থেকে ছোলার দানা আর মটরশুঁটি বাছে। এক-একটি সৈন্য হলো এক-একটি

ছোলার দানা···ট্যাঙ্ক হলো মটরশুঁটি। এইভাবে সে হিসেব রাখছে··· কত সৈন্য এলো···কত ট্যাঙ্ক গেল···

গুণতে-গুণতে সন্ধ্যা হয়ে আসে···করপোরালের ডাক আসে।

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নাটাশা তাঁবুর ভেতর ঢোকে।

বিলম্ব সয় না···করপোরালের, জামা ধ'রে টানতেই, পুরনো পচা জামা ছিঁড়ে যায়। শুভ্র-কোমল নারী-দেহ উন্মুক্ত···

হঠাৎ করপোরালের দৃষ্টি পড়ে, হাতের কব্জীর ওপর···টানতে টানতে নাটাশাকে আলোর কাছে নিয়ে আসে···ছাখে, সাদা-গায়ে কালো কালি দিয়ে আঁকা ম্যাপ···তাঁর তৈরী সৈন্য-সমাবেশের ম্যাপ···

করপোরাল চীৎকার ক'রে ওঠেন, ডাইনী তাহ'লে সমস্তই তোর কাজ?

নাটাশা কোনো কথা বলে না।

—জবাব দে! গেরিলারা কোথায়?

কোনো সাড়া নেই। করপোরাল লিভলভার তুলে ধরেন···

—হ্যাঁ কিম্বা না···এক মিনিট···

কোনো সাড়া নেই। এক মিনিট পরে রিভলভার শব্দ ক'রে ওঠে —নাটাশার বুকের ভেতর দিয়ে গুলি চলে যায়।

পাভেল কাছেই ছিল, ছুটে তাঁবুর ভেতর ঢোকে! বলে, স্যার, ঠিক হয়েছে। ঐ তো যত নষ্টের গোড়া।

—তুই কি ক রে জানলি?

—আমি জানতুম না, আজ বিকেলে জানতে পেরেছি—লুকিয়ে-লুকিয়ে গেরিলাদের সব খবর দিতো।

—তাদের খবর তুই জানিস্?

—নিশ্চয়ই।

—খাসা ছেলে। চুপি-চুপি নিয়ে যেতে পারবি?

—খুব পারবো।

—তাহ'লে আজ রাত্তিরে।

পাভেল তখন সরতে-সরতে টেবিলের কাছে এসে পড়েছিল···

টেবিলের ওপর পড়েছিল একখানা ধারালো ছোরা···বজ্রমুষ্টিতে সেখানা ধ'রে বুনো-বেড়ালের মতন সে করপোরালের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বলে, রাত্তিরে না, এক্ষুণি···এই মুহূর্তে···

করপোরাল চীৎকার ক'রে প'ড়ে যান—

সৈন্যরা এসে পাভেলকে ইঁদুর-খোঁচা ক'রে মেরে ফ্যালে।

তারপর তার ক্ষত-বিক্ষত প্রাণহীন দেহটা তাঁবুর সামনে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে।

দু'দিন পরে রেড-আর্মি এসে সেই গ্রাম আবার দখল করে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের অপমৃত্যুতে যুদ্ধ আবার শেষ হয়।

দগ্ধ নগরীর বুকে ব'সে বিজয়ীরা আবার বিচার করতে বসে, এ-যুদ্ধে কে জিতলো? কে হারলো? লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে মানুষ কি পেলো?

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকেরা উঠে-প'ড়ে লাগে, দগ্ধ গাঁ-গুলিকে আবার গ'ড়ে তুলতে।

কা-গ্রামে, যেখানে পাভেলের মৃতদেহ ঝুলছিল, সেখানে তারা একটা পাথরের স্মৃতি-চিহ্ন তৈরী ক'রে তার গায়ে লিখলো ঃ

'পাভেল, তোমার দেশ তোমাকে ভোলেনি।'

মহাকাল নীরবে হাসে।

শিকারী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবিবারের সকাল। সদাশিব দাবা খেলতে এসেছিলেন, মহিম চাটুজ্জ্যে বাড়িতে নেই শুনে চলে যাচ্ছিলেন, ছেলেরা বাইরের রক থেকে উঠে এসে ঘেরেঘুরে বসল। গজানন বলল—"গল্প বলুন দাদু, অনেকদিন পরে একা পাওয়া গেছে।"

নুটু বলল—"আচ্ছা দাদু, আপনার গল্প শুনলে তো মনে হয়, হেন কাজ নেই যা করেননি জীবনে—বাঘ মেরেছেন কখনও?"

নুটুর রোগ, চটিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। সদাশিব একটু আড়ে চেয়ে বললেন—"গল্পও শুনতে হবে, আবার ভাঁওতা দিচ্ছি ব'লে ঠাট্টাও করতে হবে? এমন গল্প নাইবা শুনলি, আমিও নাইবা বললাম..."

সবাই আবার চেপে ধরল; নুটুর কথা বাদ দেওয়ারই মতন—ওটা আবার মানুষ—না বিশ্বাস হয় উঠে গেলেই তো পারে, কেউ তো মাথার দিব্যি দিয়ে ধ'রে রাখছে না...

গজানন বলল—"তাই যা নুটু। আর শুনবি তো দাদুর আজকের বিড়ির খরচটা তোর, যা নিয়ে আয় আগে। একটা দেশলাইও।"

নুটু উঠে গিয়ে রকের পাশেই জংলির দোকান থেকে এক প্যাকেট বিড়ি আর একটা দেশলাই নিয়ে এল। প্যাকেট ছিঁড়ে একটা ওঁর হাতে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে এগিয়ে ধ'রে বলল—নিন দাদু, আপনি ক'ষে দম দিয়ে যেরকম খুশি বলুন, দেখি আমার চেয়ে কে বেশি বিশ্বাস করতে পারে।

সদাশিব মুখের ধুঁয়াটুকু ছেড়ে একটু হেসে বললেন—"ভাঙবে তবু মচকাবে না।"

তারপর আরও গোটাকতক টান দিয়ে, ছাইটা আঙুলের টোকায় আরম্ভ করলেন—"ভাঁওতার কথায় মনে প'ড়ে গেল; বাঘ মারিনি বটে, তবে ভাঁওতা দিয়ে তাড়িয়েছি একবার।

আমার বড় জামাই হীরেন বেহার-সরকারে জঙ্গল বিভাগে কাজ পেয়ে হাজারীবাগ জেলায় পোস্টেড্ হয়েছে, মেয়ে অনেকদিন থেকে যেতে লিখছিল, তারপর পূজোর ছুটিতে কয়েকদিনের জন্যে এসে—টেনেই নিয়ে গেল আমায়। জায়গাটা হাজারীবাগ সহর থেকে মাইল-ত্রিশেক উত্তরে। ওদের আফিসকে মাঝখানে ক'রে ছোটখানো দিব্যি একটি কলোনি। বাঙালী পরিবার দুটি—আমরা আর হীরেনের অফিসার মিষ্টার গড়গড়ির পরিবার। তবে আমি যখন গেলাম তখন লোক হয়েছি—আমরা অনেকগুলি। আমার সঙ্গে তোমাদের ঠানদিদি গেছে, পরেশ, নিতাই, দুকু, সিলি গেছে, বাচ্ছা নাতি-নাতনী দুটিকে নিয়ে আমরা দশ জন। মিষ্টার গড়গড়ির বাড়ি আরও ভর্তি—ছেলে, বৌ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনী মিলিয়ে জন পনেরো। সবাই সবার জুটি পেয়ে গেছে, বেশ আনন্দেই কাটতে লাগল। মিষ্টার গড়গড়ি বিলাত ফেরৎ, বড় ছেলে সুনন্দ ইনজিনিয়ার, একটা বড় ট্রেনিং নিতে বিলাত যাওয়ার কথা হচ্ছে, জামাই অমরেশ নতুন ব্যারিষ্টার; কিন্তু একেবারেই কোন চাল নেই কারুর, কাজেই মেলামেশা করতে কোনরকমই অসুবিধা বা সঙ্কোচের কিছু রইল না। আমায় তো জানিসই, মিষ্টার গড়গড়ির দুই ছেলে, এক জামাই, চার মেয়ে, এক পুত্রবধূ—সবার দাদু হয়ে জমিয়ে বসলাম—খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা, গল্প, সাইট্‌সিইং (sight seeing), পিকনিক—যেন হালকা হাওয়ার উড়ে যেতে লাগল দিনগুলো।

কয়েকদিন পরে বড় ছেলের অফিস খোলায় সে চলে এল। পুত্রবধূ রয়ে গেল, তবে ছোট ছেলে আর সেজো মেয়েটি এল দাদার সঙ্গে চলে, তাদের কলেজ খুলেছে। এরা তিনজনই ছিল সবচেয়ে বেশি হুজুগে, বেশ মন্দা প'ড়ে গেল আমাদের হুল্লোড়-বাজিতে। ঘোরাফেরা একরকম

শেষই হয়ে গেল—প্রায় সব জায়গাগুলো তো হয়েও গেছে দেখা, তার সঙ্গে পিকনিকও হোল বন্ধ; গল্প-গুজব আর কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়া, এই নিয়ে কাটাতে লাগালাম আমরা। ওরকম চড়া পর্দার পর একেবারে খাদে নেমে আসা,—বেশ একটু একঘেয়ে হয়ে উঠল।

একদিন গল্প-গুজবই চলছে, তার সঙ্গে একঘেয়েমিটা কি ক'রে আবার ভাঙা যায় সেই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও, মিষ্টার গড়গড়ির পুত্রবধূ ছন্দা বলল—"দাত্বু, এতগুলি বঙ্গবীর একত্র হয়েছিলেন, একদিনও তো শিকারের নাম করতে শুনলাম না। এখনও যান না, তাতেও তো একঘেয়েমিটা ভাঙতে পারে।"

বললাম, "ভদ্রে, বীর বলতে আসল বীর ছিলেন তোমার স্বামী দেবতাটি; তোমায় স্বর্ণমৃগ এনে দেওয়ার অধিকারীও। তাঁকে বুদ্ধি ক'রে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে এই ত্বটি অক্ষমকে লজ্জা না দিলেই হোতো না?"

উত্তর হোলো—"দেবতাকে স্বর্ণমৃগের খোঁজেই তো পাঠিয়েছি দাত্বু, —জানেন তো আমাদের গয়নার সাধ কখনও মেটে না। আপনারা ধ'রে আনবেন ত্বটো সাধারণ মৃগ, যাতে কালিয়া-কোর্মার সাধ মেটে। যান না একটু। বীর আপনারাই বা কম কিসে?"

বললাম—"কম নয়, তবে তুমি শ্রেণীবিভাগে একটু ভুল করেছ। আমরা ত্বটিতে হচ্ছি বাক্যবীর; আমি গল্প দিয়ে তোমাদের সবাইকে জয় করেছি, অমরেশ তর্ক দিয়ে মক্কেল জয় করে।"

হুজুগটা কিন্তু চারিয়েই পড়ল। মিষ্টার গড়গড়ির তিনটি মেয়েও রয়েছে। মেজো মেয়ে অতসী বলব—"আমি কিন্তু বলব, আপনি তাহ'লে এখন আসলে বাক্য দিয়ে বীরত্ব চাপা দিচ্ছেন দাত্বু। আপনি নিশ্চয় শিকার করতে জানেন, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। আর অমরেশদা'র সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহই নেই—কত গল্প যে শুনেছি ওঁর কাছে। না, একবার হ'য়ে আস্থন; এবার তো ফিরবও।"

বললাম—"বেশ যাব, কপালে যদি তাই লেখা থাকে, খণ্ডাবে কে?"

ছন্দা জিজ্ঞেস করল—"ও-কথা বললেন যে ?"

বললাম—"কালিয়া-কোর্মার সাধ নিয়ে তো সেখানেও নোলার জল ফেলেছে ভাই, দুর্লভ নর-মাংসের কালিয়া-কোর্মা !"

অতসীর ছোট সুজাতা বলল—"বাঘ-ভাল্লুকের কথা বলছেন দাদু ? না, সে এ জঙ্গলে নেই।"

ও স্বাস্থ্য সারাতে কয়েক মাস এখানেই রয়েছে, বলল—"এই তো দু'বার পাটনা থেকে এসেছিল সব ; শুধু দুটো ক'রে হরিণ, একবার একটা খরগোস তার সঙ্গে।"

অমরেশকে বললাম—"কি হে ভায়া, আর তো লজ্জা রাখা যায় না। তোমারই ভরসা, অথচ তুমি তো একটিও কথাই কইছ না।"

অমরেশ চুপ ক'রে বসে ছিল জানলার দিকে মুখ ক'রে একটু অন্য-মনস্ক হয়ে। ঘুরে একটু গম্ভীর হয়েই বলল—"বাঘ-ভাল্লুকই নেই যখন ···আমি হরিণ-খরগোস মারবার জন্যে যেতে পারব না। মশা মেরে হাত ময়লা করা !"

ওদের বড় বোন সুচিত্রা এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল ; বলল—"তাহ'লে নাহয় থাক্।"

গজানন প্রশ্ন করল—"খুব বড় শিকাবী বুঝি দাদু ? ব্যারিষ্টাররা প্রায়ই হয়।"

বিড়িটা শেষ হয়ে এসেছে, একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে সদাশিব বললেন—"দেমাকের কথাটা তো শুনলিই। তুই আমি পারি ? আর সত্যি, হরিণ-খরগোস মেরে তো শিকারীর নাম কেনা যায় না।···নুটুর রগে একটা টোকা মারলেই রক টপকে রাস্তায় ছিটকে পড়বে, তা থেকে তো প্রমাণ হয় না যে আমি একজন বক্সার মস্তবড়।"

কিন্তু রাজী হতে হোলো অমরেশকে। ওরা দুই বোন আর ভাজে ধমকে উঠল সুচিত্রাকে। ছন্দা বলল—"অমনি কর্তার কথায় গিন্নী সায় দিয়ে উঠলেন !"

অতসী বলল—"তুমি থামো তো বড়দি ! হুকুম হোলো—তাহ'লে থাক্ !"

সুজাতা বলল—"এমন একজন ভালো শিকারী, অথচ এত আগলে আগলে আছ, আজ পর্যন্ত একবার দেখতে পেলাম না হাতের কাজ। আজকালকার স্ত্রী, কোথায় আরও বন্দুক হাতে দিয়ে এগিয়ে দেবে।"

একবার যখন রাজী হোলো, আবার নিজমূর্তিতে ফিরে এল অমরেশ। তোদের আগে একবার যেন বললাম—এদের কারুর চাল অর্থাৎ বাজে ষ্টাইল ছিল না। একটু ভুল বলেছি। অমরেশের ছিল। তবে বড়-মানুষী নয়, একটু লম্বা-চওড়া গল্প হাঁকতে ভালবাসত। তবে (নুটুর দিকে আড় চেয়ে) আমার মতন তো ভাঁওতা নয়, পেটে বিদ্যে আছে, গায়ে শক্তি আছে, বিলাতফেরৎ ছেলে, অনেক দেখেছে-শুনেছে, অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। একবার রাজী হওয়ার পর সেই ভাবটা আবার ফিরে এল। তোড়জোড় করতে দুটো দিন যে লাগল তাতে শিকারেরই গল্প চলল আমাদের। অমরেশ নাকি এসেই ভেতরে-ভেতরে খোঁজ নিয়ে টের পেয়েছিল—বাঘ-ভাল্লুক-গণ্ডার কিছুই নেই এসব জঙ্গলে, এমন কি বুনো শূকরও নয়। তাই, পাছে নিরীহ হরিণ-খরগোস গিনিপিগ মারতে ঠেলে দেয় সবাই জোর ক'রে—শিকারের কথা একেবারেই তোলেনি—তখনও চুপ ক'রে বসেছিল, নৈলে শিকার ওর রক্তে রয়েছে। বাবা ছিলেন মস্তবড় শিকারী, করবেট সায়েবের সঙ্গে কতবার কুমায়ুন-পাহাড়ের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন, আত্মপ্রকাশ চাইতেন না—অমরেশদের বংশের ধারাই নয় ওটা, তবে করবেটের man eaters of kumayun বইটা একটু তলিয়ে দেখলেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। এই রকম আরও সব গল্প। আমি ভাই লুকুবো না তোদের কাছে, খানিকটা সাহস পেলাম, আর তারই জোরে আমিও লম্বা-চওড়া দু'একটা হাঁকড়ে দিলাম। অবিশ্যি ওর নাগাল পাব কি ক'রে ভেতরে তো কিছু নেই, তবে গোড়াতেই মেয়েদের কাছে যে ক্রেডিট্-টুকু নষ্ট হয়েছিল সেটা অনেকটা ফিরে এল। দু'দিন পরে সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।"

সদাশিব একটা নূতন বিড়ি ধরালেন, নুটুই দেশলাই জ্বেলে ধরল। প্রশ্ন করলেন—"জঙ্গলের ভেতরে তোমরা কেউ গেছ কখনো ?"

মুটু বলল—"গিয়ে থাকও তো বোলো না যেন কেউ। দাদু ভাববেন গল্পের ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে, সাবধান হয়ে যাবেন।"

ধুঁয়া ছেড়ে একটু হেসে সদাশিব বলতে লাগলেন—

"গড়গড়ি সায়েব জঙ্গল-বিভাগের অফিসার। জামাই এরকম বড় শিকারী টের পেয়ে খুশীই হয়েছেন, বেশ ভাল ব্যবস্থাই করলেন। আমাদের বাসা থেকে মাইল-আষ্টেক দূরে দুটো পাহাড় পেরিয়ে একটা বড় জঙ্গলে শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আরও দু'টি শিকারী দিয়েছেন বিহারী, চারজন লোক, চারটি বন্দুক, মানে, আমিও লেডিজদের সামনে ক্রেডিটটা আর নষ্ট হতে দিলাম না। অমরেশের কাছেই বা মিছিমিছি খোয়াই কেন? গিয়ে দেখি, মাচা হয়েছে দুটি—পো'টাকের তফাতে। ঠিক হয়েছিল, আমরা দু'জনে একটাতে বসব, ওরা দু'জনে একটায়। সঙ্গে লোক রয়েছে, আমাদের উঠে গুছিয়ে বসতে সাহায্য ক'রে তারা নেমে চলে গেল।

গভীর জঙ্গল। প্রায় দুপুর হতে চলল, তখনও যেন অন্ধকার। জঙ্গলের নিজের কোন শব্দ নেই, একটা যে আছে, মাথা থেকে হাত-দশেক দূরে একটা মোষের বাচ্চা বাঁধা ছিল, টোপ আর কি, তারই কাৎরানি, তাতে যেন আরও ভয়ঙ্কর ক'রে তুলেছে জঙ্গলটাকে। পাশ দিয়ে একটা ঝরণা গেছে নেমে। খাদ্য পানীয় দুয়েরই ব্যবস্থা ঠিক, এবার এলেই হয়। মাথাটি আমাদের ডালাপালা লতাপাতা দিয়ে জঙ্গলের সঙ্গে মেলানো। চুপ ক'রে ব'সে আছি দু'জনে। আমি এক-বার মুখ খুলতে গিয়েছিলাম। অবশ্য ফিসফিসানিতেই অমরেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইসারা করল। কোথাও কিছু নেই অথচ একেবারে এতটা দরকার নাকি? যাই হোক, এক্‌স্‌পার্ট তো, ওকেই গুরু মেনে আসা, চুপ করেই রইলাম।

মিনিট দু'য়েক যায়নি, একটা আওয়াজ উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গেই অমরেশ আমার ডান হাতটা মুঠিয়ে ধরল—"দাদু ওঁ কিসের শব্দ? শুনতে পাচ্ছেন?"

ফিসফিস ক'রে নয়, চাপা গলাতেই, তবে বেশ স্পষ্ট; বসা-গলায়

জোর দিলে যেমন শুনতে হয়। চোখ দুটোও একটু ঠেলে এসেছে, মুখ-টাও যেন ফ্যাকাশে!

বললাম—"বোধ হয় তেমন কিছু নয়, তা ভিন্ন এখনও অনেক দূরে। বোধ হয় মাইল-দুয়েক ..."

"তা হোক দাদু, রেডি থাকা ভালো।.. ইয়ে . আপনি বন্দুক ছুঁড়তে জানেন তো?"

বুকটা যেন একেবারে ধ'সে গেল ভাই। সর্বনাশ! কার ভরসায় এসেছি! তবু কোনরকমে সাহসটা বজায় রাখবার জন্যে—বিশেষ ক'রে ওর সাহসটা, বললাম—"তা একটু-আধটু না জানলে এসেছি?"

বন্দুকটা তুলেই নিলাম হাতে, বললাম—"তুমিও রেডি থাকো তাহ'লে।"

যেমন বেশি সবল হয়ে গেলে তেমনি আবার বেশি দুর্বল হয়ে গেলেও তো ইংরিজী বেরিয়ে আসে আমাদের মুখে, বলল—"Excuse me dear Dadu—মাফ করবেন—I know shootnig quite well —ভালো-রকমই জানি—কিন্তু এসব জঙ্গলে হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় ধরে শুনেছি—দেখুন তো—Have I cought it?"

নাড়ি দেখাবার জন্যে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, সঙ্গে-সঙ্গেই একেবারে যাকে বলে প্রস্তরবৎ নিশ্চল! ওর দেখাদেখি সামনের দিকে চেয়ে আমারও অবস্থা তথৈবচ; মনে হোলো এক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গিয়ে অবশ ক'রে দিলে শরীরটা।

তখন প্রায় শ'দেড়েক গজ দূরে। একেবারে ফুল্ গ্রোন্ (Full grown) বেঙ্গল রয়েল, সঙ্গে দুটি বাচ্চা, দেখে বুঝলাম শ্রীমতী—হল্‌দের ওপর লম্বা লম্বা কালোর টান—আস্তে আস্তে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছেন, তবে খুব বেশি যেন তাড়া নেই। মোষের বাচ্চাটা ক্লান্ত হয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিল, বোধহয় নজর প'ড়ে গেছে, চীৎকার ক'রে ডেকে উঠতেই ভঙ্গি গেল বদলে। বোধ হয় পোড়-খাওয়া-বাঘিনী, বাঁধা খাবার দেখে আগের কথা কিছু মনে প'ড়ে গিয়ে সন্দেহ হয়ে থাকবে। কিন্তু সত্যিই সেকী অপরূপ ভঙ্গি!—একেবারে রাজকীয়ই—সেই দোলা

খেয়ে খেয়ে লাফানোটা গেল বন্ধ হয়ে। আস্তে আস্তে থাবা ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে নিচে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগুতে লাগলেন। তারপর বেশ খানিকটা তফাতে এসে থাবা মুড়ে বসলেন—পরিস্থিতিটা ভালো ক'রে বুঝে দেখতে চান। মোষের বাচ্চাটা চুপ ক'রে গেছে, জিভটা নিশ্চয় আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে।

একই অবস্থার মধ্যে অনেক সময় ক্ষেত্র বিশেষে উল্টো ফল হয়। মোষের ঐ অবস্থা, কিন্তু একেবারেই চরমে এসে অমরেশের যেন সাড় ফিরে এসেছে। আমায় প্রায় জড়িয়ে ধরেই যেন নেতিয়ে পড়ল, বলল "দাতু, শালী-শালাদের হাতে আমার প্রাণটা গেল আজ।"

আমার স্বভাব তো জানই, কথা পড়লে যমের সামনে দাঁড়িয়েও উত্তর না দিয়ে থাকতে পারি না, বললাম—"সে তো পুণ্যবাণের মৃত্যু ভাই, কিন্তু তা আর হতে পেলো কৈ ?...তবে ও-তুটির সঙ্গে যদি নতুন সম্বন্ধ পাতাতে চাও তো, আলাদা কথা।...কিন্তু আস্তে কথা কও ; অবশ্য একেবারে না কইলেই ভালো।" বললে—"হাতে প্রাণ যাওয়া মানে, ওদের কাছে বাহাতুরী নিতে গিয়েই যে যেতে বসেছে প্রাণটা। স্যুটিঙের শ'ও জানিনা দাতু, পারেন তো বাঁচান..."

বললাম—"তবে অতসী যে বললে ওর কাছে অত গল্প করতে .."

"বালিগঞ্জের তেতলায় ফ্যানের নিচে ব'সে গল্প দাতু, তার ফল যে এখানে এভাবে ফলবে....ওফ !...গুড বাই ডিয়ার দা..."

আর নয়, একেবারেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। বুঝলাম ঠিক যে জ্ঞানতঃ কথা কইছিল তা নয়, ভয়ের তাড়নে একরকম আধা-চৈতন্যের অবস্থাতেই ভেতরের সত্যি কথাগুলো যেন আপনি বেরিয়ে আসছিল। নিচে ঐ, পাশে এই, আমি যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম প্রথমটা। ওয়াটার-বট্‌ল্ থেকে জোরে জোরে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম, নাড়াও দিলাম কয়েকবার, বারকয়েক ডাকলামও নাম ধ'রে তারপর হঠাৎ হুঁস হোলো, ভুল করেছি এখন এভাবে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে গিয়ে। প্রাণের ভয় নেই যখন, খানিকক্ষণ প'ড়ে থেকে আপনি আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে সেই ভালো।

কিন্তু ততক্ষনে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। ডাকটা নিশ্চয় একটু জোরেই হয়ে পড়েছিল ওরই মধ্যে, নাড়া দেওয়াটাও তাই—শ্রীমতী পরিস্থিতিটার নিশ্চয় তাৎপর্য বের ক'রে নিয়েছেন—জলের কাছে বাঁধা খাদ্য, সামনের গাছপালা হঠাৎ নড়ে, তার মধ্যে মানুষের কণ্ঠ, নিশ্চয় এ নহে স্বপ্ন এ নহে কাহিনী।

অমরেশের দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল এতক্ষণ, সামনের দিকে নজর ফেলে দেখি, একদৃষ্টে এইদিকে চেয়ে আছেন। শুভ-দৃষ্টি হোলো।

বসেই ছিলেন, উঠলেন, তারপর আস্তে আস্তে এগুলেন; দুটি বাচ্চা দু'দিকে। হেলতে দুলতে এসে মাচার খুঁটি থেকে হাত দশ-বারো দূরে পেছনকার পা দুটো মুড়ে সোজা হয়ে ব'সে একটা যে হুঙ্কার ছাড়লেন তাতে মনে হোলো, অমরেশ আগেই নিরিবিলিতে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। আমার কথা জিগ্যেস করবি? যশ নিচ্ছি না, হয়েই এসেছে, তবে বংশের ধারা হচ্ছে সজ্ঞানে মৃত্যু, গঙ্গায় পা ডুবিয়ে, তাইতেই বোধ হয় জ্ঞান হারাইনি একেবারে। তার সঙ্গে একটু একটু বুদ্ধিও রয়েছে; একেবারে মরিয়া হয়ে গেলে যেমন একটু থেকে যায়। ওটা বুদ্ধি কি নির্বুদ্ধিতা তা জানিনা, তবে একটা শোনা কথা মনে আছে যে, বাঘের চোখের ওপর যতক্ষণ চোখ রাখা যায় সে নাকি কিছুই করতে পারেনা, তাই প্রাণ-পণে আছি চেয়ে। আর যাই হোক্, এই প্রাণপণ চেষ্টার জন্যেই একটা যেন জোরও পাচ্ছি মনে, আর তাইতেই বুদ্ধিটাও একটা কাজ করছে।..দিই না হয় বন্দুকটা তুলে নিয়ে ট্রিগারটা টেনে? এটুকু বুদ্ধি আছে যে, বাঘের তিন-চার হাতের মধ্যে দিয়ে সে খাবে গুলি তার কোন সম্ভাবনা নেই, আর তা হলেই আর দেখতে নয়। তাহ'লে করা যায় কি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ তো?

এক-একটা মুহূর্ত যাচ্ছে যেন এক-একটা যুগ, তারপর প্রলয় হয়ে যুগ পাল্টাবারই অবস্থা এসে পড়ল। শ্রীমতী সামনের পা দুটো মুড়ে বসলেন, ল্যাজের ডগাটা একটু একটু নড়তে লাগল, বুঝলাম সংকল্প

ঠিক হয়ে গেছে, এবার লাফ দেবেন। আমার বুদ্ধিটুকু নিভবার আগে একবার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল, তাইতেই পাশে বেতের ব্যাস্কেটের মধ্যে মুখোসটার কথা মনে প'ড়ে গেল।"

"কিসের কথা দাদু!" কয়েজন একসঙ্গে প্রশ্ন ক'রে উঠল। সদাশিব বললেন—"মুখোসের। সে-কথা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি। সে সময় আমার মেজো ছেলে অতুলের শখ চলছে, বাড়িতে একটা মিউ-জিয়াম করতে হবে—নানা জায়গায় মৃৎশিল্পের। বাইরে গেলেই আমায় মাটির খেলনা, বাসন একটু আজগুবি দেখলেই কিনে আনতে হয়। সেদিন আসতে আসতে এক আদিবাসীদের গ্রামে একটা মুখোস নজরে প'ড়ে যায়। একে মুখোস, তায় আদিবাসীদের মুখোস, সে যে কী উৎকট আন্দাজই ক'রে নিতে পারিস্। একজোড়া কিনে নিয়ে খাবার আর জলের বোতলের সঙ্গে ব্যাস্কেটটায় রেখে দিয়েছিলাম; চোখ না সরিয়ে আস্তে আস্তে হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে একটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পরে নিলাম, ওপরটা টুপির মতন, দড়ি বাঁধতে হয় না। ব্যস, নিশ্চিন্দি।"

ও বিড়িটাও শেবহয়ে গিয়েছিল, ফেলে দিয়ে একটা নূতন বের ক'রে নিতে নুটু আবার দেশলাই জ্বেলে এগিয়ে ধরল। গজানন প্রশ্ন করল —"তারপর দাদু?"

সদাশিব ধুঁয়া ছেড়ে বললেন—তারপর আর কিছু হোলোই না তো বলব কি? মুখোসটা বসাতে সেকেণ্ড কয়েক দেরী হয়েছিল, তারপর চোখের ছেঁদার সঙ্গে চোখ দুটো মিলতে আবার ওদিকে নজর গিয়ে পড়ল। মনে হোলো ঠিক লাফটি দিতে গিয়ে শ্রীমতী যেন আবার মত বদ্লে বুক চেপে বসলেন। পরিস্থিতি সম্বন্ধে আন্দাজটা আবার গুলিয়ে গেছে নিশ্চয়, ঠায় চেয়ে থেকে আবার একটা আওয়াজ ছাড়লেন; ঠিক সেরকম হুঙ্কার নয়, মাঝামাঝি কণ্ঠে একটা প্রশ্ন। আমি উত্তরটা দিলাম যথাসাধ্য জোরেই। প্রকাণ্ড মুখোস, তায় ঘেরা-ঘোরা, নিশ্চয় অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে পৌঁছে থাকবে, আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন। ঠিক যে ভয় এমন কথা বলব না ভাই। তবে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর

করেন, কাজ কি ঝঞ্ঝাটে?—ভাবটুকু কতকটা এই রকম। আস্তে-আস্তে গজেন্দ্র-গমনে চলে গেলেন। একবার মোড়টার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে চাইলেন; খানিকটা গিয়ে আবার এদিকেও, তারপর আর দেখা গেল না!"

গজানন প্রশ্ন করল—"আর অমরেশবাবু, দাত্নর! জ্ঞান হোলো তাঁর?"

সদাশিব বললেন—"আহা, ষাট! বালাই! জ্ঞান হবে না কেন? অতসী না হয় না চেনে, বৌ সুচিত্রা বেচারি তো চেনেই, ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে কপালে ফুলুচ্ছে ওদিকে, জ্ঞান হবে না? তবে স্মৃতিটা বেশ স্পষ্ট নয়। রাস্তায় আসতে-আসতে একবার আমায় বললে—"আমার যেন একবার মনে হোলো বাঘ এসেছে দাত্ন, স্বপ্ন কি সত্যি বলুন তো?"

বললাম—"স্বপ্নই যথেষ্ট ভাই, সত্যি হ'লে কি প্রাণটিকে শালী-শালাদের হাতে ভেট দিতে ফিরে যেতে পারতে?"

বোধ হয় কিছুর সঙ্গে মিলে গিয়ে থাকবে, চোখ ছ'টো একটু তুলে একবার আমার দিকে চাইল, তারপর নামিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল!"

———

নদীর পুলটি পেরিয়ে মুন্সি-পাড়ার ছোট্ট ষ্টেশনে এসে প্যাসেঞ্জার গাড়িটি দাঁড়াল। সকাল সাড়ে সাতটা এখনও বাজেনি। এরই মধ্যে বৈশাখের রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছে।

আসবার সময় ঠাকুমা ব'লে দিয়েছিলেন, পাড়াগাঁ, বিদেশ-বিভুঁই। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস এই প্রথম। ব্যাগের মধ্যে কড়াপাকের সন্দেশ রইল, ইষ্টিশানে নেমে জল খেয়ে নিস ভাই। নাৎবৌকে নিয়ে না ফেরা পর্য্যন্ত সবাই পথ চেয়ে থাকব। দুর্গা-দুর্গা—

কথাটা সুশীলের মনে ছিল।

কলকাতার জীবনটা সহজ, কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামের একটি ষ্টেশন-প্ল্যাটফরমে এসে নামলে উপস্থিত সমস্যাটাকে এত সহজ মনে হয়না। কথা ছিল, শ্বশুরবাড়ী থেকে দু-একজন কেউ-না-কেউ এসে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। তারাই নৌকা আনবে এবং পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু চোখের সামনে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছেনা। সুশীল দুর্ভাবনায় প'ড়ে গেল। কেউ আসেনি।

হ্যাণ্ডব্যাগটি ঝুলিয়ে নিয়ে এখানে-ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে সে একসময় ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মাষ্টারমশাই মুখ তুলে বললেন, আপনাকে তো দেখলুম এই গাড়ীতে এলেন! কোথায় যাবেন?

সুশীল বললে, শামতা যাব। কিন্তু—এখানে দেখছিনে কারোকে—

শাম্‌তা ? সে যে অনেক দূর। আজকাল নৌকো তো যায়না, কচুরি জমেছে অনেক। তা ছাড়া বালুতে লগি ঠেলা যায় না। আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে। শাম্‌তায় কাদের বাড়ী যাবেন ?

চৌধুরীদের ওখানে।

মাষ্টারমশাই এবার ভাল ক'রে কলকাতার এই ছোক্‌রার দিকে তাকালেন। তারপর একটু মিষ্টি হেসে বললেন, আপনি কি হরগোপাল-বাবুর জামাই সুশীল রায় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

দাঁড়ান্‌-দাঁড়ান্‌—মাষ্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—সবই গেছে গণ্ড-গোল পাকিয়ে। আপনার দু'খানা চিঠি আর জরুরী টেলিগ্রাম আমার কাছে পড়ে রয়েছে, চৌধুরীদের ওখানে ডেলিভারি দেওয়া হয়নি।

সুশীল প্রশ্ন করল, সে কি ? কেন ?

আর কেন ! একজন রানারের কলেরা, আরেকজন ছুটি না নিয়েই বাড়ী গেছে। কে ডেলিভারি দিয়ে আসবে বলুন ? আঁটপুরে পোষ্ট-মাষ্টারমশাই আমার লোকের হাতে চিঠি আর টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছেন, ডেলিভারি দিয়ে দু'টাকা বকশিস চেয়ে নিয়ো চৌধুরীদের কাছ থেকে। আজ ভাবছিলুম যা হোক ক'রে পাঠাব।

বুঝতে পারা গেল এই কারণেই শাম্‌তার কোনলোক এসে পৌঁছয়নি। সুশীল বললে, কিন্তু আমি তো পথঘাট চিনিনে, শাম্‌তা যাব কেমন ক'রে ব'লে দিতে পারেন ?

মাষ্টারমশাই বললেন, আপনি গিয়ে একটু বসুন ওই ঘাটের ধারে ডাকবাংলায়, আমি খোঁজখবর নিচ্ছি। নদীতে এখন জল নেই বললেই হয়, তাই নৌকো পাওয়া বড্ড কঠিন। আপনি গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি। আপ্‌-গাড়িখানা ছেড়ে দিয়েই আমি আসছি।

ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে সুশীল নির্দিষ্ট পথের দিকে অগ্রসর হ'ল।

পায়ে-চলা একটি পথ নেমে গেছে ঘাটের দিকে। নীচের অংশটায় ডাকবাংলার কোলে একটি মস্ত প্রাঙ্গণ। তারই উত্তর দিক ঘেঁষে দু'টি পাকা ঘর আর একফালি বারান্দা। কিছুদূরে একটি চালাঘর,

সেটি বোধ করি খানসামা আর জমাদারের আস্তানা। একটি লোক এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার ঠুকল। সুশীল এগিয়ে এসে বলল, একঘটি খাবার জল আনতে পার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বৈকি। ওই তো পেছনেই টিউবওয়েল্।

লোকটা তখনই-ছুটতে ছুটতে চলে গেল। বকশিস পাবার লোভ ছিল তার।

এক বৃদ্ধা বসেছিল বারান্দার এক কোণে। কার উদ্দেশ্যে যেন কি সে বকছে নিজের মনে। হাতের কাছে তার একটি ময়লা পুঁটলি। বুড়ি মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, কোথা যাবে গা?

পায়াভাঙ্গা একখানা চেয়ারে সুশীল একটু সুস্থির হয়ে বসল, তারপর মুখ ফিরিয়ে সে জবাব দিল, শাম্‌তা যাব, বুড়িমা।

শাম্‌তা যাবে? তালটুলি ছাড়িয়ে নাকি?

কোথায় তালটুলি আর কোথায়ই বা শাম্‌তা—নবাগত সুশীলের কিছুই জানা নেই। সুশীল শুধু বললে, মাষ্টারমশাই আসছেন, তাঁর কাছেই শুনতে পাবে।

বুড়ি আপন মনে আবার বিজবিজ করতে লাগল।

মিনিট দুই বাদেই চাকরটা এক ঘটি জল এনে রাখল। বললে. বেশ ভাল জল, বাবু—আপনি মুখ হাত ধোন্, দরকার হ'লে আরও দেব। যদি বলেন, চা বিস্কুট ডিমসেদ্ধ—এসব এনে দিতে পারি। এখানে জোগাড় আছে।

সুশীল বললে, যদি পার শুধু এক পেয়ালা চা আমাকে তৈরি ক'রে দাও। খাবার কিছু দরকার নেই।

লোকটা আবার সোৎসাহে চলে গেল।

ব্যাগটি খুলে সুশীল সন্দেশের মোড়কটি বার করবার উদ্যোগ করছে এমন সময় একটি ছিপছিপে কাঁচা বয়সের মেয়ে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুড়িকে প্রশ্ন করল, গলাবাজি করছিলে কেন? যাবে তো যাওনা! সাঁতরে যেতে চাও, যেও—নৌকো নেই।

মেয়েটার চোখ দু'টো লক্ষ্য ক'রে সুশীলের পক্ষে মোড়কটি আর

খোলা সম্ভব হ'লনা। ব্যাগটি আবার বন্ধ ক'রে সে কেবল ঘটি থেকে দু'ঢোক জল খেয়ে নিল।

বুড়ি আবার গজগজ ক'রে উঠল,—চোখে কি দেখতে পাই যে, গাঙ পেরোবো? এখানে জল বেশি। দে না তুই পার ক'রে আমাকে? লম্বা-লম্বা কথা! আবাগি···নচ্ছার!

মেয়েটা সুশীলের দিকে একবার তাকাল। নবাগত এক ব্যক্তির সামনে গালমন্দ খাওয়াটা বোধ হয় তার গায়ে লাগল, সুতরাং সে তখনই বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, মুখ খারাপ করলে কিন্তু ভাল হবেনা মাসি, ব'লে দিচ্ছি। আমি পারবনা, যা খুশি করগে।

মেয়েটা চলে যাচ্ছিল, বুড়ি ডাকল, শোন্, শুনে যা—

না, শুনব না। ভিক্ষের ভাগ দেবে আমাকে যে, তোমার গালমন্দ সইব? কে তোমার ধার ধারে?

মেয়েটা চ'লে গেল। সোজা গিয়ে সে ঢুকল চালাঘরটায়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে মাষ্টারমশাই সেই পায়ে-চলা পথটি বেয়ে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন। আপ্-ট্রেনখানা মিনিট দুই আগে পেরিয়ে গেছে। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার জন্যে বিশেষ কিছুই করতে পারলুম না, সুশীলবাবু। গাঁয়ের জামাই আপনি, খাতির করবার কেউ নেই। তবে একখানা নৌকো যাচ্ছে নবীনগর অবধি,—ওই পর্যন্তই একটু জল আছে। নবীনগরে নেমে আপনি একখানা গরুরগাড়ি পেতে পারেন। আজ সেখানে হাট আছে।

সুশীল এতক্ষণে একটু ভরসা পেয়ে বললে, বেশ, গরুর গাড়ি হ'লেও যেতে পারব। কোনমতে পৌঁছতে পারলেই হ'ল।

মাষ্টারমশাই বললেন, তাহ'লে আর দেরি করবেন না। অনেকটা পথ। নবীনগরে দোকান পাবেন,—দুধ কলা চিড়ে বাতাসা, এসব পাওয়া যাবে। এই নিন্ চিঠি দু'খানা আর টেলিগ্রাম। সবই আপনার। হরগোপালবাবুকে বলবেন, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। চলুন, আপনাকে তুলেই দিয়ে আসি।—এই ব'লে চিঠি ও টেলিগ্রামটি তিনি সুশীলের হাতে গছিয়ে দিলেন।

ব্যাগটি নিয়ে সুশীল উঠে দাঁড়াতেই খানসামা চা নিয়ে এল। তার অন্য হাতে একটি কাগজের মোড়ক। সেটি দেখিয়ে সে বললে, এর মধ্যে আপনার জন্যে চারটে ডিমসেদ্ধ আর আটখানা বিস্কুট দিয়েছি।

সুশীল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ডিম-বিস্কুট চাইনি তো?

কেন, যুম্‌নি গিয়ে যে বললে আমাকে? তাই তো ডিম সেদ্ধ ক'রে আনলুম। তবে ভাববেন না বাবু, এসব পথে আপনার লেগেই যাবে। মোট আপনার হয়েছে সাতসিকে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হ'লনা। ঐরকম আচরণে সুশীল মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল। কিন্তু মাষ্টারমশাই বললেন, মেয়েটার বিবেচনা আছে দেখছি। তা ভালই হ'ল, সারাদিনটাই পড়ে রয়েছে সামনে, ক্ষিধে তেষ্টা পাবে বৈ কি। যুম্‌নি ভালই করেছে।

বকশিস সমেত দু'টি টাকা পকেট থেকে বার ক'রে দিয়ে সুশীল চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিল। চা শেষ করতে মিনিট পাঁচেক লাগল বৈ কি। অতঃপর মাষ্টারমশাই বললেন, আসুন, ঘাটের দিকে যাই।

বুড়ি ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুশীলের পিছু নিয়েছিল। ঘাটের ধারে নৌকার কাছে এসে বললে, আমাকে একটু জায়গা দাও গো বাবারা, আমি তালটুলিতে নেমে যাব। ভিক্ষে-দিক্কে ক'রে খাই বাবা, একটু জায়গা দাও।

অনুমতি লাভের আগেই বুড়ি হাতড়ে-হাতড়ে হাঁটু অবধি কাদা মেখে নৌকায় গিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, অ যুম্‌নি, আয় লা আয়। উঠে পড়্।

মাষ্টারমশাই বললেন, দেখুন ওদের কাণ্ড! শুধু পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবার ফন্দি! কি আর করবেন সুশীলবাবু, দিন্ ওদের একটু জায়গা! গরীব বেচারা!

সুশীল বললে, তা বেশ, যাচ্ছে যাক্। ওদের কাছেই পথ-ঘাট জেনে নেওয়া যাবে।

যুম্‌নিও এসে নৌকায় উঠল। মাষ্টারমশাই বলে দিলেন, নবীনগর থেকে শাম্‌তা হ'ল সাড়ে পাঁচ কোশ,—গরুর গাড়ি না হ'লে

চলবেই না। এখন মাঠ বড্ড শুক্‌নো। ওখানে গেলেই আপনি গাড়ি পাবেন।

মাষ্টারমশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে সুশীল গিয়ে নৌকায় উঠল। একখানা রুমাল বের ক'রে খাবারটা বেঁধে নিল।

মাষ্টারমশাই ফিরে গেলেন। লগি ঠেলে নৌকা ছেড়ে দিল।

উজান ঠেলে নৌকা চলেছে ধীরে ধীরে। বৈশাখের রৌদ্র অতি প্রখর। সুশীল ছইয়ের ভিতরে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসল। সকালের চায়ের তৃষ্ণাটা একপ্রকার মিটেছে, ঘণ্টা দুই এখন নিশ্চিন্ত। ব্যাগটি খুলে আরেকটি রুমাল বের ক'রে সুশীল মুখখানা মুছল। ছোট জানলার বাইরে নদীর দুপারে মাঠ। ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে। বাতাস এখনও তেমন গরম হয়নি। যাত্রাটা নতুন ধরণের—ভালই লাগছে।

বাইরে একপাশে ব'সে রয়েছে যুম্‌নি আর তার পাশে বুড়ি। বুড়ির সঙ্গে যুম্‌নির তর্কাতর্কি লেগেই রয়েছে। তর্কের মূল বিষয়টি সুশীলের কাছে দুর্বোদ্ধ। তবে আন্দাজে বুঝতে পারা যায় এই, জোয়ান বয়সের মেয়েছেলেকে এড়িয়ে গিয়ে বুড়ো মানুষকে কেউ ভিক্ষে দিতে চায়না। সুতরাং তালটুলিতে নেমে নবীনগরের হাটতলা যাবার পথে যুম্‌নি যেন বুড়ির সঙ্গ না নেয়। যুম্‌নি কাছে কাছে থাকলেই তার অসুবিধা। যুম্‌নি তার উত্তরে বলছে, আমি তোমার ভিক্ষেয় ভাগ বসাতে আসিনি। যা খুশি করগে তুমি। আমি গিয়ে হাটতলার কোথাও প'ড়ে থাকব। তুমি তালটুলিতে নেমে যেয়ো।

প'ড়ে থেকে কি করবি! তোর মা যদি ঘরে ঢুকতে না দেয়?

যুম্‌নি একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, নাই বা নিল? কে সাধতে যাচ্ছে? হাটতলায় ভাতফুটিয়ে খেয়ে সোজা হাঁটা দেব বোষ্টমডাঙ্গায়। আমি কি ও-মাগির পরোয়া করি। মা, না ডাইনি!

সুশীল ওদের তর্কটা শুনছিল। যুম্‌নির দিকে এবার মুখখানা ফিরিয়ে বুড়ি একটু হাসল। বললে, ও বুঝেছি, সেই মরদাটার কাছে এখন চললি বুঝি? ছোঁড়াটা না খুনের মামলায় পড়েছিল?

তোমার মাথা আর মুণ্ডু। সে কবে ম'রে ভূত হয়েছে!

তবে কোথায় চল্লি ?

যুম্‌নি একটু থেমে বললে, ওখানে ধানকলে কাজ দিচ্ছে !

বুড়ি বললে, সেই ভালো, কাজ কর,—মরদ না হয় নাই পেলি। তোর না একটা বাচ্চা হয়েছিল ? তাকে কোথায় পাচার করলি ?

যুম্‌নি একটু আড়ষ্ট হয়ে নৌকার ভিতরে একবার তাকাল। পরে বললে, তার কথা আর কেন ! সেও মরেছে !

বটে ! বুড়ি বললে, তোকে বুঝি আমি চিনিনে ? বল্ না কেন গাঙে ফেলে দিয়েছিস ?

যুম্‌নি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, নৌকার মাঝি এবার বললে, তোরা নামবি কোথা রে ? আমার পয়সা কে দেবে ?

বুড়ি বললে, ওমা, কথা শোনো। ভিক্ষেয় বেরিয়েছি, পয়সা পাব কোথায় ?

যুম্‌নি বললে, পয়সার কথা কি হয়েছিল তোর সঙ্গে ?

মাঝি চেঁচামেচি ক'রে উঠল। যুম্‌নি একটু সরে গিয়ে ছইয়ের ভিতরে গলা বাড়িয়ে বললে, ও বাবু, আমাদের কাছে যে পয়সা চাইছে ? তুমি একটু ব'লে দাও না গো।

ঠাকুরমার কথাটা স্মরণ করে সুশীল তখন সবেমাত্র তার সন্দেশের মোড়কটি খুলে বসেছে। উদ্দেশ্য, একটি ডিমসেদ্ধ ও দুটি সন্দেশ খেয়ে সে প্রতিরাশ সারবে। যুম্‌নিকে গলা বাড়াতে দেখে সে একটু বিব্রত বোধ ক'রে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা—তোমরা গিয়ে বসোগে, আমি ব'লে দিচ্ছি। পয়সা তোমাদের দিতে হবে না।

ওখান থেকেই সুশীল গলাবাড়িয়ে নৌকাওলাকে ডেকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তোমার ভয় নেই কর্তা, ওদের পয়সা আমিই দিয়ে দেব।

যুম্‌নি কিন্তু অত সহজে সামনে থেকে নড়তে চাইল না। বুড়ি যেন না শুনতে পায় এইভাবে একটু গলা নামিয়ে বললে, বাবু, চারটে ডিম তোমার জন্যেই আমিই বলেছিলুম। দাও না আমাকে দুটো !

সুশীল সহসা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাল। যুম্‌নি আবার বললে, অত বিস্কুট, অতগুলো সন্দেশ—নাই খেলে তুমি ?

যুম্‌নির চাহনির মধ্যে কোথায় যেন একটা চাপা আক্রোশের লাল আভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। মেয়েটার পরণে একখানা ছিন্ন জীর্ণ ধুতি। বুকের একটা অংশ তার ঢাকা পড়েনি, সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপও নেই। সুশীল চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে এলো খাবারগুলোর দিকে। গা যেন তার ঘিনঘিন ক'রে উঠল। কিন্তু যুম্‌নির সেই লুব্ধ রক্তিম দৃষ্টির দিকে মুখ না তুলেই সে বললে, এই নাও ডিম-বিস্কুট নিয়ে তোমরা খাওগে যাও। এই সন্দেশও চারটে নিয়ে যাও।

বলতে বলতে সেই কাগজটির ওপরেই চারটে সন্দেশ তুলে দিয়ে সুশীল খাবারটা তার দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু যুম্‌নির মুখ চোখ তাতে যে খুশী হয়ে উঠল তা নয়, সে যেন তার পাওনা নিয়ে নিল।

লগি ঠেলতে ঠেলতে নৌকা চলেছে উজিয়ে। মাঝে মাঝে অল্প জলের জন্য নৌকার নীচে বালুর ঘষা লাগছে। আবার প্রাণপণে লগি ঠেলে সেটাকে ঘন জলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইভাবে মাইল তিনেক পথ আসতে-আসতেই মধ্যাহ্নকাল পৌঁছে গেল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে ছইয়ের ভিতরটাও ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে।

সুশীল হাতঘড়িতে দেখল বেলা বারোটা বাজে। মনে মনে সময়ের হিসাব ক'রে সে কূল-কিনারা পেল না। কিছুক্ষণ পরে ছইয়ের পিছনদিক থেকে গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ওহে, নবীনগরের আর দেরী কত?

মাঝি জবাব দিল, তালটুলি পেরিয়ে যেতে হবে বাবু। এই এসে পড়েছি, আর দেরি নেই।

কচুরিপানায় নদীপথ আকীর্ণ। ওরই মধ্যে জল চিনে চিনে নৌকা ঠেলে যাওয়া। হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে একখানা বই ছিল, সেখানা বার ক'রে পড়বার উৎসাহ আর নেই। কড়াপাকের সন্দেশ গোটা-তিন-চার গিলে জলের পিপাসা পেয়েছে। কিন্তু কলেরার ভয়ে সেই পিপাসা সুশীলকে চেপে রাখতে হচ্ছিল।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে নৌকা এসে লাগল তালটুলিতে। বুড়ি এতক্ষণ অবধি সেই অগ্নিঝরা রোদ মাথায় নিয়ে বসেছিল! এর মধ্যে

যুম্‌নির খাবারের থেকে সে ভাগ পেয়েছে কিনা বলা কঠিন,কারণ খাবার-গুলো নেবার পর থেকে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। সুশীলের বিশ্বাস, যুম্‌নি একাই সেগুলো গিলেছে, অথবা তার একটা অংশ গোপন রেখেছে। সুবিধা ছিল এই, বুড়ি চোখে দেখতে পায়না।

তালটুলি এসেছে শুনেই বুড়ি উঠল। পুঁটলিটি ও লাঠিটি নিয়ে উঠে সে বললে, তুই কিন্তু নামতে পাবিনে এখানে, তুই যা নবীনগর। হাটতলায় যা হয় করিস। আমাকে নামতে দে।

যুম্‌নির বোধ করি ক্ষুধানিবৃত্তি হয়েছিল, সুতরাং সে আর প্রতিবাদ জানাল না। এমন সময় সুশীল গলা বাড়িয়ে বললে, ওহে মাঝি, তোমাদের এখানে ভাল খাবার জল পাওয়া যাবে?

মাঝি বললে, হ্যাঁ বাবু, পাওয়া যাবে? এখানে নতুন সরকারি নল বসেছে। জল খুব ভাল।

যুম্‌নি সোৎসাহে ব'লে উঠল, আমি এনে দিচ্ছি বাবু, তোমাকে নামতে হবে না। ছুটে যাব আর আসব।

মাঝির কাছ থেকে ঘটিটা নিয়ে যুম্‌নি নৌকা থেকে নেমে পড়ল বুড়িও নামল তার সঙ্গে। মাঝি গলা উঁচিয়ে ব'লে দিল, যাবি আর আসবি। ঘটি নিয়ে যেন গা ঢাকা দিসনে, মাগি।

মুখ সামলে কথা ক'স জয়নাল, ব'লে দিচ্ছি—যুম্‌নি পিছন ফিরে একবার অগ্নিক্ষরা চোখে তাকিয়ে মাঠ পেরিয়ে হন হন ক'রে চলল

নৌকা দাঁড়িয়ে রইল। মাঝি আর দাঁড়ি দুজন নেমে গিয়ে নদীর সেই জলে মাথা মুখ ধুয়ে নিল। সুশীল একসময় বললে, ওকে চোর বলা ভাল হয়নি, বুঝলে হে,—বেচারি গরীব লোক!

আপনি জানেন না বাবু, ওকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। খুনে মেয়ে ছেলে! দু'দুবার ফাটক ঘুরছে! মেয়েটা ভারি ধড়িবাজ। আজ আপনার কাছে কিছু আদায় ক'রে তবে ছাড়বে! একেবারে ছিনেজোঁক!

সুশীল একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল।

মিনিট পনেরো পরে এক ঘটি জল নিয়ে যুম্‌নি এবার একা

ফিরে এল। বুঝতে পারা গেল বুড়ি গেছে অন্যদিকে, নিজের পথ ধরেছে।

নৌকায় উঠে এসে যুম্‌নি এবার একটু খুশীমুখে বললে, তুমি জল চেয়ে নিলে, এ আমার ভাগ্যি বাবু। তোমরা কলকাতার লোক, এদিকের হালচাল জান না। শুধু জল কেন, ভিক্ষেও জোটে না!

পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পেয়ে সুশীল তখনই খানিকটা খেয়ে নিল। তার-পর মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের হাত বুলিয়ে একসময় প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বলতে পার—কখন গিয়ে শাম্‌তা পৌঁছব?

যুম্‌নি বললে, বোধ হয় সন্ধ্যে হবে। মাঝপথে একটা বিল পড়বে, সেটা পেরিয়ে গেলে সরকারি রাস্তা—

গরুর গাড়ি পাব?

হ্যাঁ—আমি গাড়ি এনে দেব। তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা।

সুশীল বললে, আমাকে গাড়িতে তুলে ঠিক রাস্তাটা ব'লে দিয়ো, তোমাকে বকশিস দেব।

বকশিস!—যুম্‌নি সোজা চোখ তুলে তাকাল। তারপর বললে, তোমার খাবার যে খেলুম তখন? কে তোমার বকশিস চায়? বুঝেছি, জয়নাল এরই মধ্যে কানে তোমার মন্তর দিয়েছে, না?

এদিকটায় কিছু বেশী জল পেয়ে নৌকা একটু দ্রুতগতিতেই চলছিল। লগিটা থামিয়ে ওধার থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জয়নাল। বললে, জানেনা কে, শুনি? ভদ্দলোকের সঙ্গে আবার তর্ক করছিস? চুলের ঝুঁটি ধ'রে এখনই লা থেকে ফেলে দেব! ভয় করিনে তোকে।

ভীষণ বাঁকাচোখে যুম্‌নি একবার জয়নালের দিকে তাকাল। পরে বললে, তোর ভাইয়ের জন্যে বুঝি রাগ তুলতে চাস? আবার লম্বা লম্বা কথা! নৌকো রাখ্, আমি নেমে যাচ্ছি—

সুশীল এবার বাধা দিয়ে বললে, থাক্ থাক্, ওসব ঝগড়া-ঝাঁটিতে আর কাজ নেই। রোদ্দুরে মাথা গরম করছ কেন? আর এইটুকু তো রাস্তা, নামতে আর হবেনা। শান্ত হয়ে ব'সো।

জয়নাল চুপ ক'রে গেল। যুম্‌নি মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল।

* * *

দুদিকে রৌদ্রদগ্ধ মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। দুইয়ের মধ্যপথে নদী যতদূর অবধি দেখা যায় কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। ওরই মাঝখানে কোথায় জল একটু গভীর, সেটি জয়নালরা জানে। বালু বাঁচিয়ে কচুরির ভীড় ঠেলে একসময় নৌকা এসে লাগল একটা মস্ত বটগাছের তলায়। এইটি নাকি নবীনগরের ঘাট। গ্রামের বাচ্চারা নদীতে নেমে জল নিয়ে মাতামাতি করছিল।

জয়নাল ব'লে দিল, এখান থেকে তিন পোয়া রাস্তা আপনাকে হেঁটে যেতে হবে, বাবু। হাটের পথ ধরলে তবে গরুর গাড়ি পাবেন।

হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে সুশীল নেমে এসে বটগাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। যুমনি নামল। তারপর বললে, আমি কি যাব তোমার সঙ্গে বাবু? পথ যদি চিনতে না পার তাহ'লে যাই?

সুশীল বললে, তখন যে বললে গরুর গাড়ি একখানা ভাড়া ক'রে দেবে?

তাহ'লে যাই সঙ্গে, চলো!

নৌকা ভাড়াস্বরূপ তিনটাকা জয়নালকে বুঝিয়ে দিয়ে সুশীল আগে আগে চলতে লাগল। ঘাট ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে নামল। সামনে পাওয়া গেল একটা বাঁশবাগান। রৌদ্র থেকে বাঁচবার জন্য ছায়ায়-ছায়ায় সে চলতে লাগল। যুমনি আসছিল পিছু পিছু। একসময় সে বললে তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবু—ব্যাগটা আমার হাতে দাওনা?

জয়নালের সতর্কবাণী সুশীলের মনে ছিল। সে বললে, না না, সে কি কথা! হাজার হোক তুমি মেয়েছেলে,—লোকে বলবে কি?

যুমনি বললে, লোক তো কেউ নেই এখানে?

সুশীল এবার থমকে দাঁড়াল। লোকে, মেয়েছেলে বোঝা নিয়ে যাবে, আর আমি পুরুষমানুষ হয়ে খালি-হাতে হাঁটব, এ কি হয়? চলো এটা এমন কিছু ভারী নয়।

বেলা দেড়টা বেজে গেছে। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে রুমালটি নিয়ে সুশীল হন হন ক'রে চলল। মেয়েটা আসছে পিছু পিছু, কিন্তু

বকশিসের লোভে নয়। কিছু খাদ্য পেয়েছিল, বোধ করি তারই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ গরুর গাড়ি একখানা যোগাড় ক'রে দিতে চায়। এক সময় যুম্‌নি বললে, বাবু, এই বুঝি তুমি প্রথম শাম্‌তায় যাচ্ছ?

সুশীল জবাব দিল, হ্যাঁ, তা বলতে পার।

মেয়েটা অনায়াসে চলেছে। রৌদ্রে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। খালি-পায়ে শুকনো মাঠের কর্কশ-কঠিন পথ পেরিয়ে চলেছে, কষ্টের ও পরি-শ্রমের কোনও চেতনাও নেই। রুমাল দিয়ে সুশীল বার বার নিজের কপালের ঘাম মুছছিল।

মাঠের মধ্যে তিন পোয়া পথ আন্দাজ করা যায় না। হয়ত এক মাইল, হয়ত-বা তারও বেশি। কিন্তু এই বেলাটুকুর মধ্যে এর অধিকাংশ পথ পেরিয়ে যেতে হবে। অদূরে বস্তি দেখা যাচ্ছে, এটা নাকি নবীনগরের শেষ প্রান্ত। এখান থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ গেলে তবে হাটতলা। সুশীল এক সময় থেমে বললে, গরুর গাড়ি ধরবে কোথেকে বল তো?

চলো বাবু, এই আমরা এসে গেছি। ওই যে চালাঘরগুলো দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই গাড়ি পাওয়া যাবে।

সুশীল আবার মুখ বুজে চলল।

যুম্‌নির উৎসাহের শেষ নেই। অন্যের কিছু কাজ ক'রে দেবার সুযোগ বোধ করি সে এই প্রথম পেয়েছিল। সুতরাং চালাঘর দেখে সে সুশীলকে পিছনে রেখে আগে-ভাগে এগিয়ে গেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে এসব অঞ্চল তার বিশেষ পরিচিত। এক সময় পিছন ফিরে সে বললে, তুমি ওই আম গাছটার তলায় দাঁড়াও, আমি দেখে-শুনে আসি।

ঘর্মাক্ত ও শ্রান্ত চেহারা নিয়ে সুশীল গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। এবারে তার প্রকৃতই দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদি এদের সকলের আন্দাজ সত্য হয় তবে এখনও অন্তত দশ মাইল পথ বাকি। সন্ধ্যার মধ্যে শাম্‌তায় সে পৌঁছতে পারবে কিনা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছেনা। বেলা এখন দুটো। সূর্যাস্তের এখনও প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাকি। পাঁচ

দুগুণে দশ মাইল। মনে হচ্ছে ঘণ্টায় দু'মাইল অবশ্যই গাড়ি যেতে পারবে। সুশীল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে রইল।

আধঘণ্টা পরে দূরের থেকে যুম্‌নি হাতছানি দিয়ে ডাকল। সুশীল প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার কাছাকাছি এল।. যুম্‌নি বললে, গাড়ি এখনও ফেরেনি বাবু, আজ হাটের বার কিনা।

তাহ'লে উপায় ? থমকে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে গেল সুশীল।

যুম্‌নি হাসিমুখে বললে, আমরা হ'লে পাঁচ কোশ পথ হেঁটেই চ'লে যাই। কিন্তু তুমি ত' আর তা পারবে না। তা ছাড়া ঘুম্‌তির বিল পেরোতেই তো সময় লেগে যাবে। মাঝখানে এখন অনেক জল-কাদা। পারবে বাবু ?

মুশকিলে পড়ে গেল সুশীল। বললে, এদিকের পথঘাট আমার জানা নেই। বিলের চেহারা দেখে বলতে পারি, পারব কিনা।

চালাঘরের আশে-পাশে দু'চারজন মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়েছিল। একজন প্রবীণ চাষা বললে, নাটুপাড়ায় নে যা, ওখানে মানুপালের এক-খানা গাড়ি আছে। ভদ্দরলোককে যা হোক ক'রে পৌছে দে। তুই ওকে ধরলি কোথায় ?

যুম্‌নি জবাব দিল, ইষ্টিশানে।

লোকটা বললে, বাবু, যত কষ্ট হোক আপনি আর দাঁড়াবেন না। কোশ দেড়েক গিয়ে নাটুপাড়ায় উঠবেন, দেখুন যদি গাড়ি পান। এখানে হাট থেকে কখন গাড়ি ফিরবে কোন ঠিক নেই। যুম্‌নি, তুই যা বাবুর সঙ্গে। দেড় ক্রোশ থেকে দু'ক্রোশ পথ।

সুশীলের গলা শুকিয়ে উঠেছিল দুর্ভাবনায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে একবার যেন সমগ্র বিরাট দেশের দুর্গম চেহারাটা অনুভব ক'রে নিল। তারপর বললে, খাবার জল এখানে পাওয়া যাবে ?

যাবে বৈ কি। আসুন বাবু চালার তলায়, একটু বসে যান। আপনারা কলকাতার লোক, মাঠে-ঘাটে কষ্ট হয় বৈ কি।

চালাঘরের নীচে এসে বাঁশবাঁধা একখানা বেঞ্চিতে সুশীল বসল। ভিতর থেকে একটা লোক এক ঘটি জল আর খান-চারেক বাতাসা

এনে দিল। কিন্তু দশ মাইল পথ সামনে রেখে সুশীল এখানে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারল না। বাতাসা একখানা চিবিয়ে একপেট জল গিলে সে আবার ব্যাগটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। যুম্‌নিও মুখে চোখে জল দিয়ে প্রস্তুত হ'ল। পাশ থেকে কে একজন মেয়েছেলে চাপাকণ্ঠে পরিহাস ক'রে বললে, তোর কপাল ভাল, যুম্‌নি।

দু'জনে সেই রৌদ্রে আবার হাঁটা-পথ ধরল। শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রাটা ত্র্যহস্পর্শযোগে আরম্ভ হয়েছিল কিনা, সুশীল সেই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। জলযোগ ক'রে সে একটুখানি সুস্থ হয়েছিল, তার লম্বা লম্বা পদক্ষেপেই সে-কথাটি বুঝতে পারা যায়। যুম্‌নি নিজের মনেই আসছে পিছু পিছু। তার ভাগ্য নাকি খুব ভাল, বিনা পারিশ্রমিকে কোলকাতার লোকের কাজে লেগে গেছে। ঈর্ষা করার মত ভাগ্য বটে।

পথের দূরত্বের পরিমাণ লোকের মুখে-মুখেই থাকে। নির্দিষ্ট নিশানা কিছু নেই। মাঠের এক মাইল পথ প্রকৃতই এক মাইল কিনা কেউ ভেবে দেখেনা। আবার, বৈশাখের রৌদ্রে এক মাইলও তিন মাইল হয়ে ওঠে। নাটুপাড়ায় এসে পৌঁছতেই বেলা চারটে বাজল। এর মধ্যে গাছতলায় বসতে হয়েছে বার-দুই, ব্যাগ থেকে গামছাখানা বার ক'রে ভিজিয়ে মাথায় বাঁধতে হয়েছে। জুতো খুলে পায়ের ফোস্কায় হাত বুলোতে হয়েছে বার বার। ধিক্কার এসে গেছে শ্বশুরবাড়ীর দেশ সম্বন্ধে; পল্লীজীবন সম্বন্ধে ঘৃণা এসে গেছে। পায়ের যন্ত্রণায় কান্না চাপতে হয়েছে। খুন চেপেছে মাথায়।

যুম্‌নি একসময় উৎসাহিত হয়ে বলল, বাবু, তোমার কপাল বড় ভাল। মানুপালের গাড়িখানা আছে দেখছি। এবার আর ভাবনা নেই। আজই শাম্‌তা পৌঁছে যাবে।

যুম্‌নির চোখে পড়ছিল গাড়িখানা দূর থেকে, সুশীল তখনও দেখতে পায়নি। সুতরাং এবারও যুম্‌নি আগে-ভাগে নাটুপাড়ায় গিয়ে ঢুকল। মেয়েটার উৎসাহ এবং অধ্যবসায় অপরিসীম। যত আক্রোশই

সুশীলের মনে জমুক না কেন, মেয়েটার প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

গাড়ি দেখলেই হয় না, তার মালিককে চাই। আবার মালিককে পেলেও কাজ হবে না। গরু দুটো জোগাড় করা দরকার। ছুটোছুটি করতে গিয়ে অনেকটা সময় লাগল। মানুপালকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে জ্বর নিয়ে উঠে এল। মোট চার ক্রোশ পথের জন্য সে হাঁকল আট টাকা। তাই সই। সুশীল মরিয়া হয়ে উঠেছিল। গরু দুটো আছে মাঠে,—যমুনি ছুটল মাঠের দিকে। ওতে লেগে গেল আরও আধঘণ্টা। সুশীলের পায়ের ফোস্কা উঠেছে দগদগিয়ে, হাঁটবার সাধ্য আর তার নেই। একখানে জুতোটা খুলে ব্যাগটা রেখে সে বসল।

গরু দুটোকে দড়ি ধরে এনে যুম্‌নি যখন সামনে হাজির করল তখন ছিপছিপে মেয়েটার কপাল আর শুকনো চুল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে। গরু দুটোকে গাছতলায় বেঁধে সে একরাশি খড় সংগ্রহ করে আনল। মানুপাল বললে, বাবু, ছইটা আছে আমার ঘরে। গরু বেঁধে আমি গাড়ি নিয়ে এগোই, আপনি আসুন। ছই বেঁধে খড় বিছিয়ে নেব। আসমানে মেঘ জমেছে, ছইটে দরকার।

পাঁচ রকম কাজে ঘণ্টাখানেক আরও লেগে গেল। মানুপাল আট টাকা হাঁকলেও তার গাড়ি চালাবার উৎসাহ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। গায়ে তার জ্বর, শরীরটা অবসন্ন। নিতান্ত টাকার লোভেই সে রাজি হয়েছিল।

সুশীলেরও ক্লান্তি ছিল অপরিসীম। বিশেষ ক'রে একখানা পা তার ফোস্কার জন্য প্রায় অকর্মণ্য হয়ে এসেছিল। এই গাড়ি কখন এবং কত রাত্রে গিয়ে শাম্‌তায় পৌঁছবে, সে হিসাব আর সে করল না। কিন্তু গাড়িতে উঠে খড়ের বিছানার ওপর বসতে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল। পড়ন্ত রৌদ্রে তার মাথা ধরেছিল। ব্যাগটার ওপর একটু ভর দিয়ে সে কাৎ হয়ে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। যুম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেই চলতে লাগল। মানুপাল চলল তার পাশে পাশে। গরু দুটো গাড়ি টানছে আপন

খেয়ালে। মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে মানুপাল। এইটিই নাকি সরকারি রাস্তা। দক্ষিণ দিকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ গেলে তবে আঁটপুরের কাছারি। সেখান থেকে মুন্সিপাড়া আর দু' ক্রোশ। শাম্‌তার পথ চ'লে গেছে উত্তরে।

* * *

সন্ধ্যা ছয়টায় কালবৈশাখীর আভাস দেখে সুশীলের মুখ চোখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এল। কালো মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বাতাস উঠেছে জোরে। কিন্তু ঘুম্‌নির মুখে চোখে না আছে ভয়, না ভ্রুক্ষেপ। বরং ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনায় ভাব যেন [illegible] একটা উৎসাহই ছিল। মাঠে ধান হবে, তাদের ভাবনা ঘুচবে।

গলা বাড়িয়ে সুশীল বললে, ওদিকে আকাশের চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে এল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দেখছ নে?

ঘুম্‌নি বললে, হ্যাঁ বাবু, ওদিকে ঝড় উঠেছে। তোমার ভাবনা নেই, ঠিক পৌঁছে যাবে।

কত রাত্রে পৌঁছব?

মানুপাল বললে, তা এক প্রহর হবে। রাস্তা কম নয় বাবু। ঘুম্‌তির বিল পেরিয়েও শাম্‌তা পৌঁছতে আড়াই কোশ।

ঘুম্‌নি বললে, ঘুম্‌তি তো এসে গেছে। কত জল হবে মানু?

ঠিক জানিনে তো, চল্‌ দেখি। ধুবলির কাঁধে ঘা আছে, টানতে পারলে হয়।

গাড়িখানা দেখতে দেখতে এসে যখন ঘুম্‌তি বিলের জল-কাদায় নামল, তখন ঝড় উঠেছে। মাঠ-ময়দানের ঝড় কেমন, সুশীলের আগে জানা ছিল না। প্রান্তরের চারিদিকে ধূলোয় আর ঝড়ের বেগে ঘোরাল হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে আকাশ কড়কড় করে উঠছিল। গাড়িখানা এগোচ্ছে কাদার ভিতর দিয়ে। সুশীল কাঠ হয়ে বসেছিল। কাদা ছাড়িয়ে একসময় জলের মধ্যে গাড়িখানা নামল। যত এগোয়, জল বেশি। ওই জল-কাদার মধ্যে নেমেছে ঘুম্‌নি আর মানুপাল। কিন্তু গাড়ির মধ্যে ব'সে একসময় নীচের দিকে ভিজে-ভিজে ঠেকতেই সুশীল

ভয় পেয়ে সহসা ব'লে উঠল, ও গাড়োয়ান, এ কি হ'ল ? তলা থেকে জল উঠছে যে ? এ কোন্‌দিকে নিয়ে এলে ?

যুম্‌নিরও প্রায় কোমর অবধি জল উঠেছে, মানুপালেরও সেই দশা। বিরক্ত হয়ে যুম্‌নি বললে, তখন না তোমাকে বললুম, বিলের পাড় দিয়ে ঘুরে চলো ? সোঁতার মধ্যে গাড়ি ঢুকল, এখন কি করবে ?

পিছন থেকে গাড়িখানা টেনে মানুপাল গরু দুটোকে থামালো। তারপর বললে, ঘুরতে গেলে যে এক কোশ রাস্তা বাড়ে, দেখছনা ?

তাই ব'লে বাবুকে জলে চোবাবে ? গাড়ি যে ডুবল ! গরুর নাক অবধি জল উঠেছে ! ফেরাও গাড়ি।

কিন্তু ওই কথা কাটাকাটির সময়টুকুর মধ্যে কালবৈশাখীর আকাশ ভেঙে পড়ল। বজ্র বিদ্যুৎ এবং ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি নেমে এল। মেঘের করাল ছায়া আচ্ছন্ন করেছে দিকদিগন্ত।

সুশীল ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, না না, আর এগিয়োনা, গাড়ি ফেরাও। জল বেড়ে যাচ্ছে। এ আমি পারব না।

মানুপাল জলের ভিতরে নেমে গিয়ে গরু দুটোকে ধরল। যুম্‌নি গিয়ে প্রাণপণে ধরল গাড়ীর পিছন দিকটা। নানা কৌশল, কসরৎ ও সংগ্রামের পর সেই বৃষ্টির মধ্যে মানুপাল গরু দুটোর মুখসমেত গাড়ি-খানাকে আবার ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু সেই জল-কাদা ভেঙ্গে ঢালুপথের উপরদিকে গাড়ীখানাকে টেনে আনতে যতটা সময় লেগে গেল, তারই মধ্যে মানুপাল আর যুম্‌নির অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠল। এবার চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টির সাপটে আর ঝড়ের তাড়নায় সবাই দিশেহারা হয়ে গেল।

ছইয়ের ভিতরে ব'সে সুশীল বললে, এভাবে যাওয়া যাবে না, বুঝেছ যুম্‌নি ? কাছাকাছি গাঁ আছে কোথাও ? খানিকক্ষণ যদি অপেক্ষা ক'রে যাই ?

মানুপাল এবার বেঁকে বসল। বললে, গাঁ আছে বটে দুপোয়া রাস্তা গেলে, যুম্‌নি জানে। কিন্তু আমি ওখানে ব'সে থাকতে পারব না, বাবু। একটা গরুর ভাবগতিক ভাল নয়, হয়ত

মরবে! তা ছাড়া কাল সকালে আঁটপুরের কাছারিতে আমাকে হাজরে দিতে হবে!

সুশীল বললে, তুমি গাড়িভাড়া পাবে, তবে যাবে না কেন? এত বৃষ্টিবাদলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবে? এসব কি বলছ?

যুম্‌নি বললে, তখন একথা বললেই হ'ত।

মানুপাল বললে, আপনাকে গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আমি যাব। আমাকে চারটে টাকা দেবেন। যা দেখছি, আজকে আর আশা নেই। আমি বসে থাকতে পারব না।

বৃষ্টি প্রবল। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। অন্ধকারে ছইয়ের মধ্যে বসেও সুশীল বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজছিল। বললে আমার আর কিছু বলবার নেই। তাই চলো।

গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে মানুপাল অগ্রসর হ'ল। যুম্‌নিও এগোলো ভিজতে ভিজতে। একসময় সুশীল সকৃতজ্ঞকণ্ঠে গলা বাড়িয়ে বললে, তুমি আমার জন্যে যে কষ্ট করলে, এ আমি ভুলব না যুম্‌নি, শাম্‌তায় গিয়ে সকলের কাছে তোমার গল্প করব।

যুম্‌নি কোনও কথার জবাব দিলনা। ঝড় ও জলের ঝাপটায় মাঝে মাঝে সে টাল খেয়ে যাচ্ছিল। সর্বাঙ্গ দিয়ে তার জল ঝরছে।

এ দুর্যোগের মধ্যে দুপোয়া পথ কতদূর ঠিক আন্দাজ করা যায়না। অন্ধকার তখনও ঘন হয়নি বটে, কিন্তু বৃষ্টির ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করতে গেলে সবই একাকার মনে হচ্ছে! সুশীলের কাপড় জামা জুতো ব্যাগ—সমস্তই ভিজে সপসপ করছে। কোথায় গিয়ে আপাতত মাথা বাঁচাবে, সেটা যুম্‌নিই জানে। গরুর গাড়ি নিয়ে মানুপাল এরপর চলে গেলে একমাত্র যুম্‌নি ছাড়া তার আর কোনো ভরসাই থাকবেনা। কিন্তু এত বৃষ্টির মধ্যে কোনো কথা তলিয়ে ভাববারও সময় নেই।

সরকারি মেটে রাস্তা খানাখোন্দলে ভরা। মাঝে মাঝে চাকা ব'সে গিয়ে গাড়ীতে ধাক্কা লাগছে। ছইয়ের মধ্যে ব'সে সুশীলের মাথা ঠুকে যাচ্ছে, পেটের নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকাচ্ছে। খানার মধ্যে যখন গড়গড়িয়ে নামছে, উপুড় হয়ে প'ড়ে তখন আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে।

এইভাবে তথাকথিত তুপোয়া রাস্তা পেরিয়ে এসে গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, সেটার নাম বুঝি কুমোর পাড়া। ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছেনা,— সামনেই বোধকরি ছোটখাটো একটা হাটতলা। কয়েকটা বাঁশের ওপর গোটা পাঁচ-ছয় চালাঘর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে ঝড়ে গোটা তুই চালা কাৎ হয়ে পড়েছে।

গাড়িখানা মচমচ শব্দ ক'রে একসময় থেমে গেল। পাশেই কোন একটা বস্তির থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ওগুলো কুমোর-দেরই ঘর, ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ধুপধুপ ক'রে আওয়াজ উঠছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে যুম্‌নি এবার এগিয়ে এসে সহসা চাপা-কণ্ঠে বললে, এখানে চেঁচিয়ে কথা ব'লোনা। ওকে টাকা দিয়ে দাও বাবু, ও চ'লে যাক্।

সুশীল চারটি টাকা বার ক'রে মানুপালের হাতে দিয়ে দিল। মানু-পাল খুশী হয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। সুশীল ব্যাগটি হাতে নিয়ে নেমে এসে একখানা চালার তলায় দাঁড়াল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল চালার বাইরে, কিন্তু সেই ক্ষণকালের আলোয় কেউ কারোকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলনা। বহুক্ষণ ওদেরকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

বৃষ্টির সাপট এবার একটু কমেছে। গাড়ি নিয়ে নমস্কার জানিয়ে মানুপাল তার পথের দিকে এগিয়ে চলল!

ব্যাগটি খুলে একখানা গামছা বার ক'রে সুশীল গা-মাথা মুছল, তারপর বললে, রাত্রের মধ্যে শাম্‌তা পৌছতে পারব তো?

যুম্‌নির আচরণে তার যে প্রকৃতিগত উগ্রতা সারাদিন ধ'রে প্রকাশ পেয়ে এসেছে, সেটা যেন কালবৈশাখীর ঝড় জলের তাড়নায় এবার শান্ত দেখাচ্ছিল। সে ঠিক তেমনি চাপা-কণ্ঠে বললে, তুমি যদি পারো, বাবু, আমার আপত্তি নেই। আমি সঙ্গে গিয়েই পৌছে দেব। তবে রাত হবে অনেক।

অন্ধকারে হাতঘড়ি দেখা যায়না। কিন্তু আন্দাজে বুঝতে পারা গেল, রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সুশীল বললে, এখান থেকে আর কতটা পথ হবে?

যুম্‌নি বললে, তা ধরো প্রায় তিন কোশ। আমরা যে আবার খানিকটা উজিয়ে এলুম। আর কিছু না, বিল পেরোতে সময় লাগবে। অন্ধকারে সাবধান হয়ে হাঁটতে হবে তো?

সাপখোপ জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে নাকি?

ওসব কপালের কথা, বাবু।

ব্যাপারটা কি জানো, যুম্‌নি,—আমার আর এগোতে ভরসা নেই। —সুশীল বললে, একে তো ঝড়বৃষ্টি অন্ধকার, তার ওপর জুতোটা এখন আর পরা চলবে না। নতুন জুতোটা প'রে না এলেই হতো। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্, বুঝলে যুম্‌নি? এই চালাটার তলায় ব'সে থাকি। গরমকালের রাত, দেখতে দেখতে পুইয়ে যাবে। ভোরবেলা হেঁটেই চলে যাব।

যুম্‌নি বললে, রাত্তির হ'লে এখানে বন-শূয়োর আসে, বাবু। হাটতলা কিনা।

চমকে উঠল সুশীল, এবং পলকের মধ্যে সমগ্র অন্ধকার বিশ্বচরাচর সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে এল। প্রশ্ন করল, তুমি কি ক'রে জানলে, যুম্‌নি?

এখানে যে আমি আসি-যাই। আমার চেনা লোক আছে। বাবু, একটা কথা রাখবে?

কি বলো?

একটু থতিয়ে যুম্‌নি বললে, রাত্তিরে তুমি যেতে পারবেনা, এখানেও ব'সে থাকতে পারবেনা। বেণী মোড়লের ওখানে যদি রাতটা থেকে যাও,—কাল সকালে হেঁটেই যেতে পারবে।

বেশ তো, ভাল কথা।

কিন্তু ওখানে আমার ইজ্জৎ আছে, বাবু। এ চেহারায় যাবনা।

তাহ'লে কি করবে?—মুখ তুলে সুশীল তাকাল।

যুম্‌নি বললে, তোমার ব্যাগের মধ্যে তখন কাপড় দেখেছিলুম, আমাকে দেবে একখানা?

সুশীল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে গেল। পরে বললে, আমার স্ত্রীর জন্যে খান-দুই নতুন শাড়ি ওর মধ্যে আছে বটে। তবে হ্যাঁ,

তোমার একখানা দরকার বৈকি। জামাও একখানা দিতে হয়! বেশ, দিচ্ছি নাও।

সুশীল একখানা রঙ্গীন শাড়ি ও জামা বের ক'রে যুম্‌নির হাতে দিল। খুশী হ'য়ে যুম্‌নি বললে, তুমি একটুখানি ব'সো বাবু, আমি এখুনি আসছি।

হাটতলা থেকে বেরিয়ে যুম্‌নি হন হন ক'রে একদিকে চ'লে গেল। সামনে বন-বাঁদাড়, অদূরে মস্ত বাঁশঝাড়,—সমস্ত মিলিয়েই যেন বন-শূয়োরের আতঙ্ক। সুশীল কাঠ হয়ে ব'সে রইল। মেয়েটা তার সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক আদায় ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল কিনা—ঠিক বোঝা গেলনা। কিন্তু একাকী অন্ধকারে অজানা গ্রামের জীর্ণ হাটতলায় ব'সে সুশীল পাথরের টুকরোর মতো স্থির হয়ে রইল।

অন্তত ঘণ্টাখানেক হবে। অদৃষ্টের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে সুশীল অপরিসীম নৈরাশ্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল, এমন সময় ছায়া-মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। যুম্‌নি এসে দাঁড়াল সামনে। আন্দাজে দেখা গেল, নতুন শাড়িখানা সে পরেছে, মাথার চুল ফিরিয়েছে,—চেহারাটা সম্পূর্ণ বদল ক'রে নিয়েছে। এদিকে ঝড়-বৃষ্টিও থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

সুশীল বললে, তোমার দেরি দেখে বড্ড দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম! কোথায় যেন তখন রাতটা কাটাবার কথা বলছিলে?

যুম্‌নি বললে, হ্যাঁ বাবু,—আমি সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

সুশীল এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ব্যাগটা এক হাতে নিল, অন্য হাতে নিল জুতো জোড়াটা।

যুম্‌নি বললে, তা কি হয়? ওরা বলবে কি? জুতোটা আমার হাতে দাও, বাবু।

বলতে বলতে সে জুতো জোড়াটা হাত থেকে একপ্রকার কেড়েই নিল।

অতি সন্তর্পণে কয়েক পা অগ্রসর হতে দূরের পথে একটা আলো দেখা গেল। যুম্‌নির গতিভঙ্গীতে কোথায় যেন প্রবল একটা অস্বস্তিবোধ

ছিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বললে, ওই ওরা তোমাকে নিতে আসছে, বাবু। একটা কথা ব'লে রাখি, ওরা যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তুমি যেন কোনো জবাব দিতে যেয়োনা। তোমার পায়ে পড়ি বাবু,—আমার ইজ্জৎ যেন না যায়। আমাকে চেনে সবাই। তুমি যেন কিছু মনে ক'রো না। তোমারও ইজ্জৎ আমি রেখে চলব,—দোহাই বাবু।

অন্ধকারে তার মুখ-চোখের ব্যাকুল চেহারাটা ঠাহর করা গেলনা বটে, কিন্তু যুম্‌নির করুণ কণ্ঠের কাকুতি শুনে সুশীল থমকে দাঁড়াল। পরে বললে, ব্যাপার কি, যুম্‌নি?

কিছু না বাবু, কিছু না। তোমাকে দেখে নানা কথা উঠবে কিনা, তাই আগে ব'লে রাখছি। তুমি কিছু জবাব দিও না, এই আমার ভিক্ষে। ওদের কাছে আমার মান রেখো, বাবু। সে অনেক কথা, পরে তোমায় বলব।

ততক্ষণে আলো নিয়ে জন-দুই চাষী মেয়ে ছেলে এবং মোড়ল এগিয়ে এসেছে;—আশে পাশে ঘিরে রয়েছে পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে।

মোড়ল কাছে এসে আলোটা তুলে ধ'রে বললে, তাই তো বটে, মিছে বলেনি। কপালটা তোর ভাল রে, যুম্‌নি! আসুন বাবু, আসুন—ঘরে নিয়ে যারে বৌ।

ওর মধ্যে একটা বউ এসে হাসিমুখে সুশীলের হাত ধ'রে আঙন পেরিয়ে একটি গোলপাতার ঘরের দাওয়ায় নিয়ে তুলল। একটি মেয়ে ঘটি ক'রে আনল পা ধোবার জল। বুঝতে পারা গেল, এরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটা সোরগোল প'ড়ে গেল। বোধহয় এরই মধ্যে কোনও একটা কোনে রান্নার আয়োজন চলছে দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারে একটি মাত্র হ্যারিকেনের ভরসায় আশে-পাশে ক্ষুদ্র একটি জনতা জমে উঠল, এবং তাদেরই মাঝখান দিয়ে মূল্যবান শাড়ি এবং জামা প'রে গৌরবগর্বিতা যুম্‌নি হাসি-হাসি মুখে চলাফেরা করতে লাগল।

সুশীল প্রথমটা হতচকিত হয়ে উঠেছিল। মনে ভয় ছিল, পাছে এই হট্টগোলের মধ্যে তার হ্যাণ্ডব্যাগটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সেজন্য প্রথমেই সে পা ধুয়ে হ্যাণ্ডব্যাগটি নিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে উঠল।

কলকাতার বাবু, সুতরাং উৎকণ্ঠা এবং আড়ষ্টতা ছিল আশে-পাশে। সামনে কেউ আসছেনা বটে, কিন্তু অন্ধকারে বহুকণ্ঠের ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। একটু পরে ভিতরে এসে দাঁড়াল যুম্‌নি। সুশীল এবার ব্যাগটি খুলল। সন্দেশের মোড়কটি সামনেই ছিল এবং অনেকগুলিই আছে তার মধ্যে। সেটি বার ক'রে সে বললে, আর কেন, এগুলো ওদের সবাইকে ভাগ ক'রে দাওগে।

ব্যাগের ভিতরে একটা কালো রংয়ের কৌটো দেখে যুম্‌নি মৃদুগলায় হঠাৎ প্রশ্ন করল, ওর মধ্যে কি আছে?

সুশীল বললে, ওতে ঠাকুরমার জিনিস আছে। আমার একটি ছেলে হয়েছে, ঠাকুমা তাই তাঁর নাৎবৌকে কিছু গয়না পাঠিয়েছেন।

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল যুম্‌নির। বললে, দেখি না?

মেয়েটাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। সুশীল সেই কৌটা খুলল। ওর মধ্যে রয়েছে গলার, কানের, আর হাতের গহনা। যুম্‌নি বললে, আমাকে দাও, পরি—আবার দিয়ে দেবো।

প্রতিবাদ কিছুমাত্র জানাবার আগে যুম্‌নি গয়নাগুলো নিয়ে পরতে লাগল। অবাকবিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে রইল সুশীল। অতঃপর গয়না প'রে সন্দেশের মোড়কটি নিয়ে যুম্‌নি উঠে বাইরে চলে গেল, এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে আর তার সাড়া পাওয়া গেলনা।

* * *

ডাল ভাত লাউঘণ্ট ডিম সেদ্ধ—আর চাই কি। একটি চাষী-পরিবারের ঘরে এই তো রাজভোগ। পরিতুষ্টি সহকারে আহার শেষ ক'রে সুশীল হাত ধুয়ে ঘরে উঠল। স্পষ্টকথা সুশীল বলছেনা, এটি যুম্‌নির নিষেধ। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া প্রতারণায় ভরা,—সুতরাং সুশীল যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে ছিল। মোড়ল এসে ভয়ে ভয়ে গল্পসল্প ক'রে গেল, কিন্তু এমন ক'রে যুম্‌নি তার নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রেখেছে যে, কোনটাই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া গেলনা। যুম্‌নি তার লোকসমাজের মধ্যে ব'সে বহু সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী ব'লে গেল। তার ইজ্জৎ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, তার আশ্চর্য সৌভাগ্য—

সমস্তটাই বিস্ময়কর। তার লজ্জাশীলতা, শোভন ভদ্র আচরণ, তার গদগদ কণ্ঠের কাকলী, হাসিখুশী মুখ, বাঁকাচোখের কৌতুক চাহনি, তার মূল্যবান পরিচ্ছদ এবং স্বর্ণালঙ্কারের বিচিত্র কাহিনী,—এ সমস্তই মধ্যরাত্রি অবধি জনসমাজকে অভিভূত ও মুগ্ধ ক'রে রাখল। শুধু একটি বিচিত্র রাত্রি তার সম্মুখে,—তার সমগ্র দুঃশীল দুর্গত ও দুর্নৈতিক জীবনের সকল গুপ্ত বাসনা একটি মাত্র রাত্রিতে সংহত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। এ মেয়ে সেই সারাদিনের পথচারিনী দরিদ্রা দুশ্চরিত্রা সমাজ পরিত্যক্তা মেয়ে নয়,—এ অন্য মেয়ে।

যুম্‌নির কলঙ্ক হেঁটে বেড়িয়েছে চিরকাল এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। সুতরাং আজ তার নূতন সৌভাগ্যকে বিশ্বাস ক'রে নিতে লোকসমাজের অনেকটা সময় লাগল। হয়ত-বা রাত দুটোই বাজতে চলল। ফুঁ দিয়ে-দিয়ে যেমন আগুন জিইয়ে রাখে, তেমনি ক'রে যুম্‌নি তার নতুন-নতুন গল্প ফেঁদে সবাইকে জাগিয়ে রাখল। অবশেষে একে একে সকলকে বিদায় দিয়ে একসময় হারিকেনটি নিয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল এবং দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

আলোটা কমানো ছিল,—কমানোই রইল। আন্দাজে সে বুঝল, অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে সুশীল কখন্ যেন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতি সন্তর্পণে যুম্‌নি ছোট জানলাটা খুলে দিল। হ্যাণ্ডব্যাগটি ছিল সামনে। যুম্‌নি আস্তে আস্তে সেটি খুলল, এবং সেই কৌটোটি বার ক'রে গায়ের গয়নাগুলি নিয়ে একে একে তার ভিতর গুছিয়ে রাখল। অতঃপর তার নিজের যে ছিন্নভিন্ন ও ময়লা কাপড়খানা এতক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে নিয়েছিল, সেইখানা দিয়ে সে সুশীলের জুতো জোড়াটা পরিষ্কার ক'রে মুছল। তারপর সব কাজ একে একে সারতে অনেকটা সময় গেল বৈ কি।

এক সময় সে উঠল এবং দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে দিল। ভিতরে হাওয়া আসুক, নিদ্রিত রাজকুমারের কপালে ঘামের ফোঁটা না জমে ওঠে। না, ভিতরে-বাইরে এখন আর কেউ জেগে নেই। কিন্তু আজকের এই নিশুতি রাত্রে যুম্‌নি আর লোভ সামলাতে

পারলনা। হারিকেনটা সামান্য একটু বাড়িয়ে সে তক্তার ধারে এসে সুশীলের মাথার দিকে দাঁড়াল। দেখল ভাল ক'রে তরুণ যুবককে। এতকাল ধ'রে অনেক পুরুষমানুষকে সে দেখে এসেছে,—কিন্তু সারাদিন যাবৎ একান্ত কাছে-কাছে থেকেও যে ব্যক্তির দিকে মুখ তুলে সে একটিবারও ভাল ক'রে তাকায়নি, এখন তার ঘুমন্ত মুখখানা যুম্নি ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করতে লাগল। না, এ ভিন্ন ব্যক্তি। এ পুরুষ যুম্নির পরিচিত সংসারের থেকে পৃথক। একে সে আগে কখনও দেখেনি। সবাই মিলে তাকে বলেছে পরম সৌভাগ্যবতী। কিন্তু সে মিথ্যে। একান্ত প্রতারণা। ভয়ানক ফাঁকি। দেখতে দেখতে নিজের প্রতি তার একটা আক্রোশ ধকধক করতে লাগল এবং কালবৈশাখীর মতই যুমনির বাঁকা চাহনি একবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তারপর দেখতে দেখতেই তার সেই রুক্ষ রক্তিম দৃষ্টির ভিতর থেকে ঝরঝরিয়ে জল নেমে সৃষ্টি-স্থিতি সৌরবিশ্ব প্লাবিত ও একাকার ক'রে দিল।

যুমনি কতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বলা যায়না। একসময়ে আলোটা নিয়ে সে বাইরে এসে দাওয়ার ধারে বসল এবং বারম্বার তার অবাধ্য চোখ দুটো মুছতে লাগল। রাত সাঁ সাঁ করছিল।

যুমনি জানে, আকাশের শেষরাত্রির লক্ষণ কখন্ প্রকাশ পায়। একসময় সে উঠল। তারপর ঘরে ঢুকে চৌকির কাছে গিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকল, বাবু—ওগো বাবু—এবার উঠে পড়ো। এখনই বেরোতে হবে। রাত আর বাকি নেই। তৈরী হয়ে নাও।

সুশীল ঘুম চোখে ধড়মড়িয়ে উঠল। চোখ রগড়ে বললে, হ্যাঁ, যেতে হবে! চলো,—কিন্তু বড্ড গা ব্যথা,—তা যেতে হবে বৈকি!

তাড়াতাড়ি উঠে জামাটা গায়ে চড়িয়ে সুশীল্ বললে, এখনওযে অন্ধকার রয়েছে, যুমনি! পথ দেখতে পাব তো?

যুমনি বললে, হ্যাঁ পাবে। আমিও যে যাব সঙ্গে, পৌঁছে দেব। এখনই ভোর হবে, ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় চলে যাবে। তোমার সব গয়না রেখে দিয়েছি কৌটায়। দেখে মিলিয়ে নাও।—হ্যাঁ, আরেকটা কথা।

গোটা চারেক টাকা আমার হাতে দাও তো? ওদের দিয়ে যাব। তুমি খরচ করতেই তো বেরিয়েছ, পরের ভাত খাবে কেন? ওতে তোমার আর আমার দু'জনেরই মান বাঁচবে।

দ্রুতহস্তে সুশীল চারটি টাকা বার ক'রে দিল। সেই টাকা নিয়ে যুমনি ছুটে গেল দাওয়া থেকে নেবে আরেকখানা ঘরে। একটি ঘুমন্ত বৌকে মেঝের উপর থেকে টেনে জাগিয়ে তুলল। তারপর তার হাতে চারটি টাকা দিয়ে বললে, আমরা এবার যাচ্ছি রে। মোড়ল উঠলে টাকাটা ওর হাতে দিস, ভাই—

বৌটা বাইরে এসে দাঁড়াল! ব্যাগটি হাতে নিয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে সুশীল বেরিয়ে এল। হারিকেনটা টিপটিপ করছে। যুমনি ওই বৌটির কাছে হাসিমুখে বিদায় নিল, এবং মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে সুশীলের দিকে ফিরে বললে, এসো—

দুজনে হনহনিয়ে চলল কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে হাটতলা পেরিয়ে অনেক দূর। অন্ধকার গ্রামটি ফেলে দুজনে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বৌটি দাঁড়িয়ে রইল একদৃষ্টে ওদের পথের দিকে তাকিয়ে। আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হ'ল। উষাকাল এসে দাঁড়াল। অতঃপর দেখতে দেখতে লোকজন এসে আবার ভিড় করল গত রাত্রির কাহিনী শোনার জন্য।

যত বেলা বাড়ে ততই চতুর্দিকে সাড়া প'ড়ে যায়। যুমনিকে সবাই চেনে। সেই কারণে অপরিসীম কৌতূহল সকলের মুখে চোখে। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেছে সবাই, কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতে বাধে।

কিন্তু যাদের নিয়ে এত হৈ চৈ তারা তখন চলে গেছে অনেক দূর পথ। বেলা আটটার মধ্যে তারা মাইল পাঁচেক পথ পেরিয়ে প্রায় শাম্‌তার কাছাকাছি এসে গেছে। নদীর ঘাট দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শাম্‌তার সেই বিশাল বটবৃক্ষের বনস্পতি। দূরে কাছারির চালাঘরের করোগেটে রোদ প'ড়ে চকচক করছে। শিবমন্দিরের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে চৌধুরীদের মস্ত বাড়ির একাংশ।

সুশীল এবার দ্রুতপদে চলেছে! ঘাটে পা ধুয়ে সে জুতো পরবে,

চিরুণী বার ক'রে মাথাটা আঁচড়ে নেবে। কোঁচাটাও শ্বশুরবাড়ীর উপযুক্ত ক'রে বাগিয়ে নেবে।

যুমনি পিছু পিছু আসছে। এবার তার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। চৌধুরীদের বাড়ীখানা ভাল ক'রে দেখিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে নিজের পথে। যাবে সে ধানকলে কাজ নেবার জন্য।

বাঁশবাগানটা পেরিয়ে সুশীল একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। তার মন খারাপ লাগছে। অন্তত গোটা দশেক টাকা যুমনির হাতে গছিয়ে দিতে না পারলে তার স্বস্তি হচ্ছেনা। পথের অসুবিধা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনই হোক, মেয়েটা তাকে নিরাপদে এনে পৌঁছিয়ে দিল, এর কৃতজ্ঞতা কম নয়।

যুমনি বোধকরি অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, বনবাগান ছাড়িয়ে তাকে দেখা যাচ্ছেনা। সুশীল সেখানেই অপেক্ষা ক'রে রইল। আর কিছু নয়, শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছে গত চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনী সবিস্তারে সে বলবে বটে, তবে·গতরাত্রির গল্পটা যথাযথ-ভাবে বলা সঙ্গত হবে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়।

হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল যুমনি বাঁশবাগানের ভিতর থেকে। আড়ালে গিয়ে সে এতক্ষণে তার পরণের মূল্যবান শাড়ি আর রেশমী জামা ছেড়ে আগেকার সেই শতছিন্ন মলিন কাপড়খানা পরে নিয়েছে। এবার যেন তাকে কিছু প্রসন্ন মনে হচ্ছে।

ও কি করলে, যুমনি?

হাসিমুখে যুমনি বললে, দশ মিনিট সময় আমাকে দাও। ঘাট থেকে এ দুটো কেচে শুকিয়ে নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও। হাওয়ায়-রোদ্দুরে কাপড় জামা এখুনি শুকিয়ে যাবে।

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, সে কি কথা। লোভ তোমার কিছুতে নেই জানি, কিন্তু ওদুটো জামা কাপড় আমি আব ফেরৎ চাইনে, যুমনি—ও তোমারই রইল।

তোমার বউয়ের জিনিষ আমি নেবো কেন?

তুমি হাসালে, যুমনি। ও যে নতুন জামা-কাপড়! তিনি তো

এখনও চোখেই দেখেননি!—সুশীল এবার যেন একটু মিনতি জানিয়েই বললে, আমার একটা কথা রাখো, যুমনি। তুমি কিছুই নিলেনা, অথচ তুদিন ধ'রে আমার জন্যে এত কষ্ট ক'রে গেলে, এ যখনই ভাবব, আমার বড্ড মন খারাপ হবে। ওই সঙ্গে গোটা দশেক টাকাও তুমি রেখে দাও, যুমনি! তোমার কাজে লেগে যাবে।

একটা চাপা রুক্ষতা আবার এসে পড়ল যুমনির দৃষ্টিতে। সে-চক্ষু প্রখর সন্দেহ নেই। ফস্ ক'রে ঈষৎ কর্কশকণ্ঠেই সে বললে, টাকা দিয়ে বুঝি আমার তুঃখু ঘোচাতে চাও? বড়লোকরা বড্ড টাকা দেখায়।

সুশীল একটু চমকে চুপ ক'রে গেল। বললে, আচ্ছা—আচ্ছা যাক্। আমারই ভুল হয়েছে! কিছু মনে ক'রো না; যুমনি।

যুমনি বললে, বেশ, তুমি যখন বললে এত ক'রে,—এ তুটো আমি নিয়েই যাচ্ছি। ওই যে চৌধুরীদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে! গাজনতলাটা ঘুরে গেলেই রাস্তা পাবে। এদিক দিয়ে যাও।

হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। আসি তবে। তোমার কাছে অনেক ঋণ আমার রইল যুমনি।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুশীল অগ্রসর হ'ল। পিছন ফিরে তাকাতে কি জানি কেন তার আর সাহস হ'লনা। পথের বাঁক ফিরে সে হনহন ক'রে চলে গেল।

যুমনি বসল সেইখানে। নতুন কাপড় আর জামা নিয়ে সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে লাগল। মুখেচোখে তার খুশী অথবা আনন্দের আভাস মাত্রও ছিলনা। বরং বিরক্তি অশ্রদ্ধা ও আক্রোশে তার মুখের চেহারাটা কঠিন হয়ে রইল।

*

* *

জামাই এসেছে ঘরে—দিন তিনেক ধরে চৌধুরীবাড়ীতে আনন্দের সীমা ছিলনা। চতুর্থ দিনে সবাইকে নিরানন্দে ভাসিয়ে কন্যা ও

জামাতা বাবাজি নৌকায় উঠল। সঙ্গে চলল ছ'মাসের কচি শিশুপুত্র, তুজন ঝি-চাকর, একজন চাপরাশি ও সরকারমশাই। সালঙ্কারা সুবেশা বধূ স্বামীর সঙ্গে চলল শ্বশুরবাড়ী কলকাতায়।

শাম্‌তা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছিল ঘাটে।

নৌকা চলল ঘাট পেরিয়ে আঘাটার পাশ দিয়ে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে ওই আঘাটার পাশেও লোক জমায়েত হয়েছিল। তবে সেটা অন্য কারণে।

সরকারমশাই বললেন, ওদিকে তাকাবেননা জামাইবাবু, ওতে দিদিমণির অকল্যাণ হবে। ও একটা তুর্ঘটনা।

সুশীল প্রশ্ন করল, কি হয়েছে ওখানে?

কে একটা মেয়ে ডুবে মরেছে কাল ঝড়বৃষ্টির সময় সন্ধ্যেবেলা। কাদের মেয়ে কেউ জানেনা। তবে পরণে দামী শাড়ী আর গায়ে রেশমী জামা ছিল। কিন্তু শেয়াল আর কিছু রাখেনি। মুখ-চোখ-গা সব খুবলে খেয়েছে! তুর্গা তুর্গা—

সুশীলের মুখ দিয়ে কোনো কথা ফুটলনা।—যুমনি বোধহয় জানত, তিন দিন পরে এই নদীপথ দিয়েই ভাটির টানে সুশীলের নৌকা যাবে।

———

জুহুবীচের সেই মেয়েটা

প্রফুল্ল রায়

জুহু ‘বীচে’র বাদামী বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন অবনীশ। পৃথিবীর এই ‘লঙ্গেষ্ট বীচ’ অর্থাৎ দীর্ঘতম বেলাভূমি চার-পাঁচ মাইল দূরে ভারসোবা পর্যন্ত চলে গেছে। কোথাও একটু না থেমে অবনীশ সোজা ভারসোবা পর্যন্তই যাবেন। সেখানেই আধঘণ্টা জিরিয়ে আবার ‘বীচে’র ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবেন।

অবনীশ কলকাতার একটা বিরাট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ফিনান্স ডিরেক্টর। তার বয়স-পঞ্চাশের কাছাকাছি। শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। টান টান সমুন্নত চেহারা, নাক মুখ ধারালো, গায়ের রঙ টকটকে, জুলপি আর ঘাড়ের কাছে কয়েকটা চুল রূপোর তার করে দেওয়া ছাড়া সময় তার ওপর কোন আঁচড় কাটতে পারেনি। হঠাৎ দেখলে তাকে যুবক বলে মনে হতে পারে।

অবনীশ অবিবাহিত, তিনি সিগারেট খান না, মদটদ স্পর্শ করেন না। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগের ন্যায়নীতি ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। সেদিক থেকে তাঁকে পুরানো আমলের চরিত্রবান মানুষ বলা যেতে পারে।

কোম্পানীর নানা দরকারে অবনীশকে প্রায়ই প্রত্যেক মাসেই বম্বে আসতে হয়। বম্বে এসে তিনি আর কোথাও ওঠেন না। জুহুতে তার একটি প্রিয় হোটেল আছে, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সেখানে চলে

আসেন। তার কাজকর্ম কিন্তু সবই এখান থেকে পনের যোল মাইল দূরে প্রপার বম্বে সিটিতে, তবু যে তিনি এত দূরে জুহুতে এসে থাকেন তার একমাত্র কারণ এখানকার 'বীচ'। বাদামী বালির এই আশ্চর্য সুন্দর বেলাভূমি দূরন্ত আকর্ষণে তাঁকে জুহুতে টেনে আনে।

যে কদিন অবনীশ এখানে থাকেন সূর্যোদয় হবার আগেই 'বীচে' চলে আসেন। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে-টেড়িয়ে হোটেলে ফিরে যান। তারপর স্নানটান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা প্রপার বম্বেতে। সারাদিন নানারকম কাজে আর এ্যাপয়েন্টমেন্ট চুকিয়ে সন্ধের আগে হোটেলে ফিরেই আবার 'বীচে'।

খুব জোরেও না, আবার আস্তেও না, মাঝারি গতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন অবনীশ।

'বীচ'টার একদিকে আরব সাগর, আর একদিকে অগুনতি নারকেল গাছ কোষ্ঠ লাইন ধরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে বিরাট বিরাট একেকটা হোটেল—'হলিডে ইন', 'কিংস', 'হরাইজন', 'সান এ্যাণ্ড স্যাণ্ড' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর 'বীচে'র ওপর সারি সারি ইডলি-দোসা, ভেলপুরী, নারিয়েল-পানি, আইসক্রীম এবং অজস্র রকম ভাজিয়া-ভুজিয়ার ষ্টল।

আরব সাগরে এখন সন্ধে নামতে শুরু করেছে। সন্ধে নামলেও অন্ধকার গাঢ় হয়নি, দিনের আলোর শেষ আভাটুকু এখনও আকাশে এবং সমুদ্রে আবছাভাবে লেগে রয়েছে। সামনের দিকে তাকালে মনে হয়, আরব সাগর যেন সারা গায়ে একটা উলঙ্গ বাহার শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে।

'বীচে' এখন প্রচুর ভিড়, সমুদ্রতীরের বাতাস থেকে টাটকা 'ওজোন' ফুসফুসে টেনে নেবার জন্য হাজার হাজার মানুষ এখানে চলে এসেছে, আর আছে স্প্যানিশ, চেক, স্কাণ্ডিনেভিয়ান, আমেরিকান এবং ফার-ইষ্ট, মিডল ইষ্টের অগুনতি বিদেশী ট্যুরিষ্ট।

ভিড়টি পেছনে ফেলে, বড় বড় হোটেলগুলো ডাইনে রেখে অবনীশ ফাঁকা মতো একটা জায়গায় এসে পড়লেন। কিছুটা অন্যমনস্কর

মতোই হাঁটছিলেন। হঠাৎ মনে হল পাশ থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল।

সমুদ্র থেকে ঝড়ের মতো হাওয়া উঠে এসে এধারের নারকেল বনে ভেঙ্গে পড়ছিল, অবনীশ ভাবলেন, ওটা হয়ত বাতাসের শব্দ। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভুলটা ভাঙল। গলার স্বরটা এবার আরেকটু স্পষ্ট, "প্লীজ একটা কথা শুনবেন"—

কোন মেয়ের গলা। একটু চমকই লাগল অবনীশের। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং বাঁ দিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন একটু দূরে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি যুবতী দাঁড়িয়ে আছে।

পেছন দিকের একটা কুড়ি বাইশ তলা হোটেল থেকে খানিকটা আলো এসে পড়েছিল। সেজন্য মেয়েটাকে মোটামুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, মুখ ডিমের মতো লম্বাটে, লালচে চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, চোখদুটো ঘন পালকে ঘেরা এবং ভাসা ভাসা। তবে স্বাস্থ্য ভালো নয়, বেশ রোগাই সে। এই বয়সেই তার শরীর ভেঙে যেতে শুরু করেছে। তাকে দেখলে প্রথমে যে কথাটা মনে পড়ে তা হল 'জীবনযুদ্ধ'।

মেয়েটার পরনে খেলো কাপড়ের স্কার্ট আর ব্লাউজ। ঠোঁটে, গালে, নখে সস্তা দামের রঙ, পায়ে আধপুরনো স্লিপার। গলায় 'বীডে'র হার ছাড়া সারা গায়ে আর কোন গয়না-টয়না নেই। তাকালেই টের পাওয়া যায় মেয়েটা গোয়াঙ্কি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার কৃশ্চান।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একপলক দেখে নিয়ে রুক্ষ গলায় অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই ?' ইংরেজিতে বললেন তিনি, কেননা মেয়েটা এই ভাষাতেই কথা বলেছে।

মেয়েটা উত্তর দিল না। ঘাড় নীচু করে ভীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, আর স্লিপারের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে 'বীচে'র বালি আঁচড়াতে লাগল।

গলার স্বর আরো রুক্ষ করে এবার আবার ধমকে উঠলেন অবনীশ, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে ?'

মেয়েটা চমকে উঠল যেন। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই।'

ভুরু কুঁচকে চোখের দৃষ্টি মেয়েটার ওপর স্থির করলেন অবনীশ। আগের স্বরেই বললেন, 'তোমাকে টাকা দেব কেন?'

মেয়েটা ভালো ইংরাজী জানে না। তার প্রতিটি কথায় গণ্ডা গণ্ডা ভুল। তবু সে কথা বলতে চায় মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। মেয়েটা এবার বলল, 'টাকাটা আমার খুব দরকার।'

'তোমার দরকার বলে আমাকে দিতে হবে?'

'টাকাটা একেবারে খালি হাতে আমি নেব না। তার বদলে আমিও কিছু দিতে পারি।'

'কী দেবে তুমি?'

মেয়েটা অবনীশের দিকে তাকাতে পারছিল না, নিজের পায়ের কাছে চোখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'একটু আনন্দ।'

অবনীশ ঝাপসাভাবে কিসের একটা সংকেত পাচ্ছিলেন, বললেন, 'তার মানে?'

মেয়েটা বলল, 'আমার এই শরীরটা রয়েছে। এটা—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা অবনীশের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কিছু একটা নেমে গেল যেন। তিনি শুনেছেন জুহু 'বীচে' অগুনতি কল গার্ল বা এই জাতীয় মেয়েরা জীবাণুর মতো থিক-থিক করতে থাকে। তবে বছরে দশবার করে গত দশ বছরে কম করে একশোবার তিনি এই 'বীচে' এসেছেন কিন্তু এরকম কোন মেয়েকে আগে আর তার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেননি।

এদের সম্পর্কে অবনীশ যা শুনেছেন তার সঙ্গে এই মেয়েটির প্রায় কিছুই মেলে না। মেয়েটা খুব নম্র আর ভীতু। খুব সম্ভব লাইনে নতুন এসেছে। অবনীশ চাপা গলায় বলল, 'আমি তোমায় পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করব।'

মেয়েটা শিউরে উঠল যেন। তারপর বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করছি। নিশ্চয়ই আপনি পুলিশ ডাকতে পারেন। কিন্তু'—

সন্ধেবেলার বেড়ানোতে বাধা পড়ায় অবনীশ বিরক্ত হচ্ছিলেন, অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন এবং খুবই রেগে যাচ্ছিলেন। তবু মেয়েটাকে এক ধরনের নোংরা পোকার মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। বললেন, 'কিন্তু কী ?'

মেয়েটা বলল, 'আমার কথা শুনলে আপনার দয়াই হবে। তখন আর পুলিশে দিতে ইচ্ছে করবে না।'

কিছুক্ষণ কি ভাবলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'এই প্রফেশানে কদ্দিন এসেছ ?'

'আজই।'

'ও! আমি তোমার প্রথম শিকার বুঝি ?'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

হঠাৎ কী হয়ে গেল অবনীশের ; এতদিনের নীতিবোধ-টোধের কথা আর মানল না। দারুণ এক কৌতূহল আচমকা তাকে পেয়ে বসল যেন। বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমার কথা শুনব।'

মেয়েটি ভীত স্বরে বলল, 'কোথায় যাব ?'

'গেলেই বুঝতে পারবে।'

'আপনি কি আমাকে সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে দেবেন ?'

'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

একরকম জোর করেই চরিত্রবান এবং দুর্দান্ত নীতিবাগীশ অবনীশ জুহু বীচে'র একটা বাজে মেয়েকে নিয়ে সোজা তাঁর ফাইভ-ষ্টার হোটেলে চলে এলেন।

রিশেপসানিষ্ট থেকে শুরু করে হোটেলের ষ্টুয়ার্ড বয়-বেয়ারা অবনীশের সঙ্গে একটা মেয়েকে দেখে চমকে উঠল। দশ বছর এই হোটেলে তিনি নিয়মিত আসছেন কিন্তু কোনদিন তাঁর সঙ্গে কোন মেয়েকে দেখা যায়নি, সবাই জানে এসব ব্যাপারে তিনি ভয়ানক পিউরিটান।

অবনীশ কোনদিকে তাকালেন না; মেয়েটাকে নিয়ে সোজা লিফট্ বক্সে ঢুকে পড়লেন। একটু পরে থারটীনথ্ ফ্লোরে তাঁর স্যুইটে। মেয়েটা ভীষণ কাঁপছিল। বোঝা যাচ্ছে এরকম 'পশ' হোটেলে আসার অভ্যেস নেই তার।

একটা ডিভান দেখিয়ে অবনীশ বললেন, 'বোসো'—

ডিভানটা কাঁচের জানলার ধার ঘেঁসে। তার পাশেই সোফাটোফা সাজানো রয়েছে। মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ডিভানের ওপর জড়সড় হয়ে বসল। আর অবনীশ তার মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন।

এখান থেকে দূরে ঝাপসাভাবে রাতের আরবসাগর দেখা যাচ্ছে। আর জানলার নীচের দিকে তাকালে হোটেলের সুইমিং পুল চোখে পড়বে।

অবনীশ সমুদ্র বা সুইমিং পুল কোনদিকেই তাকালেন না। স্থির নিষ্পলকে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা বলল, 'রেবেলা।'

'তখন তুমি বললে আজই এই প্রফেশানে এসেছ—'

'হ্যাঁ।'

'এই ডার্টি জঘন্য প্রফেশানে এলে কেন?'

'না এসে উপায় ছিল না।'

'বাজে কথা। যে যে-কাজ করে, তা যত খারাপই হোক, তার একটা কৈফিয়ৎ ঠিক খাড়া করে রাখে।'

মেয়েটা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আপনার কি ধারণা আমি শখ করে এই নোংরা কাজ বেছেছি।'

মেয়েটার কথার ভেতর কোথায় একটা খোঁচা ছিল, অবনীশের চোখ কুঁচকে গেল। বললেন, 'এ ছাড়া অন্য কিছু করা যেত না?'

'হয়ত অনেক কিছুই করা যেত। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব না?'

'কেন?'

'আমি টু-থ্রি স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছি। ঐ কোয়ালিফিকেশনে ভদ্র কোন চাকরি হয় না।'

অবনীশের মতো অত বড় কোম্পানির একজন ফিন্যান্স ডিরেক্টর এভাবে একটা বাজে টাইপের প্রস্টিটিউটের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেন না। কিন্তু তাঁর কেমন যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। বললেন, 'কেন তুমি এ লাইনে এলে সেটা আমি জানতে চাই।'

রেবেলা এবার বলল, 'তাতে আপনার কী লাভ? আপনাকে বিরক্ত করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি। দয়া করে আমাকে যেতে দিন; যেমন করে হোক কিছু টাকা আমাকে জোগাড় করতেই হবে। এখনও 'বীচে' গিয়ে চেষ্টা করলে ওটা হয়ত পেয়ে যাব।'

'যতক্ষণ না বলছ, আমি ছাড়ব না। যদি আমাকে বোঝাতে পার, নিরুপায় হয়েই এ লাইনে এসেছ, টাকাটা আমি তোমাকে দেব।'

রেবেলা দ্বিধান্বিতের মতো একটুক্ষণ বসে থাকল, তারপর বলল, 'আমার ছেলে ডেথ বেডে; বাঁচবার আশা খুব কম। এদিকে আমার হাতে একটিও পয়সা নেই। তাই ওকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা—' বলতে বলতে তার গলা ধরে এল!

অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ম্যারেড?'

'হ্যাঁ'—রেবেলা আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'তোমার হাসব্যাণ্ড বেঁচে নেই?'

'জানি না।'

'তার মানে?'

রেবেলা এবার যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। গোয়ার ক্যাপিটাল পাঞ্জিম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে তাদের বাড়ি। ওখানকারই এক বড়লোকের ছেলে পাঞ্জিমে তাদের বিরাট 'শেলে'র (শঙ্খ, কড়ি, ট্রার্বো, ট্রোকাস ইত্যাদি) ব্যবসা—ফুঁসলে বম্বেতে নিয়ে আসে। রেজিস্ট্রি করে বা চার্চে গিয়ে তারা বিয়ে টিয়ে করেনি। তবে স্বামী-স্ত্রীর মতো তারা বছর দুয়েক থেকেছে। ফুর্তি-টুর্তির

পর তার নেশা ছুটে গেলে ছোকরা তাকে ফেলে পালিয়েছে। রেবেলার উপায় ছিল না; কেন না ততদিনে তার একটা বাচ্চা হয়ে গেছে।

বাচ্চাটাকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটা ঝোপড়পট্টিতে এসে ঠেকেছে রেবেলা। হাতে দুচারটে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে আর যেটুকু গয়না-টয়না ছিল তা বেচে এতদিন চালিয়েছে। এখন আর কিছু নেই। তার ওপর কদিন ধরে ছেলেটা মৃত্যুশয্যায়। তাই কোন রাস্তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সেই আদিম অন্ধকার ব্যবসাতেই নামতে চেয়েছে।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করল রেবেলা। অবনীশ বললেন, 'বানানো গল্প আমি বিশ্বাস করি না।'

রেবেলা বলল, 'আমি মিথ্যে বলি না।'

'তুমি যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ পেতে হলে আমি যে নরকে থাকি সেখানে যেতে হয়।'

অবনীশ বললেন, 'নরক-টরক বলে আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আমি যাব। কোথায় থাকো তুমি?'

রেবেলা বলল, 'কিংস সার্কল ষ্টেশনের দিকে যেতে রেল লাইনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টি রয়েছে সেখানে।'

'ঠিকানা ঠিকতো?'

'আপনাকে তো বলেছি, আমি মিথ্যে বলি না।'

'যুধিষ্ঠির।' বলে একটু থামলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'তোমার ছেলে তো বললে ডেথ বেডে?'

'হ্যাঁ'। রেবেলা মাথা নাড়ল।

'তাকে কোথায় রেখে এসেছ?'

'ঝোপড়পট্টিতে এক মাদারি খেলোয়ার আছে, তার বউ-এর কাছে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রেবেলা, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি আর থাকতে পারব না।'

দু তিন সেকেণ্ড কি ভাবলেন অবনীশ। তারপর উঠতে উঠতে

বললেন, 'একটু দাঁড়াও—' বলেই ভেতরের অন্য একটা ঘর থেকে পঞ্চাশটা টাকা এনে রেবেলাকে দিলেন।

টাকাটা যে সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে, রেবেলা ভাবে নি। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর মাথা নুইয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি টাকাটা দিলেন, বদলে আমারও আপনাকে কিছু দেবার আছে। যদি তাড়াতাড়ি—'

অবনীশের রক্তের ভেতর দিয়ে জোরালো বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'গেট আউট বীচ, গেট আউট '

রেবেলা ভয় পেয়ে প্রায় দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে অবনীশ আরেকবার চেঁচালেন, 'মনে রেখো তোমাদের ঝোপড়পট্টিতে আমি যাবই। যদি দেখি মিথ্যে বলেছ, তোমাকে ছাড়ব না।'

পরের দিন সকালে জুহু 'বীচে' অভ্যাসমতো ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ফিরে এলেন অবনীশ। তারপর স্নান টান সেরে ব্রেকফাষ্ট যখন শেষ করে এনেছেন সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্রেডল থেকে টেলিফোনটা তুলে কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই রিশেপসনের পার্শী মেয়েটার গলা ভেসে এল, 'স্যার, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

অবনীশ বললেন, 'আমার স্যুইটে পাঠিয়ে দাও—'

'কিন্তু স্যার, লোকটাকে মনে হচ্ছে খুব বাজে টাইপের—শ্যাবিলি ড্রেসড—পাঠাব কি ?'

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে নিলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, ওখানেই ওকে অপেক্ষা করতে বল। আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পর নীচে আসতেই রিশেপসানিষ্ঠ মেয়েটা লোকটাকে দেখিয়ে দিল।

একেবারে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বয়স ষাট-বাষট্টির মতো হবে লোকটার। কালো কুঁজো হতচ্ছাড়া চেহারা ; মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। পরনে তালিমারা পাজামা আর ঢলঢলে জোব্বা, মাথায় পাগড়ী, পায়ে টায়ার-কাটা চপ্পল।

এরকম চেহারার একটা লোক তাঁর নাম কি করে জানল, কেনই বা তার কাছে এসেছে, অবনীশ ভেবে পেলেন না। কপাল কুঁচকে রুক্ষ গলায় তাকে বললেন, 'কী চাই ?'

লোকটা আরো খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল যেন। দুই হাত জোড় করে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি বোস সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করব।'

'আমিই বোস সাহেব—বল্।'

'রেবেলা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।'

রেবেলা অর্থাৎ কালকের সেই মেয়েটা, লোকটাকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে ?'

লোকটা বলল, 'আমি একজন মাদারী খেলোয়াড়। রেবেলা যে ঝোপড়পট্টিতে থাকে আমিও সেখানে থাকি।'

অবনীশের মনে পড়ল, কাল রেবেলা কে এক মাদারী খেলোয়াড়ের কথা বলেছিল। এ-ই তাহলে সে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'রেবেলা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে কেন ?'

'আপনি নাকি বলেছিলেন আমাদের ঝোপড়পট্টিতে যাবেন—'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'মেহেরবাণী করে হুজুর যদি আমার সঙ্গে যান—'

লোকটার ধৃষ্টতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন অবনীশ। একটা থার্ড ক্লাস মাদারী খেলোয়াড় তাঁকে কিনা তার সঙ্গে বস্তিতে যেতে বলছে! কী উত্তর দেবেন অবনীশ ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন, 'তোমার সঙ্গে ঝোপড়পট্টিতে যাব!'

লোকটা ঘাড় কাত করল, 'জী, নইলে রেবেলার সঙ্গে দেখা হবে না, ও এখান থেকে চলে যাবে। আর আপনি যা জানতে চান জানতে পারবেন না।'

হঠাৎ দারুণ এক আকর্ষণ অনুভব করল অবনীশ। লোকটাকে বললেন, 'চল।'

কিংস সার্কেল ষ্টেশনের কাছাকাছি রেললাইনের গায়ে যে

ঝোপড়পট্টি রয়েছে, কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটার পিছু পিছু অবনীশ সেখানে এলেন।

রেবেলা বলেছিল নরক। এই ঝোপড়পট্টিগুলো তার চাইতেও বোধ হয় জঘন্য। দুধারে পীচবোর্ড টিন চট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সারি সারি সুড়ঙ্গের মতো ঘর; মাঝখান দিয়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা অন্ধকার রাস্তা। এই রাস্তা যুগপৎ পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা। পানের পিক, থুতু, কফ এবং বাচ্চা-কাচ্চাদের যাবতীয় প্রাকৃত কর্মের চিহ্ন সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, রাস্তাটি থেকে কুৎসিত দুর্গন্ধ উঠে আসছিল।

নাকে রুমাল চেপে লোকটার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন অবনীশ। এখানে ছোট খাট ভীড় জমে আছে; দেখেই বোঝা যায় এরা বস্তিরই লোকজন।

অবনীশের মতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন লোককে দেখে ভিড়টা দু-ভাগ হয়ে পথ করে দিল। আর তখনই সামনের দিকে চোখ পড়ল অবনীশের। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠলেন তিনি।

ঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দায় রেবেলা একটা মূর্তির মতো বসেছিল। তার সামনে একটা মৃত শিশুর দেহ শোয়ানো রয়েছে। নিশ্চয়ই রেবেলার ছেলে।

সেই লোকটা একটু এগিয়ে গিয়ে রেবেলাকে বলল, 'সাহেব এসেছেন—' রেবেলা অবনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম। এছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।' বলে একটু থামল সে। তারপর মৃত বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল, 'কাল বলেছিলাম আমার ছেলে ডেথবেডে, রাত্রিতে ফিরে এসে দেখি সে আমায় মুক্তি দিয়ে চলে গেছে। এতক্ষণে ওকে গোরস্থানে নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নিজের চোখেই দেখুন আমি মিথ্যা বলিনি, আপনাকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা আদায় করতে চাইনি।'

অবনীশ কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। গলার কাছে অসহ্য এক যন্ত্রণা ফেণার মতো পাকিয়ে যেতে লাগল।

রেবেলা হঠাৎ উঠে পড়ল। ঘর থেকে কালকের সেই পঞ্চাশ টাকা এনে অবনীশকে বলল, 'আপনার টাকাটা নিন—'

অবনীশ ভাঙা গলায় বললেন, 'টাকাটা ফেরত নেবার জন্য তো দিই নি।'

'যে জন্যে দিয়েছিলেন সে কাজে তো লাগল না, অকারণে আপনার কাছে ধার রাখব কেন?' একরকম জোর করেই টাকাটা অবনীশকে দিয়ে দিল রেবেলা।

অবনীশ বললেন, 'এবার তুমি কি করবে?'

'ভাবিনি', বলে একটু থামলো রেবেলা। পরক্ষণে আবার বলল, 'আশা করি আপনি যে প্রমাণ চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন। আমাকে নিশ্চয়ই আর ধাপ্পাবাজ ভাবছেন না।'

অবনীশ উত্তর দিতে পারলেন না।

রেবেলা আবার বলল, 'এই নরকে দাঁড়িয়ে আর কষ্ট করবেন না, দয়া করে চলে যান।'

মুখ নামিয়ে আচ্ছন্নের মতো অন্ধকার সরু গলিটা দিয়ে এগুতে লাগলেন অবনীশ।

নাম নেই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেখতে গিয়েছিলাম জঙ্গল, দেখে এলাম অন্য অনেক কিছু। সেই জঙ্গলে অনেক রকম ফুল ফুটেছিল, কত ফুলের নাম জানি না, কিন্তু সেখানকার কোন বিশেষ ফুলের কথা আমার মনে নেই, মনে আছে শুধু একটি কিশোর বয়েসী ছেলের মুখ।

ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে রহস্যময় লাগে। ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম বড় সুন্দর একটা পরিবেশে। এইসব দৃশ্য আমরা ছবিতে দেখি, কিংবা নিজেরা যখন এই দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হই ; তার চেয়েও বেশী ভালো লাগে যখন পরে সেই দৃশ্যটার কথা ভাবি।

খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা ঢালু উপত্যকা, সেখানে একটা লাল রঙের নদী 'সবুজ বন, রক্ত নদী,' এরকম বলা যেতে পারতো, আসলে নদীটি একটি খুবই ছোট ঝর্ণা। লাল রঙের মাটি ধুয়ে ধুয়ে আসে বলে জলের রঙ ঠিক রক্তবর্ণ নয়। অনেকটা গেরুয়া গেরুয়া।

দুপুরের ঝলমলে রোদ, অথচ গরম নেই। দুদিন খুব টানা বৃষ্টির পর সেদিন রোদ উঠেছে, এই সব দিনে মন খুব ভালো লাগে।

আমরা নদীটি পেরিয়ে এবং একটা ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেখানে নরবলি হয়। কথাটা শুনে অবশ্য আমরা খুবই অবিশ্বাস করেছিলাম। নরবলি ?

এই যুগে? হয়তো অতীতকালে কখনো হতো। স্থানীয় দু' একজন লোককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। কেউ কেউ আকাশের দিকে মুখ করে বলেছে, কী জানি। এটা অবশ্য কোনো দূর দুর্গম অঞ্চলের কাহিনী নয়, এই জায়গাটা মাত্র দেড়শো কি দু'শো মাইল দূরে, মেদিনীপুরে।

মন্দিরটি জনশূন্য। খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, সামনে একটা কাঠ-গড়া, খুব সম্ভবত সেখানে পাঠা কিংবা মোষ বলি হয়।

ফেরার পথে আমরা লাল রঙের ঝর্ণাটার পাশে একটু বসলুম। অর্থাৎ আমরা দুই বন্ধু এবং বাংলোয় চৌকিদার। সে-ই আমাদের গাইড।

যাবার পথে দেখেছিলুম যে ঝর্ণাটার পাশে কতকগুলি ছাগল চরছে, আর সেগুলিকে পাহারা দিচ্ছে একটি ছেলে। বছর দশ এগারো বয়েস। রাখাল গরু চরায়, কিন্তু যে ছাগল চরায়, তাকেও কি রাখাল বলা যায়?

পরনে একটা ইজের, খালি গা। ছেলেটি ছপ্ছপ্ করে ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কৌতুহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমার বন্ধু বললে, ছেলেটির মুখখানা ভারি সুন্দর দেখতে, না?

আমি হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডাকলুম। ছেলেটি অপলকভাবে তাকিয়েই রইলো, কোনো সাড়া দিল না, কাছেও এলো না।

চৌকিদারকে বললুম, ওকে ডাকো তো। চৌকিদার ধমকের ভঙ্গিতে একটা হাঁক দিল, তাতে ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফুটল শুধু, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ছেলেটা খুব গোঁয়ার। আমরা অনেকবার ডাকাডাকি করতেও সে গ্রাহ্যই করলো না। আমি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি চেনো ওকে? চৌকিদার বললো, ও তো মহাদেব মাহাতোর ভাতুয়ার। তখনই জিজ্ঞেস করিনি। তবে ভাতুয়া কথাটার মানে পরে জেনেছিলাম।

আমি আবার ছেলেটিকে বললাম, এই তোর নাম কিরে? তুই ডাকলে আসিস না কেন?

ছেলেটি তবু উত্তর দিল না। আমার বন্ধু বললো, আমরা শহরের লোক তো, তাই ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে।

আমি চৌকিদারকে বললুম, ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে কেন? আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলবো? ওর নাম কি?

চৌকিদার বললো, স্যার ওর নাম নেই। ও বোবা, কথা বলতে পারে না, তাই ওর নাম কেউ দেয় নি। সবাই ছোড়া-ছোড়া বলে বলে ডাকে। কেউ-কেউ শুধু বোবা বলেই ডাকে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল এই জঙ্গল খুব গহন, নিবিড় নির্জন। আসলে জঙ্গলটি বেশ গভীর হলেও নির্জন নয়। ফাঁকে ফাঁকে অনেক মানুষ জন বাস করে। কিছু-কিছু চাষবাসও হয়। এই জঙ্গলে বাঘ নেই, তবে বাঘের চেয়ে অনেক বড় আকারের জানোয়ার আছে।

লাল রঙের ঝর্ণার পাশে ছাগল চরানো কিশোরটির সঙ্গে আমার একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে বোবা শুনে একটু মন খারাপ হয়ে গেল, বোবা বলেই বোধ হয় মানুষের কাছে আসে না।

আমরা যেই উঠে পড়লুম, অমনি ছেলেটি ঝর্ণা পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো আমাদের। যেন ও লুকোচুরি খেলছে।

বাংলোয় ফিরে এলাম খিদের টানে। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বেশ কিছু লোকের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাংলোর সামনে।

কিছু কিছু জঙ্গলের মানুষ জানতে এসেছে যে আমাদের কাছে বন্দুক আছে কিনা? আমরা জিপে করে এসেছি বলে ওরা আমাদের হোমরা-চোমরা কেউ ভেবেছে। আমি জীবনে কখনো খুব শখ থাকা সত্ত্বেও বন্দুক ছুঁয়েও দেখিনি।

বন্দুক দরকার হাতি তাড়ানোর জন্যে। প্রত্যেকবারেই একপাল হাতি এইখানে আসে ফসল খাবার জন্যে। এ-বছর খরা, তাই জমিতে এখনও ফসল বোনা হয় নি, সেইজন্য হাতিরা এসে ফসল নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

অন্য বছর টিন পিটিয়ে এবং মশাল ছুঁড়ে হাতির পালকে তাড়ানো হয়। এ বছর তাতেও হাতিরা যাচ্ছে না, তারা তাদের খাদ্য পায় নি।

কাছাকাছি কোথাও হাতি এসেছে শুনে রোমাঞ্চ লাগে। শহুরে মানুষ জঙ্গলে এসে সত্যিকারের জংলী জানোয়ার দেখতে চায়।

আমরা তখুনি উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু চৌকিদার আমাদের উৎসাহে বাধা দিয়ে বললে, আজ আর রাত্তিরের দিকে যাবেন না স্যার! সকালে যাবেন।

সে আমাদের কিছুতেই বেরোতে দেবে না সন্ধ্যেবেলা। তার তো একটা দায়িত্ব আছে। বাংলোর পিছন দিকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ালুম। সেখান থেকে হাতি দেখা না গেলেও তাদের ডাক অন্ততঃ শোনা যায়।

কিছুই শোনা গেল না অবশ্য। খানিক বাদে ফিরে এলুম বাংলোয়। অন্য লোকেরাও তখন চলে গেছে।

চৌকিদার বললো, একজনকে পাঠানো হয়েছে বাঁশ-পাহাড়ীতে। থানায় খবর দেওয়ার জন্য। গভর্ণমেন্ট কোনো ব্যবস্থা না করলে হাতির উপদ্রবে অনেক ঘর-বাড়ি এবার নষ্ট হবে। তিনটি হাতি এসেছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এই রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা একজন গেল না? সাহস আছে তো লোকটার? কে গেল?

চৌকিদার বললো, ঐ গুরু মুখিয়ার ভাতুয়া গণাই।

আমি বললুম, লোকটা অন্ধকারের মধ্যে একা-একা গেল, যদি হাতির সামনে পড়ে যায়? ওকে তো হাতিটা মেরে ফেলতে পারে।

চৌকিদার এ কথার কোনো উত্তর দিলো না।

হাতির গল্প নয়, এটা ভাতুয়ার কাহিনী।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, বার বার ভাতুয়া-ভাতুয়া শুনছি। ভাতুয়া মানে কী?

তখন আমাদের বোঝানো হলো যে ভাতুয়া এক ধরনের ক্রীতদাস।

শুধু ভাত খাওয়ার বিনিময়ে তারা যে কোনো বাড়িতে কাজ করে। খেতে পায় বলে তারা সবরকম কাজ করতে বাধ্য, এমন কি রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে থানায় যাওয়া পর্যন্ত।

এর পরের খবরটি আরো চমকপ্রদ। সকালে যে ছাগল চরানো কিশোরটিকে দেখেছিলুম, সে এই ভাতুয়ারই ছেলে। ভাতুয়ার ছেলেও ভাতুয়া।

যে লোক শুধু ভাতের বিনিময়ে এক বাড়িতে জীবন বাঁধা দেয়, তারও স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি আছে? কিসের ভরসায় সে সংসার পাতে?

—ওর ছেলে ভাতুয়া, আর ওর বউ?

—সেও আর এক বাড়িতে ভাতুয়া।

—ওদের কোনো নিজস্ব বাড়ি আছে?

—কী করে থাকবে স্যার? ভাতুয়াদের চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয়। ঐ গণাইয়ের এক টুকরো জমি আর বাড়ি ছিল, মেয়ের বিয়ে দেবার সময় বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলুম। বাড়ি নেই, সংসার নেই, তবু একটা পরিবার আছে। মাঝে-মাঝে দেখা হয় নিশ্চয় ওদের মধ্যে। তখন কী কথা হয়?

লাল রঙের ঝর্ণার পাশের সেই কিশোরটির কথা আমার মনে পড়তে লাগলো বার বার। বোবা বলে তাঁর একটা নামও দেওয়া হয়নি। এই পৃথিবীতে জন্মে একটা নামও কি তার প্রাপ্য নয়? বাড়িতে পোষা গরু-ছাগল-কুকুরেরও একটি করে নাম থাকে। কিন্তু ঐ ছেলেটির কোন নাম নেই। গাছের আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। কী ভাবছিল, কে জানে?

———

'এন' যখন এলো, তখন রাত্রি আছে। সময়ের হিসাবে, ভোর চারটে বলা যায়। তার গায়ে খাকি য়ুনিফর্ম, কাঁধের তারকাগুলো নেই। কোমরের বেল্ট শুদ্ধ রিভলবারটা হাতে ঝুলছে। আঙুলের ভারি সোনার আঙটি, লাল প্রবাল বসানো। প্রবালের মতো তার চোখ লাল, এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে আসছে। বলেই গিয়েছিল, সে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আসবে।

শীতের ঋতু, ভোর চারটেয় মনে হয়, এখনো গভীর রাত, নিশুতি। দূরে একটা গাড়ির শব্দ যে না পাওয়া যায়, তা না। কিন্তু তার জন্য নিশুতি প্রহরের রূপ বদলায় না।

'বি' আর 'জে' নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলছিল, তাদের সামনে টেবলে মদের বোতল, গেলাস আর জলের জাগ। পানীয়র রঙ খয়েরি। গেলাসে ঢালা রয়েছে, পান চলছে, বোঝা যায়। ছাইদানিটা সিগারেটের টুকরোয় ভরে উঠেছে, ছাপিয়ে পড়ার অবস্থা, অনেক ছাই টেবলেও পড়েছে। তাদের দু'জনের গায়েও য়ুনিফর্ম, কিন্তু তাদেরও, পদাধিকারের জন্য যেসব চিহ্ন থাকবার কথা, তা নেই। দুজনের কোমরেই বেল্টের সঙ্গে রিভলবার ঝুলছে। তাদের দু'জনের চোখ টকটকে লাল, চোখের তারা ভারী, যে কারণে দৃষ্টি এখন প্রায় বন্ধ আর স্থির, চঞ্চলতা নেই। তাদের চোয়ালও যেন খানিকটা ঝুলে পড়েছে,

এবং বসার ভঙ্গির শৈথিল্য দেখে মনে হয়, তারা বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে।

একটিই মাত্র একশো পাওয়ারের আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। বাইরের বারান্দায় আলোর জোর কম, সেখানে একজন রাইফেলধারী পাহারা। তারপরে বেশ কিছুটা জায়গা অন্ধকার, দুএকটা জীপ বা অন্য গাড়ি অস্পষ্ট দেখা যায়। আলো রাস্তায় তেমন উজ্জ্বল না।

'এন' টেবলের সামনে এসে, বেল্ট শুদ্ধ রিভলবারটা রাখলো। 'জে' জিজ্ঞেস করলো, 'ঘুম হলো?' তার গলার স্বর গোঙানোর মতো শোনালো।'

'এন'কে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে পারে। চুলের রঙ ইতিমধ্যেই ধূসর। কিন্তু তার শক্ত ফরসা মুখ দেখলে বোঝা যায় দাঁত সবই অটুট আছে। মেদহীন মুখে, কপালে, নাকের পাশে রেখা গভীর, মোটা ভুরুর নিচে চোখ দুটো বড়, উন্নত নাসা, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, গোঁফ দাড়ি কামানো। 'জে'র কথার জবাবে, নিচু মোটা স্বরে বললে, 'ওই একরকম!'

বলে পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে, ভিতরে উঁকি দিল। কমজোরের আলোয় দেখা যায়, বেঞ্চির ওপর একজন শুয়ে ঘুমোচ্ছে কাত হয়ে। ময়লা ধুতি আর জামা গায়ে। ধুতির খানিকটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। 'এন' আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। ডাকলো, 'পাহারা।'

বারান্দার রাইফেলধারী 'যাই স্যার' বলে ঘরের ভিতর এলো। 'এন' বললো, 'একটা গেলাস বের করে দাও তো।'

রাইফেলধারী একটা কাঠের আলমারি খুলে, একটি গেলাস টেবলের ওপর রাখলো। 'বি' আর 'জে'র দিকে একবার দেখালো, তারপরে বাইরের বারান্দায় চলে গেল।

'এন' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, বোতলের ছিপি খুলে, গেলাসে পানীয় ঢাললো, জল মেশালো, একটা চুমুক দিল, এবং 'বি'র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'নতুন কিছু জানা গেল?'

'উপদেশ।' 'বি' বললো।

'জে' বললো, 'আমার মনে হচ্ছে, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'এন' কিছু বললো না, গেলাসে চুমুক দিল। 'জে' আবার গোঙানো স্বরে, কথা বলবার আগে, একবার হাসির ভঙ্গি করলো, 'লোকটার কথা শুনে মনে হয়, আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না। নিজের সঙ্গে কথা বলছে। আমি তো একবার রেগে গিয়ে, এক ঘুষি মেরেছি।'

'কেন?' 'এন' জিজ্ঞেস করলো।

'জে' বললো, 'আমার দিকে যেন ঠিক বাঘের মতো তাকিয়েছিল। আমি যতবার জিজ্ঞেস করেছি, কী হলো? কথা বলে না, কেবল তাকিয়ে থাকে। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও জবাব না পেয়ে, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছলো। ধাঁই করে একটা ঘুষি মারলাম, উল্টে পড়ে গেল।'

'এন' বললো, 'ওরকম তো অনেক মারা হয়েছে, লাভ কিছু হয় নি। আজ আর কী দরকার ছিল?'

'তা বলে ওরকম তাকিয়ে থাকবে?' 'জে' মাতালের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'বি-কে জিজ্ঞেস করে দেখ, ঘুষি মারার পরেও, আমার দিকে একরকম ভাবেই তাকিয়েছিল। কেন ও আমার দিকে ও ভাবে তাকিয়ে থাকবে। আমার মনে হচ্ছিল, ওর চোখ দুটো মানুষের চোখ না। লোকটাকে শেষটায় সামনে থেকে সরিয়ে দিতে হলো। আমার ইচ্ছা করছিল, ওর চোখ দুটো উপড়ে নিই।'

'বি' গাটা শরীরের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'লোকটার উপদেশগুলো অদ্ভুত।

'বলে কী না, কী হবে এসব করে? সময়টাকে, আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দাও, তারপরে আবার আলো জ্বালাও, মনে করো অনেক সময় পার হয়ে গেছ, তখন তুমি, যা সত্যি, তা দেখতে পাবে। সময় খুব মূল্যবান, এই যে সময়টা যাচ্ছে, এই সময়টাও। তোমরা মদ খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছ, আর আমাকে আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছো। তারপরে

লোকটা হঠাৎ একবার নিজের দাঁত দেখিয়ে বললো, কী দেখলে? দাঁত, না? আমি তোমাদের গোসাপের কামড় দেখালাম। এ কামড় খোলবার না। আমার জানা সব কথাই আমি কামড়ে ধরে রেখেছি। তারপরে কী অশ্রাব্য খিস্তি যে আরম্ভ করেছিল, তা বলবার না। আমাদের গালাগাল দিয়ে কিছু বলছিল না, এমনি সব খারাপ খারাপ কথা।'

'এন' তার হাতের ঘড়িটা একবার দেখলো। এবং জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কোনো টেলিফোন করেছিলেন নাকি?'

'বি' বললো, 'হ্যাঁ, করেছিলেন।'

'এন' জিজ্ঞেস করলো, 'কি বললেন?'

'বি' বললো, 'তেমন কিছু না, খালি জিজ্ঞেস করলেন, সব ঠিক আছে কী না। বললাম, সব ঠিক আছে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন, বললাম, একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে।'

'এন' বললো, 'কিন্তু তোমাদের যা অবস্থা দেখছি, তোমরা তো আর দাঁড়াতে পারবে না।'

'জে' গুঙিয়ে বললো, 'সত্যি, এতো টেনেছি। চলো না, বেরিয়ে পড়ি। আর দেরি করার কী আছে? ক'টা বাজে?'

বলে সে চোখের সামনে নিজের হাতের ঘড়িটা তুলে ধরলো। এবং ভারী চোখের পাতা আরো খোলবার চেষ্টা করলো। 'এন' বললো 'তোমরা চলে যেতে পারো, আমি একলাই যাচ্ছি।'

'জে' বললো, 'কিন্তু উনি যদি রেগে যান?'

'এন' বললো, 'রেগে যাবার কী আছে। কাজ হয়ে গেলেই হলো।'

'বি' বললো, 'আমাদের থাকতে বলেছেন যে।'

'সেটা বিশেষ কিছু ভেবে বলেন নি।' 'এন' বললো, 'আমরা যাতে কোনো বিপদে না পড়ি, তার জন্যই কয়েকজনকে থাকতে বলেছিলেন। সে তো কাল রাত্রে যা করবার, এক সঙ্গেই করেছি।'

'বি' তাকালো 'জে'র দিকে। 'জে' বললো, আমার কোনো

আপত্তি নেই। আমি সত্যি ডেড ড্রাংক। আর কাল রাত্রে যা করেছি।'

'এন' দৃষ্টি নামিয়ে একবার 'জে'র দিকে তাকালো, 'বোঝা যাচ্ছে না রক্ত লেগে আছে কি না। সে হঠাৎ বললো, 'দলগুলো অদ্ভুত। কার কী ইডিওলজি, বুঝতে পারি না। আর আমরা যে কী....।'

'জে উঠে দাঁড়ালো, 'বি'কে বললো, 'চলো তাহলে আমরা কাটি।'

'চলো।'

'বি' উঠলো, এবং দুজনেই বেরিয়ে গেল। 'এন' তার গেলাস শূন্য করলো। বোতলের ছিপি খুলে আবার গেলাসে ঢালতে গিয়ে থেমে গেল। বোতল রেখে দিয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধলো, রিভলবারটার ওপরে একবার হাত বুলালো। পাহারাকে ডেকে একটা গাড়ির নম্বর বলে গাড়িটা বের করতে নির্দেশ দিল, এবং একজনের নাম করে তাকে ডেকে দিতে বললো! তারপরে পাশের ঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে শোয়ান লোকটিকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে জাগালো, বললো, 'উঠুন।'

লোকটি আস্তে আস্তে উঠলো। মুখে কয়েকদিনের গোঁফ দাড়ি। চোখে বোধ হয় চশমা ছিল। নাক আর চোখের পাশে দাগ দেখে মনে হয়। এখন নেই। মাথার চুল কালো সাদায় মেশানো, বয়স পঞ্চাশের ওপর। শরীরের গঠন শক্ত। দৃষ্টি শূন্য। ঠোঁটের কষে একটু লাল দাগ। ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো, 'উঠবো?'

'হ্যাঁ, উঠুন, বেরোতে হবে।'

'এন' বললো। লোকটি উঠে দাঁড়ালো, না টললেও, শরীর অশক্ত আর দুর্বল বোঝা যায়। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় বেরোব।'

'এন' বললো, 'দেখতে পাবেন। আসুন।'

এ সময়ে, একজন যুবক বয়সের লোক দরজার সামনে দেখা দিল। বটল গ্রীন ট্রাউজারের ওপর উলেন জ্যাকেট, গলার বোতাম খোলা ফাঁক দিয়ে শার্ট দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, 'এখন যাবেন?'

'এন' বললো, 'হ্যাঁ, ওঁকে নিয়ে গাড়িতে ওঠো। সব পরিষ্কার আছে তো?'

যুবক বললো, 'হ্যাঁ।'

বলে যুবক লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। 'এন' অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসু চোখে যুবকের দিকে তাকিয়েছিল। যুবক একটু হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে।'

লোকটির পায়ে স্যাণ্ডেল, ঘস্‌টে ঘস্‌টে পাশের ঘর দিয়ে যুবকের সঙ্গে বারান্দায় গেল। পিছনে 'এন' এলো! বারান্দার নিচেই একটি জীপ দাঁড়িয়ে। যুবক লোকটিকে নিয়ে, পিছনের দরজা খুলে ঢুকলো। দরজাটা টেনে ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল।

'এন' জীপের সামনের দিকে গেল। জীপের সামনে দুদিকেই লোহার জাল দিয়ে ঘেরা, দরজার মতো করা আছে। খুলে ঢুকতে হয়, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। জীপের সামনের দিকেও লোহার জাল দেওয়া আছে। 'এন' জালের দরজা খুলে, ডান দিকের ড্রাইভারের পাশে বসলো। ড্রাইভার আগের থেকেই বসেছিল। 'এন' বললো, 'চলো।'

রাস্তায় এখনো আলো জ্বলছে, এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। বড় রাস্তায় বাস আর ট্রাম দুএকটা চলছে, যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ বাস ট্রামেরই জানালা বন্ধ।

'এন' পাশ ফিরে, সিটের গায়ে হাত রেখে ডাকলো, 'ধীরেশবাবু।'

ভিতরের অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে জবাব এলো, 'কী?'

'আমাকে আপনি চেনেন?'

'চিনি।'

'কে বলুন তো?'

'তুমি নৃপেনের ভাই।'

'এক সময়ে নৃপেন আর আপনি একই দলে ছিলেন।'

'ছিলাম, এখন আর নেই।'

'মতের তফাত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আজ সে আপনার—'

'জানি, আমাকে সে ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে আমরা এখনো কিছু বলিনি।'

'কেন বলুন তো?'

'সময় এলে বলবো।'

'কিন্তু আপনার হুকুমে, অনেক নিরপরাধ লোককে খুন করা হয়েছে।'

'নিরপরাধ কেউ ছিল না।'

'আপনি নিজে নিরপরাধ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি যাদের অপরাধী বলে, খুন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের কেউ যদি আপনাকে অপরাধী ভেবে খুন করে?'

'করতে পারে, মাঝখানে আর কী থাকতে পারে?'

'আপনি বাঁচতে চান না?'

ধীরেশ যার নাম, একটু চুপ করে থেকে বললো, 'চাই'।

'কী ভাবে?'

ধীরেশের কোনো জবাব শোনা গেল না। 'এন' আবার বললো, 'বলতে পারছেন না?'

'পারি, আমি আমার মতোই বাঁচতে চাই।'

'যে রকম বেঁচেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সকলেই সকলের মতো বাঁচতে চাইতে পারে?'

'না, সকলের বাঁচার অধিকার স্বীকার করা যায় না, আর একটা নির্দিষ্ট পথেই সবাইকে বাঁচতে হবে।'

'এন' বললো, 'আপনার পাশে যে বসে আছে, তার ভাইকে আপনার নির্দেশে খুন করা হয়েছে।'

'আমি কারোর ভাইয়ের পরিচয় পেয়ে, কোনো নির্দেশ দিই নি। আমাদের অনেকের ভাইকেও খুন করা হয়েছে।'

'নীতিগত দিক থেকে, আপনাদের খুনই ঠিক, তাই না?'

'খুন কথাটা খারাপ। আমরা খুন করি না, সংগ্রাম করি। আমরা খুনী না।'

'আপনাদের যারা মেরেছে, তারা খুনী?'

'হ্যাঁ।'

'এন' ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললো। ময়দানের নির্জন রাস্তা, শহরের থেকে ময়দানের ফাঁকায় যেন কুয়াশা ছড়ানো। এখনো বাতি জ্বলছে। ড্রাইভার এক পাশে গাড়ি দাঁড় করালো। পিছনে, যুবক দরজা খুলে দিল। 'এন' বললো, 'ধীরেশবাবু, আপনি নেমে যান।'

'কোথায় যাবো?' লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

'এন' বললো, 'তা আমি জানি না। গাড়ি থেকে নেমে যান।'

ধীরেশ নামলো না, বসে রইলো। 'এন' পিছন ফিরে দেখলো, ধীরেশ বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যুবক 'এন'-এর দিকে তাকালো। 'এন' আবার বললো, 'নামুন, আপনাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ছেড়ে দিচ্ছ?' ধীরেশ অসম্ভব মোটা করে বললো, তারপর আস্তে আস্তে জীপ থেকে নামলো। নেমে জীপের সামনে দাঁড়ালো।

'এন' যুবকের দিকে তাকালো, যুবক 'এন'-এর দিকে, এবং 'এন'-এর রিভলবারের দিকে। গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করা হয় নি, নির্জন মাঠের রাস্তায় তার শব্দ হচ্ছে। 'এন' ড্রাইভারকে বললো, 'চালাও।'

যুবক তৎক্ষণাৎ জ্যাকেটের ভিতর হাত দিয়ে, রিভলবার বের করে। ট্রিগারের ক্যাচ খুলে ফেললো, তার শব্দ হলো, ধীরেশের দিকে তাক করে, গুলি করলো দু'বার। ধীরেশ পড়ে গেল। গাড়ির গতি বাড়াবার আগেই, যুবক ধীরেশের পড়ে যাওয়া শরীরের মাথা লক্ষ্য করে আর একবার গুলি ছুঁড়লো, এবং ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ চোখে 'এন'-এর দিকে ফিরে তাকালো, এবং এখনো খাপে ঢাকা তার রিভলবারের দিকে। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কি ওকে ছেড়ে দিতে চাইছিলেন?'

'এন' সামনের দিকে চোখ রেখে জবাব দিল, 'না।'

চলতে চলতে, 'এন' খাপ থেকে রিভলবার বের করলো, ক্যাচ্ খুললো। পিছন ফিরে দেখলো যুবক তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে, রিভলবারটা জ্যাকেটের মধ্যে ঢোকাতে যাচ্ছে। 'এন' যুবকের বুক লক্ষ্য করে গুলি করলো। যুবক রিভলবারটা বের করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। 'এন' আর একবার গুলি ছুঁড়লো। যুবকটি লুটিয়ে পড়লো সীটের নিচে। 'এন' ড্রাইভারকে একটু নামতে বললো।

গাড়ি থামলো। 'এন' গাড়ি থেকে নেমে পিছনে গিয়ে যুবকের মৃতদেহ টেনে নিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিল। দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে। 'এন' তার সামনের আসনে এসে বসে বললো, 'চলো।'

জীপ চললো। 'এন' রিভলবারের ক্যাচ টেনে দিয়ে, খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। রাস্তায় এখনো আলো জ্বলছে, কুয়াশা যেন আরো ঘন হয়ে আসছে।